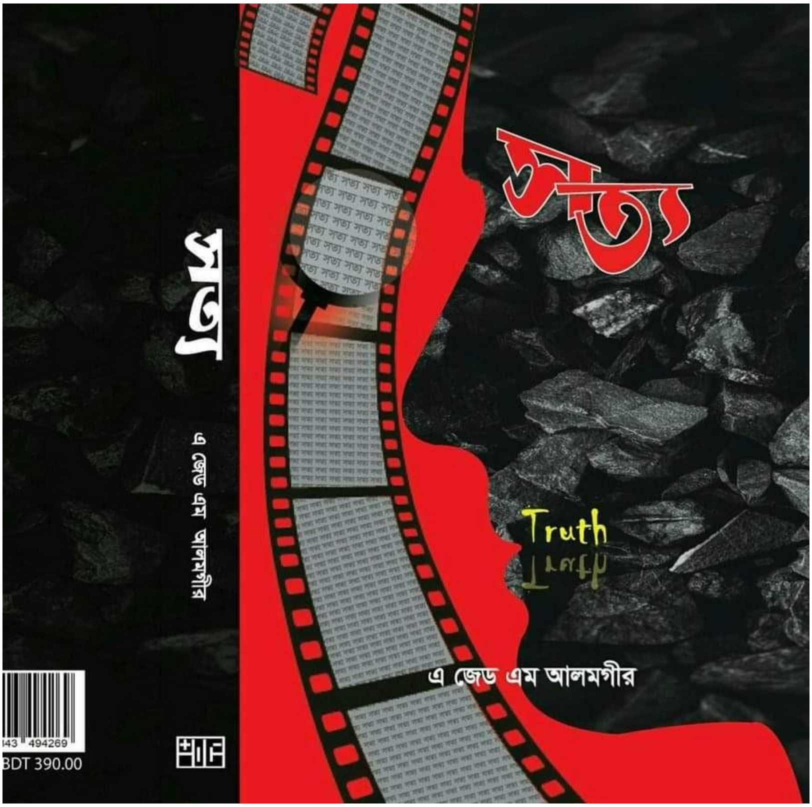

সত্য
Truth
এ জেড এম আলমগীর
সত্য
এ জেড এম আলমগীর
43 494269
BDT 390.00

সত্য

Truth

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা।

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম
www.rokomari.com

প্রচ্ছদ: এ জেড এম আলমগীর

মুদ্রণ: ইরাণী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ৩৯০ টাকা।

Truth
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
By A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 390.

ISBN : 978-984-34-9426-9

www.facebook.com/ideasnviews

সূচী পৃষ্ঠা

১. সত্যের সন্ধানে

সত্যের সন্ধানে

'In the name of Allah ..'। 'আল্লাহর নামে ..'। সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে লেখাটি এভাবে শুরু করলাম। অন্যভাবেও শুরু করা যেত। তবে লেখকেরও একটি নিজস্ব স্বাচ্ছন্দবোধ আছে। তাই এভাবে শুরু করা।

সাধারণত মুসলিমরা আল্লাহর নাম স্মরন করে কাজের সূচনা করে। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও কাজ শুরু করার পূর্বে নিজেদের মত করে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। ধর্ম নির্বিশেষে সকলে নিজ নিজ ধরনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। সাধারণত বিশ্বাসীরা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে শুভ কাজের সূচনা করে। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে আনে না সমাজে এমন মানুষও আছে। তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়।

সত্যকে খুঁজে পেতে হলে পথের প্রতিটি বাঁকে প্রশ্ন করার বিকল্প নেই। সঠিক উত্তরটি পাওয়া সম্ভব হলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে- কাজের শুরুতে মানুষ কেন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে?

যুগ যুগ ধরে মানুষ এমনটি করে আসছে। এটি একটি সামাজিক নিয়ম, প্রথা বা মানসিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পালনকর্তা এমনটি নির্দেশ করেছেন। পূর্ববর্তীদের দেখানো পথ অনুসরণ করে চলেছি। সৃষ্টিকর্তাকে ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করার উপকারীতা আছে। কাজে বরকত হয়। সফলতা আসে। প্রশ্নের সহজ সাধারণ উত্তরগুলি এমন হতে পারে।

লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে একটি পথ বেছে নিয়ে এগুতে হবে। ধরে নিলাম বিশ্বাসীরা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে কাজে সফল হওয়ার প্রত্যাশায়। এ পথ ধরে এগিয়ে সঠিক উত্তরটি খুঁজে পেতে চাই। সত্যকে জানতে চাই।

সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার ফলে সত্যি কি কাজে সফলতা আসে? বিষয়টি যদি সত্যি হয় তবে অবশ্যই সেটি অলৌকিকভাবে ঘটে না। সমুদ্র তীরে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র একটি বালিকণা থেকে শুরু করে মানব দেহের সৃষ্টি হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যাবতীয় সৃষ্টির পেছনে রয়েছে নিখুঁত কারুকাজের উপস্থিতি। পরিবেশ ও প্রকৃতির পর্যবেক্ষন আমাদেরকে সে শিক্ষা দেয়।

সমাজে প্রচলিত বা প্রবর্তিত কোন নিয়মের পেছনেও রয়েছে কোন একটি যোগসূত্র। সৃষ্টিকর্তার স্মরণের সঙ্গে সফলতার নিয়মটি যদি সত্যি হয় তবে মানুষের এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পেছনে কারন নিহিত আছে। কোন পর্যবেক্ষন, কিছু উপলব্ধিবোধ, কোন প্রয়োজনীয়তা এমন নিয়ম প্রবর্তনের পেছনে কাজ করেছে। কোন অলৌকিকতা নয়। এখানেও একটি সত্য লুকিয়ে আছে। আছে সূত্র।

প্রতিটি প্রশ্নের পেছনে রয়েছে একটি সঠিক উত্তর। সঠিক সে উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে সত্যের বার্তা। প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার চেষ্টার মাধ্যমে সত্যকে খুঁজে পেতে হবে। জানতে চাই সকল কর্মের পেছনে নিহিত কারনকে, যা সত্যরূপে বিদ্যমান। তাই লেখার এ অংশের শিরোনাম দেয়া হয়েছে ‘সত্যের সন্ধানে’।

অনুসন্ধানি মন

বিশ্বাস নিয়ে কাজ করলে উপকারিতা আছে। হতে পারে কথাটি সঠিক। প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বাসের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণের মাধ্যমে উপকারিতা পাওয়া যায় কেন? এদের মাঝে সম্পর্কটি কোথায়?

ওপরে যে সব কারনের উল্লেখ করা হয়েছে, বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের জন্য সে উত্তরগুলি যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী ভাববার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সত্য সন্ধানির অন্তর প্রশ্নের অতি সাধারণ উত্তরে তৃপ্ত নয়। মস্তিস্কে আরও অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। সে সঠিক কারনটি জানতে চায়।

কর্ম শুরুর প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণে সুফল পাওয়া যেতে পারে। একজন সন্ধানি মনের মানুষও সে সূত্র বিশ্বাস করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, ব্যাক্তিগত জীবনে সে নিজেও এমন স্মরণের মাঝে কোন উপকার পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেটি সত্য নাকি কাকতালীয়? সন্ধানি মনের অন্তর তাই আরও গভীরে প্রবেশ করতে চায়। জানতে চায় কিভাবে এটি মানুষের ভেতরে কাজ করে। যুগ যুগ ধরে এমনিভাবে মানুষ নানান সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছে।

অর্জুন জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছে- “... হে আমার রব, হে পরমেশ্বর! ব্রহ্মা কি? আত্মা কি? ... দয়া করে আমাকে এটি ব্যাখ্যা করুন।” (গীতা ৮:১)

ইব্রাহীম (আঃ) জানতে চেয়েছে- "... হে আমার প্রভূ! আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতের ভেতরে প্রাণের সঞ্চার করেন? তিনি বললেন: তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম বললো: অবশ্যই করি, তবে (আমি জানতে চাচ্ছি) যেন আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ...!" (আল-কোরআন ২:২৬০)

মুসা (আঃ) তো সরাসরি আল্লাহকে দেখতে চেয়ে বলেছে- "... হে আল্লাহ! আমাকে দেখান, যেন আমি আপনাকে দর্শন করতে পারি! তিনি বললেন: তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। বরং পর্বতের দিকে দেখ, যদি এটি তার স্থানে স্থীর দাড়িয়ে থাকতে পারে!" (আল-কোরআন ৭:১৪৩)

অর্জুন দেখতে চেয়ে বলেছে- "আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার মহাজাগতিক রূপটি দেখার সক্ষমতা রাখি, হে আমার রব! হে সমস্ত রহস্যময় শক্তির অধিকর্তা! তবে দয়া করে আমাকে আপনার সেই সার্বজনীন স্বরূপটি দেখান। (তিনি বললেন) তুমি তোমার বর্তমান দৃষ্টি (চোখ) দিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না। অতএব আমি তোমাকে স্বর্গীয় দৃষ্টি প্রদান করছি, যা দিয়ে তুমি আমার রহস্যময় ঐশ্বর্য্যশীলতা দেখতে পাবে।" (গীতা ১১:৪,৮)

গভীরের গুরু রহস্য বা সত্যটি জানা গেলে আত্মা তৃপ্তি পায়। বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সত্যের জ্ঞান বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে। অর্থহীন অলীক কল্পনার মন্দ ছোবল থেকে মানবকে রক্ষা করে।

ভেতরের রহস্য না জেনে কেবল বিশ্বাস নিয়ে কাজ করলেও সুফল পাওয়া যাবে। সূত্র যদি সত্য হয় তবে উপকার তো পাওয়া যাবেই। যেমন $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ এ সূত্রে অংক ফেলে দিলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসবেই। অথচ অনেকেই জানবে না এর ভেতরের রহস্যটি কি। অর্থাৎ সূত্রটি কিভাবে এসেছে। কোথায় এর যোগসূত্র। সকলের সেটি জানার প্রয়োজনও নেই। জানবে কেবল অনুসন্ধানি মন। যে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে নিজ থেকে জানতে চেষ্টা করে এবং সে কারনে তেমন একজন জগতের অনেক ভোগ-উপভোগকেও পরিত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

কোন বিষয়ের ভেতরের সত্যটিকে জানতে চাওয়া একটি বাড়তি বিড়ম্বনা। কারও কাছে অপ্রয়োজনীয়। কখনও পীড়াদায়কও বটে। তথাপি সন্ধানি মন ইচ্ছের সে কাঙ্খিত পথে ঘুরে ফিরে ধাবিত হবেই। কোন কেন্দ্রীয় টানের ফল।

ইচ্ছেরও হয়তবা একটি কেন্দ্রীয় টান আছে। সে কারনেই সত্যের সন্ধানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। অজানাকে জানা বা সত্য সন্ধানের এ বৈশিষ্ট সৃষ্টিকর্তা নিজেই মানবের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তা না হলে পৃথিবী আজও আদিম অবস্থায়ই বিরাজ করতো।

সাধারণ মানুষ আজ অহমিকার সঙ্গে অনেক সুখ ভোগ-উপভোগ করে চলেছে। পেছনে রয়েছে অনেক সন্ধানি মনের সুখ পরিত্যাগের গল্প। আছে পরিবার ও সমাজ প্রদত্ত শাস্তি কিংবা ঘৃনা প্রাপ্তির ইতিহাস। তথাপি অনুসন্ধানি মন বিষয়টিকে দায়িত্বশীলতা বলেই মনে করে। অদৃশ্য কেউ একজন তার মাঝে সে প্রেরণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যা আসে জ্ঞানের মাধ্যম হয়ে।

জগৎ সংসারে প্রতিটি ক্ষেত্রে নানান সব সূত্র বিদ্যমান। সূত্রগুলি কাজ করে বিধায় সকল কর্ম সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয়। জগতের সকল সূত্র একটি বইয়ের ছোট্ট এ পরিসরে তুলে ধরা কি কোন যৌক্তিক লক্ষ্য হতে পারে? নিশ্চয়ই না এবং সেটি সম্ভবও নয়।

এ বইয়ের লক্ষ্য হলো, মানুষ কেন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে কাজের সূচনা করে সে সত্যটি জানার চেষ্টা করা এবং এর মাধ্যমে অপরাপর ক্ষেত্রগুলিতেও সত্যের উপস্থিতির বিদ্যমানতার যৌক্তিকতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সত্যকে খুঁজে পেতে যেভাবে আলোচনাটির অবতারনা করা হলো, ভবিষ্যতেও সে প্রচেষ্টাকে একইভাবে অব্যাহত রাখার একটি পথ উন্মোচন করে দেয়া।

সত্যের ধারণা

"We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth …" (Al-Quran 46:3)

অর্থাৎ "বিশ্ব জগতসমুহ ও পৃথিবী এবং এর অন্তর্বর্তী যাবতীয় সকল কিছু সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করা হয়নি।" প্রশ্ন হচ্ছে- সত্য কি?

'প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।' এটি একটি অতি পরিচিত সূত্র। যা সত্য। সৃষ্টির পরতে পরতে রয়েছে এমনি অগনিত সূত্র। সূত্রগুলি

সত্য। অগোচরে সূত্র তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে বিধায় সৃষ্টির সকল ক্রিয়া সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয়।

সত্য হচেছ সেই বন্ধন যে বন্ধনের ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে যাবতীয় সৃষ্টি, যা আমরা জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হই। কেবল পৃথিবী কিংবা মহাবিশ্বই নয়, মানুষে মানুষে সম্পর্ক কিংবা মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার ভাবনার সম্পর্ক, এমনকি ব্রহ্মান্ডের তাবৎ সকল কিছু সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধনের কারনেই এক স্থানে নাড়া পড়লে অপর স্থানে বিষয়টি অনুভূত হয়।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র সত্যের ছড়াছড়ি। অর্থাৎ সূত্রের ছড়াছড়ি। হোক সেটি পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সম্পর্কজনিত কোন বিজ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচালনা বিজ্ঞান, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, আর্থিক বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান সব কিছুর পরিচালনায় রয়েছে সূত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা আছে তাদের সকলেই সত্যের সম্পর্কজনিত বন্ধনকেই নির্দেশ করে। জগত সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এমনকি যা আজও অজানা বা অনাবিষ্কৃত সেগুলিও।

কোন একটি ঘটনা বা বিষয় ততক্ষন অলৌকিক বলে মনে হয় যতক্ষন বিষয়টি ঘটছে অথচ এর কারনটি জানা যাচ্ছে না। কারনটি জেনে গেলে সেটি আর অলৌকিক থাকে না। জানা যায় সেখানে একটি নিয়ম আছে। আছে সঠিক সূত্র। নিয়ম ও সূত্র দ্বারা চালিত এ জীবন ও জগত।

কোন ঘটনার জন্য দায়ী সঠিক নিয়ম বা সূত্রটিই হচ্ছে সত্য। যা উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য পরিপূর্ণভাবে সঠিক। অন্য কথায় কোন ঘটনা সংঘটনের জন্য দায়ী সঠিক সূত্রটি হচেছ সত্য। নির্দিষ্ট কাজে সঠিক সূত্র প্রয়োগে ব্যার্থ হলে কর্মে ভূল ফলাফল ঘটতে থাকে। দৃষ্টি ও জ্ঞানের গোচরে ও অগোচরে সত্য ছড়িয়ে আছে। কখনও ধরতে পারি, কখনও দেরি করে ফেলি বা পারি না।

সত্য সৃষ্টির আদিতে কিংবা আদির পূর্বেও যদি কোন অবস্থা থেকে থাকে তবে সেখানেও বিদ্যমান ছিল। যাকে ধ্বংস বলি তারও সূত্র আছে। আছে নিয়ম। মহা বিস্ফোরনেরও সূত্র আছে। কোন কিছু ছিটকে কোন দিকে কতদুর যাবে তাও সূত্রকে অনুসরণ করে চলে। প্রকৃতির মধ্যে সত্য নিহিত। সত্যের পথ ধরে প্রকৃতি চলে। আমরা প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান সত্যের আকর্ষন ও বিকর্ষনের সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ।

ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যে সত্য লুক্কায়িত। সকল সৃষ্টিতে সত্য বিরাজমান। সত্য চলে সৃষ্টির সমান্তরাল। কেবল খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষা। চারিদিকে সত্যের ছড়াছড়ি। বলা যায় চারিদিকে নিয়ম ও সূত্রের বন্ধনের ছড়াছড়ি।

'সত্য' অতি প্রাকৃত অলৌকিক কোন বিষয় নয়। জগতের সব কিছু কার্যকারনের সূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানের সূত্রগুলির মত। পদে পদে এ সূত্রগুলি হচ্ছে সত্য। যা সঠিক। কোন কিছুর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সূত্রটিই সঠিক। সূত্রের কোন নড়চড় হয় না। যদিও বা কখনও ব্যাতিক্রম দেখি তবে তারও শর্ত ও সূত্র আছে। যাকে আমরা মিথ্যে বলি তাও চলে সত্যের ওপর ভর করে। কোন শর্ত ও সূত্রের কারনে ব্যাত্যয় ঘটে। মিথ্যের এক অর্থে কোন অস্তিত্ব নেই।

সঠিক সূত্রগুলি সত্য। যা বিষয়টিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আবার ভূল পথেও পরিচালিত করে। ভূলের ক্ষেত্রে ভূলের সূত্রটি সত্য বা সঠিক হয়ে দেখা দেয়। ভূলটিকে কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যে নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ বা যার যার ক্ষেত্রে সঠিক সূত্রগুলি সত্য। যা সঠিক নিয়মে সবকিছুকে পরিচালনা করে। এমনকি ভূলকেও।

এ দেহের ভেতরে সত্য। বাহিরে সত্য। বিশ্ব বক্ষ্রান্ডের পরতে পরতে সত্য। সত্য হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া। যেটি আবিষ্কার করা সম্ভব হলে সৃষ্টিকে নিয়ে খেলা করা যায়। প্রতিটি ঘটনা বা কর্মের পেছনে নিহিত আছে কারন। সেখানেই লুকিয়ে আছে সত্য। ঘটনার জন্য দায়ী সঠিক সে কারনটি জানা সম্ভব হলে সত্য উন্মোচিত হয়।

সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে কোন কাজ শুরু করা হলে কর্মে সফলতা আসে। সূত্রটি যদি সত্য হয় তবে এখানেও কোন অলৌকিকতা নেই। এর পেছনে আছে কার্যকারণ সম্পর্ক, যেখানে রয়েছে নিয়ম, সূত্র বা সত্য। আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সত্যটিকে খুঁজে পেতে চাই।

সত্যের কেন্দ্রীয় টান বা আকর্ষন

পাথরকে ওপর দিকে ছুড়ে দিলে নিচের দিকে পরবে। যতবার ওপর দিকে ছুড়ে দেয়া হবে ততবারই বিষয়টি একইভাবে ঘটবে। এর ব্যাত্যয় হবে না। এটি প্রমানিত। তাই এটি সূত্র। সূত্রই সত্য। অন্যভাবে বলা যায় একটি সূত্র, নিয়ম বা

সত্যের উপস্থিতির কারনে পাথরকে যতবার ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হবে ততবার সেটি নিচে এসে পরবে। অর্থাৎ নিয়ম বা সূত্র যা বলবে ঘটনাটি বার বার সে নিয়মমুখীন হওয়াটি সত্যের প্রতি বিষয় বা ঘটনার কেন্দ্রীয় টান। সত্য হচ্ছে সবার ওপরে। সত্যের কারনে নিয়ম প্রতিষ্ঠা পায়। সত্য বা সূত্রের কখনও ব্যাত্যয় ঘটবে না।

সত্যের ব্যাত্যয় ঘটবে না কথাটি সঠিক। তবে ওপরে উল্লেখিত উদাহরনের ক্ষেত্রে ঘটনাটির ব্যাত্যয় ঘটবে না এ কথাটি বলা সঠিক নয়। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারনে এভাবে বলতে হচেছ।

ওপরের দিকে পাথর ছুড়ে দিলে সেটি আরও ওপরে যেতে থাকবে .. যেতে থাকবে .. যেতে থাকবে ..। পৃথিবীতে এসে মানুষ যদি তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করতো, তবে তেমন ক্ষেত্রে সেটি-ই সত্যরূপে আবির্ভূত হতো। বিজ্ঞান তখন তার স্বপক্ষে তথ্য-উপাত্ত-যুক্তি-প্রমাণ সবকিছু তুলে ধরতে সক্ষম হতো। কেননা সেটি তো সত্য।

মানুষের পক্ষে ঘটনার কারন বা সত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে মানুষ কোন মৌলিক নিয়ম, সূত্র বা সত্যের স্রষ্টা নয়। সত্যের যিনি স্রষ্টা, যাকে কেউই আমরা চিনিনা বা জানিনা, সত্য মিথ্যে বলার ক্ষমতাটুকু অন্তত ধারণায় হলেও তাঁর ওপরে ছেড়ে দেয়া উত্তম।

সত্য বা সূত্রের দিকে বিশ্বজগতের যাবতীয় বিষয়, বস্তু ও ঘটনার কেন্দ্রীয় টান আছে। তাই ঘটনা বার বার সূত্র অনুযায়ী কাজ করে। ব্যাত্যয় ঘটে না। রেলগাড়ী হেলে দুলে কেন্দ্রের শক্তির টানে লাইনেই চালিত হয়। কেন্দ্রের এ টান ভারসাম্য বজায় রাখে। হেলে দুলে ক্ষণিক এবং ক্ষাণিক বিচ্যুতি হলেও কেন্দ্রীয় টানের কারনে পুনঃপ্রবর্তীত হয়। পরিপূর্ণ বিচ্যূত হয় না। সম্পূর্ন বিচ্যূত হলে নতুন সত্যের রূপ ধারণ করে। বিচ্যুতির পেছনে আরেক সত্য বা সূত্র কাজ করে।

বিষয়টি 'শক্তির নিত্যতা বা অবিনাশী' সূত্রের মত ভাবা যেতে পারে। শক্তির যেমন বিনাশ নেই রূপান্তর আছে, তেমনি সত্য বা সূত্রেরও কোন অনুপস্থিতি নেই, এর রূপান্তর হতে পারে। সত্য যদি নিজ অবস্থান থেকে বিচ্যূত হয়, তবে সে আরেক সত্যে পরিনত হয়।

ওপরের উদাহরনে রেলগাড়ী চলছে এটি সত্য। লাইন থেকে বিচ্যুত হলে বিচ্যুতির ঘটনাটি সত্য। ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে রেলগাড়ী চলছে এটি এখন মিথ্যে। বস্তুত মিথ্যের অস্তিত্ব নেই। বরং নতুন সত্যটি হতে পারে রেলগাড়ী এখন উল্টে পড়ে স্থীতাবস্তায় আছে। তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এক সত্য থেকে অন্য সত্য বা সূত্রের রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ একটি সত্য সব সময় বিদ্যমান। বস্তুত মিথ্যের কোন অস্তিত্ব নেই। মিথ্যে হচেছ অলীক। যার কোন বিদ্যমানতা নেই। যা সত্য নয়।

প্রতিটি ঘটনার পেছনে কারন নিহিত আছে। কখনও ধরতে পারি। কখনও পারি না। যখন পারিনা তখন বলি নিয়মের ব্যাত্যয়, ব্যাতিক্রম বা অনিয়ম। বস্তুত সেখানেও নিয়ম কাজ করে। বিচ্যুতির নিয়ম। কিংবা নতুন নিয়ম যা আজানা। অতএব ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, সে কোন না কোন নিয়মের অধীন। সূত্রের অধীন। অর্থাৎ সত্য সর্ব সময়ে সর্বত্র বিরাজমান।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন প্রতিটি সত্য বা সূত্র কোন এক বৃহৎ সত্যের আকর্ষনের অংশ। সেই প্রচন্ড সত্যের যথাযথ চৌম্বকীয় আকর্ষনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সকল সত্য আকর্ষিত হয়ে এক মহাসত্য বা সূত্রের সমন্বিত রূপ ধারণ করে আছে। সব কিছুকে নিয়মের অধীন করে রেখেছে। জগতের যাবতীয় সকল কিছু কেন্দ্রীয় সে সত্যের আকর্ষনের কারনে তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এত সুশৃংখল দেখতে পাই। সেই মহাসত্য কে বা কি, কি তার রূপ কেউ জানেনা। এক এক জনের এক এক রকম ধারনা ও বিশ্বাস।

"… Allah, He is the Truth …" "… আল্লাহ! তিনিই সত্য …" (আল-কোরআন ২২:৬)

"… there is no Truth superior to Me. … ." "… আমার চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য নেই …" (গীতা ৭:৭)

সত্য এবং বিজ্ঞান

শিরোনামটিকে বিজ্ঞান ও সত্য এভাবে লেখা যেত। শ্রুতিমধুর হতো। কিন্তু সেটি না করে সত্য ও বিজ্ঞান এরূপে লেখা হয়েছে। বিজ্ঞানের অনেক উচ্চ পর্যায়ে সত্যের অবস্থান, সে বিষয়ে মনের মধ্যে একটি ধারণা জন্ম দেয়ার জন্য এমনটি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সত্য নয় বরং সত্যকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজনে বিজ্ঞান। মর্যাদার দিক থেকে সত্য অনেক অনেক ওপরে। বিজ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকলেও সত্য সর্বকালে সর্বত্র বিরাজমান।

কোন কিছুর সঙ্গে বিজ্ঞান শব্দটি জুড়ে দিলে সেটি বিশ্বাসযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞান যদি কোন একটি বিষয়কে সত্য বলে অভিহিত করে, তবে সেটি সত্য। বিজ্ঞানের ওপর মানুষের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান!

বিজ্ঞানের ওপর মানুষের এত আস্থার কারন কি? কারন এই যে, বিজ্ঞান সত্য উদঘাটনে সফল প্রমানিত হয়েছে। খুঁজে পাওয়া অনেক সত্য বা সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান নানান কিছু আবিস্কার/উদ্ভাবনও করেছে। এসবের প্রমাণ মানুষের হাতের কাছেই রয়েছে। বিজ্ঞানের সক্ষমতা তাই প্রশ্নাতীত।

বিজ্ঞান যা কিছু সৃষ্টি করেছে সেগুলি সঠিকভাবে মানুষের জীবনে কাজ করে চলেছে। কল্পনার অসম্ভবকে বিজ্ঞান বাস্তবে রূপ দিয়েছে। বিজ্ঞান সত্যের অনেক সূত্র উদঘাটন করেছে। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তাই বিজ্ঞানের ওপর মানুষের এত আস্থা।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কোন কিছু সৃষ্টি করে না। সৃষ্টি করতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল সত্যের সন্ধান করে। সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সে প্রকৃতিতে বিরাজমান কিছু সূত্র খুঁজে পায়।

সৃষ্টির পরতে পরতে সত্য বা সূত্রের ছড়াছড়ি। প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট কাজটি কিভাবে সম্পাদিত হয় বিজ্ঞান সে সত্যটি কোন কোন ক্ষেত্রে উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর প্রাপ্ত সে সূত্রটিকে ব্যবহার উপযোগী করে মানুষের উপকারে কাজে লাগিয়েছে। খুঁজে পাওয়া কতগুলি সত্য দিয়ে মালা গেঁথে বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে প্রয়োজনীয় কিছু তৈরী করেছে। এগুলি মৌলিক সৃষ্টি নয়। প্রকৃতিতে বিরাজমান কতগুলি সত্যের সংযোজন বা বিয়োজন মাত্র। যেগুলি বিধাতা প্রকৃতিতে আদি থেকে সম্ভব করে রেখেছেন। যেখানে সত্য বিদ্যমান। যা ছিল মানুষের অজানা। বিজ্ঞান কেবল খুঁজে পায়। তাকে কাজে লাগায়। বিষয়টি অনেকটা পাজল গেইমের মত।

বিজ্ঞান অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি কিভাবে হলো, কে সৃষ্টি করলো, সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই, যদি থাকে তবে কি তার রূপ, কি তার আকৃতি প্রকৃতি, সৃষ্টির কারন কি এসব কিছুই বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে আজও জানতে ও জানাতে পারেনি। আছে কিছু তত্ত্ব। অন্তত আজকের দিন পর্যন্ত বলা যায়, এই যে বিজ্ঞানের এত জয় জয়কার এখানে এসে সে অসহায়।

বিজ্ঞানের এই অসহায়ত্ব মানুষকেও বিভাজিত করেছে। কেউ হয়েছে বিশ্বাসী আবার কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী। সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। কেবল কূটতর্ক করে চলেছে। এখানে এসে প্রবল প্রতাপে দাড়িয়ে আছে কিছু ধারণা বা দর্শন বা ধর্ম। পরিনামে বিশ্বাস-অবিশ্বাস। সেখান থেকে সামাজিক রিতি-নীতি, বিধি-বিধান নানান কিছু। বিশাল সংখ্যক মানুষকে তা প্রভাবিত করছে এবং এটিও সত্য যে, মানুষ সেসবকে গ্রহণ করছে।

এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এসব ধারণা ও বিধি বিধানের উৎপত্তি এবং যুগ যুগ ধরে তা মানব সমাজে বিদ্যমান থাকা সম্ভব হচ্ছে কোন সূত্রের কারনে। কোন সূত্র তাকে ধরে রাখার পেছনে কাজ না করলে তা টিকে থাকতে পারতো না। সৃষ্টি জগতে সূত্রের বাইরে কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এর অন্তর্নিহীত সূত্রগুলিকে ধরতে চেষ্টা করার বিষয়টিও বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু বিজ্ঞান কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনা করছে কি করছে না, কিংবা করবে কি করবে না সেটি একান্তই বিজ্ঞানের বিষয় নির্বাচনের বিষয়। বিজ্ঞান কোথাও কোন প্রচেষ্টা না চালালেও সত্য তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবেই।

'In the name of Allah ..'। আল্লাহর নাম স্মরণ করার মাধ্যমে কাজ শুরু করার এ নিয়ম-রিতি ধর্মীয় দর্শন বা দিক নির্দেশনা থেকে এসেছে। এসব নিয়ম-রিতির পরিপালন ও এর মাধ্যমে কোন লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশার বিষয়টি অলৌকিক কোন কারনে আবির্ভূত হয়নি। পেছনে কাজ করেছে মানব চরিত্র ও বৈশিষ্টের সূক্ষাতিসূক্ষ গুণাগুণের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত কোন সূত্রের কারনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টি। আলোচনার মাধ্যমে সে সব বিষয় বা সূত্রগুলিকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে চাই; যা মানবের ওপর সত্য বা সূত্র হয়ে কাজ করে; যে কারনে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার নামের স্মরণে সফলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে।

২. কিছু প্রাসংগিক ধারণা

সত্য সন্ধানের এই যে এত প্রচেষ্টা, এত আলোচনা, এত কর্মযজ্ঞ, এত প্রশ্ন- কিন্তু কেন? কার জন্য? সব কিছুই মানুষকে ঘিরে। মানুষের বিদ্যমানতা বা উপস্থিতির কারনে। কেবল মানুষ না থাকলেই এত কিছুর আর প্রয়োজন হতো না।

কোন একটি শুভ কাজের সূচনাকালে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা হয়। সৃষ্টিকর্তাকে কে স্মরণ করে? কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশাটি কার? কে তার কর্মের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে চেষ্টা করে? এসবের একটিই উত্তর; তা হলো 'মানুষ'। মানুষের সঙ্গে রয়েছে জগতের সকল কিছুর মিথস্ক্রিয়া।

ব্রহ্মান্ডের সবকিছুই মানুষের সকল কর্মকান্ডের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোনভাবে প্রভাব ফেলে। এ প্রভাবই মানুষকে কর্মে সফল কিংবা বিফল করে। হয়তবা কোনটির প্রভাব বেশী কোনটির প্রভাব কম।

একটি বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে অপর একটি বিষয়ের নিয়মের বা অন্যকথায় সূত্রের বন্ধন। তাই একস্থানে নাড়া পড়লে অন্য একটি স্থান উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় মানুষের কর্মের ফলাফলে। আবার নানান সব নিয়ম-রিতির পরিপালন ও এর মাধ্যমে কোন লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশার পেছনে মানবের চরিত্র ও বৈশিষ্টের নানান সব দিকও কাজ করে।

এত গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ; যার সঙ্গে রয়েছে সকল কিছুর বন্ধন; সত্য উন্মোচনের এ আলোচনায় সে মানুষ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত কতগুলি প্রাসংগীক বিষয় নিয়ে তাই কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এ আলোচনা সমগ্র আলোচনাটিকে যেভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি সেটি অনুধাবনে সহায়ক হবে।

সফলতা

মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে সফলতা প্রাপ্তির আশায়। এভাবে ধরে নিয়ে লেখাটি শুরু করেছি। সফলতা বলতে কি বুঝবো প্রথমে সে বিষয়ে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন। মানুষ অন্তরে যা পাওয়ার প্রত্যাশা করে তা অর্জন করা সম্ভব হলে সে নিজেকে সফল মনে করে।

মন্দ প্রত্যাশার পুরন কিংবা মন্দ পথে অর্জন কি তবে সফলতা বলে গন্য হবে? মন্দ প্রত্যাশার পুরন সফলতা নয়। সেটি সাময়িক তৃপ্তি এনে দিতে পারে সত্য, তবে ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। উপরন্তু এর সর্বশেষ পরিনতি সাধারণত পীড়াদায়ক হয়।

ছলে বলে কৌশলে নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে মন্দ পথে কোন অর্জন প্রকৃত অর্থে সফলতা নয়। কথাটি কেবল আদর্শিক নয়। এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পেছনে বাস্তব ভিত্তি ও যৌক্তিক কারন আছে। অভিজ্ঞতাও কথাটির সত্যতা প্রমাণ করে।

সূক্ষ ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে কোন কিছু অর্জন করা যায় এবং সাময়িক সময়ের জন্য বিশাল সফলতা বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা সুফল দেয় না। যার পরিণাম হয় অমঙ্গলজনক। পৃথিবী ও মানুষের ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে তাকালে এর সত্যতা পাওয়া যাবে।

মন্দ পথে অর্জনের মাধ্যমে কখনও একটি জীবন হয়তবা বেশ ভালভাবে অতিবাহিত হতে পারে, তবে সকলের ভাগ্যে সেটি জোটে না। কিন্তু প্রজন্ম? একজনের মন্দ কর্ম প্রজন্মকে বেশী পীড়া দেয়। সন্তানদের তারা অনিশ্চিত ও অনিরাপদ ভবিষ্যত উপহার দেয়। মন্দের ছোঁয়া যে কোন অর্জনকে ভঙ্গুর ও ক্ষনস্থায়ী করে দেয়। চিত্তকেও রাখে দুর্বল। এরূপ অর্জনকে সফলতা বলে বিবেচনা করা যায় না। কথাগুলি দীর্ঘমেয়াদের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে সফলতা হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী। যা হবে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেন অর্জন পরিতৃপ্তি ও সুনামের সঙ্গে চলতে পারে। যা মানসিক শক্তি ও প্রশান্তির কারন হবে। সেটি অর্জন করতে হলে মন্দ পথ পরিহার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

অতএব যিনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন অর্থাৎ বিশ্বাসী তার সফলতা অর্জনের শর্ত হলো মন্দ পথ পরিহার করে সেটি অর্জন করা। তেমন একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন মন্দ পথ পরিহার করে চলতে পারার সহায়ক শক্তিরূপে। কিন্তু সেটি কিভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করে সে সত্যটিই আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করবো।

সফলতা: বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী

মানুষকে মানুষ আবার অপ্রয়োজনীয়ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। কর্মে সফলতা প্রাপ্তিতে সৃষ্টিকর্তার স্মরণের বিষয়টি অবিশ্বাসীর ওপর

কাজ করে না। এটি কাজ করে বিশ্বাসীর ওপর। কেননা অবিশ্বাসী মূলত সৃষ্টিকর্তাতেই বিশ্বাস করে না। ফলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন, জবাবদিহিতা, দ্বায়বদ্ধতা এসবের বন্ধন থেকে সে মুক্ত। ধারণায় এ জীবনের পরবর্তীতে তার আর কোন বন্ধন নেই। কিন্তু বিশ্বাসীর জন্য মৃত্যু পরবর্তীতেও জবাবদিহিতা, দ্বায়বদ্ধতা এসবের বন্ধন রয়েছে।

সফলতার বিষয়টি তাই বিশ্বাসীর ওপর দু'ভাবে কাজ করে। এক: পার্থিব জীবনের সফলতা। দুই: মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা। ধারণা ও জীবন সম্পর্কিত দর্শনের পার্থক্যের কারনে দু'ধরনের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দু'রকম। ফলে আচরণও পার্থক্যপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দু'রকম মানুষই পার্থিব জীবনে সফলতা অর্জন করে। ফলে প্রত্যেকের ওপর সফলতা অর্জনের স্পৃহাটি কিভাবে কাজ করে সেটিও বোঝার চেষ্টা করবো।

সফলতা: ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক

লক্ষ্য অর্জনে সফলতা প্রাপ্তির আলোচনায় মানুষের ভাবনাটি মনের মধ্যে দু'ভাবে কাজ করতে পারে। এক: ব্যাক্তি মানুষের এককভাবে সফলতা অর্জন। যা মানব কল্যানে অবদান রাখতে গিয়ে আবার সামষ্ঠিক অর্জনের সঙ্গেও কোন না কোনভাবে যুক্ত। দুই: দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ বা সামষ্ঠিক মানুষের সফলতা অর্জন। যেটি বৃহৎ পরিসরে। যা সামগ্রীক পরিবেশের শান্তি ও কল্যানের সঙ্গে জড়িত। ঘুরে ফিরে সেটি আবার ব্যাক্তিক জীবনের কর্মকান্ডের সফলতার সঙ্গেও জড়িত। ফলে ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক জীবনের সফলতা একটি অপরটির পরিপুরক। তাই সত্য সন্ধানের এ আলোচনায় দু'টি বিষয়কেই বিবেচনায় রেখে বিষয়গুলিকে অনুধাবনের চেষ্টা করবো।

নেতা ও অনুসারি

মানুষের মধ্যে আরও দু'টি রকম আছে। এক দল যারা মানুষকে পরিচালনা করে। অপর দল যারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিয়ে আলোচনায় যত সূত্র আছে তার সব সূত্র সব রকম মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। নেতৃত্বদানকারী বা

পরিচালনাকারীদের জন্য এমন কিছু বিষয় প্রযোজ্য যা অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আবার অনুসরিদের জন্য প্রযোজ্য সকল বিষয় নেতৃত্বের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সত্য অনুধাবনের এ আলোচনায় উক্ত বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সহজাত ধর্ম

প্রতিটি পদার্থের কিছু নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট আছে। পদার্থ তার নিজ গুণ বা বৈশিষ্ট অনুযায়ী চলে। পদার্থের এসব গুণ বা বৈশিষ্টকে রাসায়নিক বা ভৌত ধর্ম নামে জানি। পদার্থ তার ধর্ম অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করে বা কাজ করে। পদার্থের ওপর আরোপিত এ গুণ, বৈশিষ্ট বা ধর্ম সৃষ্টির শুরুতে ভেতরে প্রবিষ্ট। শুরুতেই তাকে তার বৈশিষ্ট বা গুণাগুণের এসব শর্তসহ সৃষ্টি করা হয়েছে কিংবা সে সেটি তার বিরাজমান পরিবেশ থেকে অর্জন করে নিয়েছে। এগুলি তার সহজাত ধর্ম।

মানব দেহে যে সত্তার বসবাস তারও কিছু গুণ, বৈশিষ্ট বা ধর্ম আছে যা সৃষ্টির শুরুতেই সৃষ্ট বা মানবের মধ্যে প্রবিষ্ট। অর্থাৎ সৃষ্টিতেই আরোপিত সত্য। এগুলি তার সহজাত ধর্ম। যে ধর্ম সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বাধা প্রাপ্ত না হলে মানব সত্তা তার সহজাত ধর্ম অনুযায়ী চলে। আপনা থেকে সে তার সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহজাত ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটায়।

কান্না পাচেছ মানুষ কাঁদছে। হাসি পাচেছ মানুষ হাসছে। কোনরূপ বল প্রয়োগ করা না হলে এবং পরিবেশ তার অনুকুল হলে কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় সে তার স্বাভাবিক সহজাত ধর্মের প্রকাশ ঘটাবে। অর্থাৎ সে হাসবে নয়তো কাঁদবে। তার অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে নিজেকে প্রকাশ করে। কান্না করতে বারণ করা হলে কিংবা হাসতে বারণ করা হলে সে কান্না বা হাসি বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সে তার সহজাত ধর্মের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে করতে পারছে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাধা প্রাপ্ত হলে সহজাত ধর্মের প্রকাশে পরিবর্তন ঘটতে পারে।

রাগ-বিরাগ, হাসি-কান্না, ঘৃনা-ভালবাসা, স্বার্থপরতা-পরার্থপরতা, লোভ-নির্লোভতা, হিংসা-অহিংসা এমন অসংখ্য বিপরীতমুখী গুণাবলী মানুষের সহজাত ধর্মের অন্তর্ভূক্ত। মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে মনুষত্ববোধ ও পশুত্বের স্বভাব বিরাজ

করে। বলা যায় মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে বসবাস করে একটি ধনাত্মক শক্তি (Positive Force) ও একটি ঋনাত্মক শক্তি (Negetive Force)। সৃষ্টির শুরুতেই মানবের মধ্যে এ বিপরীতমুখী শক্তি বিরাজমান বলে দেখতে পাই। সহজাত ধর্ম বিপরীতমুখী হওয়া সত্বেও সহ অবস্থানে অবস্থান করে।

মানুষের সহজাত ধর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এক রকম। সহজাত ধর্মের বিপরীতমুখী বৈশিষ্টের উপস্থিতির কারনে একই ব্যাক্তির দ্বারা ভাল ও মন্দ বিপরীতমূখী দু'রকম কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। সহজাত ধর্ম একমুখী হলে মানুষ হতো কেবল ফেরেশতা নয়তো শয়তান। একটি ধনাত্মক ও অপরটি ঋনাত্মক শক্তির প্রতীক।

সুতরাং দেখা যাচেছ, মানুষের রয়েছে কিছু সহজাত ধর্ম। কোনরূপ বল প্রয়োগ করা না হলে সে তার অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজাত ধর্ম অনুযায়ী চলে। সহজাত ধর্মের গুণাবলী পরস্পর বিপরীতমুখী। ধনাত্মক ও ঋনাত্মক। সহজাত ধর্ম বিপরীতমুখী হওয়া সত্বেও সহ অবস্থানে অবস্থান করে। সহজাত ধর্মের বিপরীতমুখী বৈশিষ্টের কারনে মানুষ ভাল ও মন্দ বিপরীতমুখী দু'রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। বল কিংবা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহজাত ধর্মের প্রকাশে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সত্য অনুধাবনের এ আলোচনায় মানবের মাঝে উপস্থিত সহজাত ধর্ম বা বৈশিষ্টগুলিকে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। আরও যেসব বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন নিচে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

মানুষের রূপ

ভাল, মন্দ ও নিরপেক্ষ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানুষকে দেখা যেতে পারে। ভাল ও মন্দের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক। একই ব্যাক্তি কারও কাছে ভাল আবার কারও কাছে মন্দ হতে পারে। কিছু বিষয় সকলের দ্বারাই ভাল বা মন্দ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন- মিথ্যে বলা সকলের দ্বারা স্বীকৃত মন্দ কাজ।

পৃথিবীতে বস্তুত কোন ভাল বা মন্দ মানুষ নেই। আছে কেবলি মানুষ। ব্যাপক অর্থে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং মানুষের নিজের অভ্যন্তরীন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সে ভাল বা মন্দরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়।

চুম্বক যেমন দুই দিকের সম পরিমান টানে উত্তর দক্ষিনমুখী হয়ে স্থীর থাকে। কোন দিকে ছুটে যেতে পারে না। একটি স্থিতাবস্তায় মানব সত্তা তেমনি তার সহজাত ধর্মের ভাল ও মন্দ দুই দিকের সমপরিমান আকর্ষন বা টানে স্থীরতা প্রদর্শন করে। যেন শূন্যের ওপর ব্যালান্স করে একটি দড়ির ওপর দিয়ে হেটে চলেছে। কখনও ভালর দিকে কখনও মন্দের দিকে ঝুঁকে পরতে চায়।

ভাল ও মন্দের টানে সৃষ্ট মানবের এ স্থীরতা ভিন্ন একটি রূপ প্রদর্শন করে। যেটি ভালও না মন্দও না, ধনাত্মকও না ঋনাত্মকও না, সত্যও না মিথ্যেও না, ন্যায়ও না অন্যায়ও না। সমপরিমান বিপরীতমূখী টানে সে স্থীর। কোন রূপ প্রদর্শন করে না। তবুও সেটি আরেকটি রূপ। নিশ্চুপতা, নিশ্চলতা, নিরপেক্ষতা।

নিরপেক্ষতাকে কোন পরিবর্তীত পরিস্থিতীতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বাবস্থাও বলা যেতে পারে। নিরপেক্ষতা একটি অনিশ্চিত রূপ। মানুষের মধ্যে যদি কেবল একমূখী ভাল গুণ বিরাজ করতো তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে বলে দেয়া যেত যে সে ভাল পথটিতে গমন করবে। কিন্তু বিপরীতমুখী বৈশিষ্টের বিদ্যমানতার কারনে কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষ কোন পথটি বেছে নেবে অনিশ্চিত রূপের কারনে সেটি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয় না। সে মন্দ রূপেও আবির্ভূত হতে পারে।

মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হলে তাই তার মধ্যে একটি নিশ্চিত রূপের ধারাবাহিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বেশ অনুভূত হয়। বিশেষত যারা মানুষকে পরিচালনা করে বা করতে চায় তাদের জন্য। সত্য সন্ধানের আলোচনায় মানবের এই দিকগুলিকে বিবেচনায় রেখে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে বলে মনে করি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ভাল, মন্দ, নিরপেক্ষ মানবের তিনটি রূপ সম্পর্কে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তীত পরিস্থিতীতে মানব কোনরূপে আবির্ভূত হবে বা নিজেকে প্রকাশ করবে সেটি নির্ভর করে তার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ওপর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়টি মোটেই সহজ কোন বিষয় নয়। সামগ্রীক পরিবেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়টি মানুষের নানান হিসেব-নিকেশ, সুবিধা-অসুবিধা, স্বার্থ, লোভ, তাৎক্ষনিক ইচেছ, পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নিজ

দেহাভ্যন্তরের অবস্থা, পারিপার্শ্বীক অবস্থা, জীবন সম্পর্কিত তার দর্শন এমনি অসংখ্য সব জটিল বিষয়ের অংকের ওপর নির্ভর করে।

সহজাত ধর্মের ভাল ও মন্দ দুটো দিকই মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহনে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষাতিসূক্ষ প্রতিটি জটিল বিষয়ের যে কোন একটি যে কোন মূহুর্তে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সেটি ভালর দিকে যাবে নাকি মন্দের দিকে যাবে মানুষের অনিশ্চিত রূপের কারনে সেটি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কখনও মানুষ নিজেও সেটি নিশ্চিতভাবে জানে না। তাকে বোঝা কঠিন। তাকে নিয়ে চলাও কঠিন। তাকে পরিচালনা করা কিংবা তার দ্বারা পরিচালিত হওয়াও শংকামুক্ত নয়।

কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষ ভাল পথটি বেছে নেবে নাকি মন্দ পথটি বেছে নেবে, সেটি নির্ভর করে তার নিজস্ব হিসেব নিকেশের ওপর। তবে কখনও সেটি কাজ করে তার স্বাধীন ইচ্ছের ওপর, অন্তত ততক্ষন যতক্ষন সে চাপমুক্ত থাকে।

মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হলে তাকে বোঝা প্রয়োজন। তাই তার মধ্যে একটি নিশ্চিত রূপের ধারাবাহিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বেশ অনুভূত হয়। বিশেষত তাকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে। আবার তার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রেও।

স্বাধীনতা

মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। তাকে বাধা প্রদানে কেউ নেই, আবার তাকে কোন নির্দিষ্ট দিকে পরিচালনা করার মতও কেউ নেই। এটি মানুষের সহজাত একটি প্রাথমিক অবস্থা। এ অবস্থাটিকে মানুষের ওপর কোনরূপ ব্যবস্থা আরোপ করার পূর্বাবস্থারূপে ভাবা যেতে পারে।

এমনতর স্বাধীনতা ভোগ করাকালীন সময়ে সে বাধাপ্রাপ্ত না হলে বা তাকে কোনরূপ বিধান আরোপকরনের মাধ্যমে কোন দিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করা না হলে সে মন্দ পথে যেতেও দ্বিধা বোধ করার কথা নয়। বিশেষত স্বার্থ অর্জনে যখন তার ক্ষমতা থাকে। কেননা সহজাতভাবে অসংখ্য মন্দ প্রবৃত্তিও তাকে ভীষনভাবে আকর্ষন করে।

বাহির থেকে তার ওপর কোনরূপ বল প্রয়োগ করা না হলে বা কোনভাবে সে প্রভাবিত না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে তার আছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। প্রকৃতি কিংবা

সামাজের কোনরূপ চাপ কিংবা প্রভাব ছাড়া নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাকে বাধা প্রদানে সত্যিকার অর্থে কেউ নেই। সে মন্দ হয়ে রুদ্র রূপ ধারণ করতে পারে। আবার ভাল রূপেও আবির্ভূত হতে পারে। কিংবা নির্লিপ্ত থাকতে পারে। এটি তার তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ওপর নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে এটিই তার পূর্ণ বা চরম স্বাধীনতা।

চরম স্বাধীনতা ভোগের সুবিধার কারনে মানুষ যেন সামাজিক জীবনে কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য তার ওপর নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়।

সুপ্ত শক্তি

মানবের অভ্যন্তর এক আশ্চর্য্য শক্তির আধার! বলা যেতে পারে প্রচন্ড শক্তির আধার। শক্তিগুলিকে আমরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকি। যেমন- শক্তি, সক্ষমতা, যোগ্যতা, গুণাগুণ, সামর্থ, ইচ্ছে, আগ্রহ ইত্যাদি। ‘শক্তি’ শব্দটিকে এখানে এমনিতর বিষয়গুলির সমন্নয়ে ব্যাপক অর্থে ধরে নেয়া হয়েছে, যা কর্মে শক্তি, সক্ষমতা কিংবা স্বতঃস্ফুর্ততা প্রদান করে। মানুষের শক্তি ও সক্ষমতা অগনিত। মানুষ নিজেও তার সকল শক্তি ও সক্ষমতা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল নয়। তার অনেক সক্ষমতা সুপ্তরূপে বিরাজ করে। মানুষের সুপ্ত শক্তি বা সক্ষমতাগুলিকে তাই জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

সুপ্ত শক্তির জাগরণের ভাবনাটি ধারণায় দু'ভাবে কাজ করতে পারে। যেমন, কোন একজন একক ব্যাক্তির সুপ্ত শক্তির জাগরণ; আবার মানবজাতির সামগ্রীক সক্ষমতার উজ্জীবনকেও ভাবা যেতে পারে, যা সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে। আলোচনায় দুটি অবস্থাকেই বিবেচনায় রেখে বিষয়টি ভাবতে হবে।

প্রকৃতি ও পরিস্থিতির মোকাবেলায় অবতীর্ন হয়ে মানুষ তার ভেতরের গুপ্ত শক্তিগুলিকে চিনতে, জানতে বা আবিস্কার করতে পারে। মানুষ তার সামগ্রীক সক্ষমতার যে সব বিষয় সম্পর্কে আজকের দিন পর্যন্ত অবগত পূর্বে একটা সময়ে তার সেসব জানা ছিল না। আজ যা জানা নেই সময় এলে সেগুলোও মানুষ জানতে পারবে। মানবের এতসব শক্তি তার ভেতরে বিরাজ করে প্রাথমিক ও সুপ্ত অবস্থায়।

প্রয়োজন ও পরিবেশের সংস্পর্শে তীক্ষ্ণ ও ধারালো হয়ে জেগে ওঠে, কখনও জেগে ওঠাতে হয়।

স্রষ্টার যত গুণ তার সবই মানুষের মধ্যে বিরাজমান। মানুষ যদি স্রষ্টার গুণাগুণ নিজে অনুভব না করতো তবে স্রষ্টার এতসব গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারতো না। সৃষ্টিকর্তার গুণ মানুষের মাঝে বর্তমান। তাই সে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। তবে মানুষের মাঝে তা বিদ্যমান আংশিক ও বিচিছন্নভাবে এবং হয়তবা দুর্বলভাবেও।

সৃষ্টিকর্তার গুণের শেষ নেই- অন্তহীন। মানুষের গুণাগুণও তাই অন্তহীন, তবে স্বল্পমাত্রায় এবং প্রয়োজন ব্যাতিত সুপ্ত কিংবা বলা যেতে পারে একই সময়ে সব গুণ সমভাবে সবার মাঝে বর্তমান নয়। সব শক্তি সব সময়ে জাগ্রত হয়ে থাকে না। মানুষের মধ্য দিয়ে ততটুকু প্রকাশ পায়, যতটুকু মানুষ জাগিয়ে তোলে বা তুলতে পারে। মানুষ আবার নিজ গুণাগুণ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয় প্রয়োজন অনুভব সাপেক্ষে।

প্রয়োজনের অভাবে চচর্চার অভাব ঘটে। চচর্চার অভাবে শক্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে। শক্তির সুপ্তাবস্থার ফলে মনবল, উদ্যাম বা শক্তিহীনতার সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনে আবার মানুষ শক্তি ও যোগ্যতাটিকে জাগিয়ে তুলতে নিজেই সচেষ্ট ও যত্নশীল হয়।

মানবের শ্রেষ্ঠত্বের বড় কারন তার চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি। বুদ্ধির কারনে মানুষ আজ তার আজকের অবস্থানে। তথাপি শক্তি, বুদ্ধি কোনটিই কাজ করবে না যদি না মানুষ তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে উদ্যাম, সাহস এসব অনুভব করে। উদ্যাম ও সাহস অত্যান্ত গুরুত্বপুর্ন বিষয়। বিবিধ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে ব্যাটারির চার্জের মত মনে করা যেতে পারে। যন্ত্রের সব কিছু ঠিকঠাক কিন্তু চার্জ ভিন্ন চলতে অক্ষম। উদ্যাম ও সাহস বিনা সফলতা প্রাপ্তির আশা দুরাশা। কর্মে সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে ভেতরের সুপ্ত প্রয়োজনীয় নানান শক্তিকে জাগিয়ে তোলা তাই অতি আবশ্যক।

মানুষ যখন কর্মে নিয়োজিত হয়, সে তখন তার কর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলিকে অর্জন করার চেষ্টা করে। কর্মের যোগ্যতা বা তাকে ধারণ করার সক্ষমতা তার ভেতরে বিদ্যমান। কেবল পন্থা অবলম্বন করে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

মানব ইতিহাসে মানুষ অতীতে যা করে এসেছে, বর্তমানে যা করছে, ভবিষ্যতে যা করবে তার সকল কর্মের অন্তর্নীহিত শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা, সক্ষমতা সর্ব সময়ে ভেতরে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান। মানুষের যত শক্তি, যত যোগ্যতা, যত সৃষ্টিশীলতা তার সবই বিধাতা তার ভেতরে সম্ভব করে দিয়ে রেখেছেন। তা না হলে সামষ্ঠিকভাবে মানুষ অতীতে যা করে এসেছে, বর্তমানে যা করছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে তার কিছুই করতে সক্ষম হতো না। মানুষ যা করতে সক্ষম হয়েছে, হচ্ছে বা হবে মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব বলেই সেটি হয়েছে, হচ্ছে বা হবে। মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই সমস্যা সমাধানের বিকল্প বিবিধি ছক প্রবিষ্ট করানো রয়েছে। এটি সৃষ্টির শর্ত। যেমন কম্পিউটার যা যা করতে পারবে তা আগে থেকে নির্ধারিত। এর বাইরে কিছু করার কোন ক্ষমতা নেই, বিষয়টি তেমন। একক বা সামগ্রীক সক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াও নিশ্চয়ই আছে।

মানুষ গান গাইছে কিংবা হিসাব শাস্ত্রে অধ্যায়ন বা চর্চ্চা করে কর্মক্ষেত্রে তার সক্ষমতাকে প্রয়োগ করছে। মানুষ আজ এসব কাজ করছে। মানব জীবনে এমনও দিন ছিল যখন মানুষ এগুলো করতে সক্ষম ছিল না। এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো যোগ্যতা তার ভেতরে বিদ্যমান ছিল। যোগ্যতা বা গুণ বা এর ধারণ প্রক্রিয়া ভেতরে না থাকলে এ কাজগুলি করা কখনই মানবের পক্ষে সম্ভব হতো না। সাধনা, চর্চ্চা, গবেষনা যাই বলি না কেন নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে সে তার সুপ্ত যোগ্যতা, দক্ষতা বা সক্ষমতাকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছে। শানিত করেছে। সমস্যার মুখোমুখী হওয়া ও তার সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার এ গুণ মানুষকে দিয়ে তার ভেতরের পূর্বাঙ্কিত ছকের গুপ্ত বিষয়গুলিকে আলোকিত বা প্রকাশ করে চলেছে।

মানুষ তার সক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয় তখন যখন সে প্রয়োজন অনুভব করে। প্রয়োজন অনুভূত হয় জীবন, সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতির ইশারায়। যে আলোচনা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তায় গিয়ে গড়ায়।

প্রয়োজন অনুভূত হয় সময় ও যুগের জ্ঞান বিকাশের সমান্তরালে। অর্থাৎ বর্তমানে মানুষ কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে। মানুষ যখন কোন একটি নতুন বিষয়, গুণ বা সক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে সফল হয়, তখন মানবসভ্যতার জ্ঞানের ভান্ডারে একটি নতুন মূল্য সংযোজন হয়। মানবের মাঝে ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলে কর্ম সম্পাদন সহজ ও সম্ভব হয়।

সুপ্ত শক্তি বা সক্ষমতার জাগরণকে আরও দু'ভাবে ভাবা যেতে পারে। এক: যে শক্তি বা সক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বর্তমানে বিদ্যমান। অথচ ব্যাক্তিক পর্যায়ে কারও ভেতরে তা সুপ্ত। চাইলে শিক্ষা, প্রশিক্ষন ইত্যাদির মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। দুই: যে শক্তি ও সক্ষমতা সম্পর্কে মানব সমাজে জ্ঞান আজও বিদ্যমান নয়। চাইলেই জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। নতুন জ্ঞান আহরন প্রয়োজন। প্রয়োজন সন্ধান, অনুসন্ধান, গবেষনা ইত্যাদি। যেমন মনে করি হিসাব বিজ্ঞানের জ্ঞান বর্তমান সময়ে বিদ্যমান। ব্যাক্তিক পর্যায়ে কেউ চাইলে এ বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল জ্ঞান আজও মানব সভ্যতার ইতিহাসে সঠিকভাবে বিদ্যমান নয়। ফলে এ সম্পর্কিত সত্য ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ নব নব সক্ষমতাকে স্পর্শ করবে।

লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে প্রয়োজনীয় সুপ্ত গুণ, বৈশিষ্ট, শক্তি ও সক্ষমতাগুলিকে ভেতরের সুপ্তাবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা দরকার। আলোচনার উপসংহারে পৌঁছাবার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

অন্তরায়

সফলতা অর্জনের পথে অনেক অন্তরায় আছে। যেমন মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে বাস করে ভাল ও মন্দ গুণ। সহজাত ধর্মের মন্দ গুণ মানুষকে ভীষনভাবে আকর্ষন করে। মন্দ আকর্ষনকে উপেক্ষা করে ভাল পথে চলতে হয়। কিন্ত সে আকর্ষনকে জয় করা কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। মন্দকে দমন করার জন্য ভেতরের সুপ্ত ভাল গুণগুলিকে ভীষনভাবে জাগিয়ে তুলতে হয়। একজন ভাল মানুষের কাছে বিষয়টি সহজ বোধ হলেও, যাকে মন্দ থেকে ভালতে ফিরে আসতে হয় বা হবে তার কাছে বিষয়টি পাহাড় পরিমান কঠিন। লেখা-পড়ায় যার মন বসতে চায় না তাকে লেখাপড়ায় বসানো যেমন পর্বত প্রমাণ কঠিন, বিষয়টি তেমন। ফলে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় নিয়ে আসার বিষয়টি আদৌ সহজ নয়। মন্দকে ভালতে নিয়ে আসা কঠিন কাজ। কিন্তু সেটি করতে না পারার বিষয়টি ব্যাক্তিক এবং সামষ্ঠিক লক্ষ্য অর্জন বা সফলতার পথে বড় অন্তরায়। এ সকল অন্তরায়কে জয় করার জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

ওপরে উল্লেখ করেছি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহনে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এ স্বাধীনতার কারনে মানুষ মন্দ পথও বেছে নিতে পারে। উপরন্তু তাকে প্রতিহত করা বা যথেচছাচার করা থেকে বিরত রাখার মত কেউ নেই। মন্দ পথ তার সফলতার পথে নিশ্চিতভাবে অন্তরায়। যা তার সিদ্ধান্ত গ্রহনে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তাকে বাধা প্রদানে কোন উপায় না থাকার অনিবার্য্য পরিনতি। ফলে অবুঝ মানুষের অফুরন্ত স্বাধীনতা এবং তাকে চলার পথের সীমানা বেধে দিতে না পারার সীমাবদ্ধতা তার লক্ষ্য অর্জন ও সফল হওয়ার পথে বড় বাধা। এ সকল অন্তরায়কেও জয় করার জন্য মানুষকে কোন উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কাজে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যাম ও সাহস তথা কিছু মানসিক গুণাবলী অতীব জরুরী উপাদান। সাহসটিকে জাগিয়ে তোলার পথে কম্পিউটার গেইমের লেভেল পেরুনোর মত পদে পদে আছে অনেক অন্তরায়। বিশ্বাসহীনতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব। পারবো কি পারবো না। হবে কি হবে না। দ্বিধাদ্বন্দ। সন্দেহ। ভয়। ভয় থেকে সৃষ্ট হৃদকম্পন ইত্যাদি নানান উপসর্গ।

টেলিফোনের দীর্ঘ তার পেঁচিয়ে যেমন জঞ্জাল সৃষ্টি করে যা ছুটানো ভারি মুশকিল। ছুটাতে গেলে আরও জট পাকিয়ে যায়। কখনও আটকা পরে যায়। তেমনি করণীয় সহজ কাজটিকেও অনর্থক জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে দেয় নানাবিধ শংকা জাতীয় মানসিক জটিলতা। যা অন্তরে জটিল জঞ্জালের সৃষ্টি করে। ফলে ভেতরে সুপ্ত উদ্যাম, শক্তি, সাহস, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতে না পারার ব্যার্থতাও জীবনে সফল হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে কাজ করে।

সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারার সঙ্গে মানুষের কর্মে সফলতার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা দুরূহ কাজ। মানুষ ও মানব জীবনের সফলতার পথে বড় অন্তরায় সামষ্ঠিক মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে না পারা বা সঠিক কোন পথের দিশা দিতে না পারা।

মূলত দুটি বিষয় মানুষের সফলতার পেছনে বড় অন্তরায় হয়ে কাজ করে। এক: ব্যাক্তিক পর্যায়ে মানুষের ভেতরের সুপ্ত গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতে না পারা। দুই: সামষ্ঠিক মানুষকে সঠিক পথে চালিত করতে না পারা। অন্যকথায় সঠিক কোন পথের দিশা দিতে না পারা। যা পরিনামে মানবের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যার্থ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাসমুহকে জয় করে মানুষ আজ সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একদিন মহাবিশ্বে একাকী মানুষকে জংগলের হিংস্র পশুর সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে। ছিল না কোন দিক নির্দেশনা। আজকের জ্ঞান সেদিন অবর্তমান ছিল। আবার নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে শুরু করে নানান চড়াই উৎরাই মানুষকে পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে। অন্তরায়সমুহকে জয় করে সফল হওয়ার পথে মানব অন্তরে সৃষ্টিকর্তার স্মরণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানব জীবনে এ স্মরণের ভূমিকা কিভাবে কাজ করেছে আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সত্যটিকে খুঁজে পেতে চাই।

ড্রাইভিং

গাড়ি চলছে। ষ্টিয়ারিং হাতে আছে। কিন্তু গন্তব্য জানা নেই। জানা নেই কোথায় যেতে হবে। কেন যেতে হবে। কিভাবে যেতে হবে। পথ হারাতেই পারে।

দিক নির্দেশনাবিহীন জীবন উদ্ভ্রান্তের মত। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। জীবনের লক্ষ্য জানেনা। কতদুর যেতে হবে, কি করতে হবে জানেনা। যথেচ্ছাচার জীবনযাপন করতে তাই দ্বিধাবোধ হয় না। কিংবা বলা যেতে পারে লক্ষ্যহীন জীবনের অনিবার্য্য পরিনতিই হচ্ছে যথেচ্ছাচার করা।

চলতি গাড়ির ষ্টিয়ারিং ছেড়ে দিলে গাড়ি থেমে যাবে না। চলবে ..। সে নিজের এবং অন্যের দুর্ঘটনার কারন হবে।

পৃথিবীতে মানুষ যেহেতু এসেই পরেছে। ভেতরে প্রাণও আছে। অতএব সে চলছে .. এবং চলবে ..। পথের সন্ধান না পেলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। আবার পথ জানা সত্ত্বেও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে ভূল পথে চলবে। নিজের এবং অন্যের ক্ষতির কারন হবে।

দিক বা পথ নির্দেশনাবিহীন জীবন যেমন উদ্ভ্রান্তের মত, তেমনি পথ নির্দেশনা জানা থাকা সত্ত্বেও সেটিকে শক্ত হাতে ধারণ না করে হাল ছেড়ে দিলেও বিপদের সম্ভাবনা।

ব্যাক্তি মানুষের ভেতরের সুপ্ত গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতে এবং সামষ্ঠিক মানুষকে একটি লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করতে প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা।

আবার নেতৃত্বের মাধ্যমে সে পথ ধরে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া বা ড্রাইভ করার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ড্রাইভ করা প্রয়োজন ভূল ও শংকা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। ড্রাইভ করা প্রয়োজন সঠিক পথ ধরে তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যে পথে ড্রাইভ করতে হবে সে পথটি জানা থাকতে হবে, কিংবা জেনে নিতে হবে। মানব জীবনে তাই একটি সঠিক পথের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা দারুনভাবে অনুভূত হয়।

৩. দিক নির্দেশনা

দিক নির্দেশনা

গড সলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। তাঁর কাছে কিছু চাইতে বললেন। সলোমন ধন, সম্পদ, ক্ষমতা, দীর্ঘায়ু কিছুই চাইলেন না। চাইলেন জ্ঞান। যে জ্ঞান ভালো ও মন্দের পার্থক্য নিরূপনে সহায়তা করে। সলোমনের প্রার্থনায় গড অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি তাকে সম্পদ ও জ্ঞান উভয়টিই অকাতরে দান করেন। উদ্ধৃতিটি বাইবেল থেকে নেয়া। বস্তুত এ প্রার্থনার মাধ্যমে সলোমন গডের কাছে একটি সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন।

মানবজাতির জন্য যুগে যুগে নানানভাবে নানান সমাজে কোন না কোন দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছে। যুগে যুগে সময়োপযোগী সঠিক পথের দিক নির্দেশনা ভিন্ন মানুষ আজকের সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারতো না।

দিক নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জাতি হিসেবে মানবজাতি পৃথিবীতে যেদিন প্রথম পদার্পন করেছে, সেদিন থেকে প্রতি মুহূর্তে তার জন্য দিক বা চলার পথের পথ নির্দেশনা প্রয়োজন হয়েছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনের কারনে বর্তমানে সকল ব্যবস্থাগুলি এমন যে, খুব সহজেই আমরা সব ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে একটি দিক নির্দেশনা পেয়ে যাচ্ছি। আশে পাশের মানুষ থেকে পেয়ে যাচ্ছি। অভিজ্ঞদের থেকে পেয়ে যাচ্ছি। ফলে এর গুরুত্ব অনুধাবনের সময়টিও পাচ্ছি না। একটি রিমোটের বাটনের চাপে যেন সবকিছু প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছি। অথচ এ পর্যায়ে আসতে জটিল এ জগতে নানান পথ ও পথ নির্দেশনার হাত ধরে চলতে হয়েছে মানুষকে। আজও কিছু মানুষকে সে সব জ্ঞান ধারণ করে রাখতে হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যদি কোন কারনে কখনও তা হারিয়ে ফেলে, তবে সে আবার সুখী অবস্থা থেকে আদিম অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তাকে আবার পথের সন্ধান করতে হবে। যেমন প্রথম মানবকে করতে হয়েছিল।

সাধারণ দৃষ্টিতে ভাল মন্দের পার্থক্য নিরূপনের বিষয়টি অতি সহজ মনে হতে পারে। সেটি মনে হতে পারে বর্তমান সময়ের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সহজলভ্যতার কারনে। কিন্তু মানুষতো একদিনে এ পর্যায়ে আসেনি। মানব সভ্যতার

ইতিহাসে প্রাথমিক সময় বলেও একটি সময় ছিল। সে বিষয়টিও স্মরণে রাখতে হবে। এমনকি আজও কোন বিপদের মুখোমুখী হলে মানুষকে কোন দিক নির্দেশনা বা সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দিশেহারা হতে হয়।

কোন কোন পর্যায়ের মানুষের একটি ভূল সিদ্ধান্ত গোটা জগৎ সংসারকে অশান্ত করে তুলতে পারে। এটি হতে পারে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবজনিত কারনে। ভাল মন্দের পার্থক্য নিরূপনে ব্যার্থতার কারনে।

জটিল দোদুল্যমান অবস্থায় কেউ আবার ভাল মন্দের পার্থক্য নিরূপনেই ব্যার্থ। কেউ মন্দ কর্মটিকে ভাল মনে করে করছে! আবার একজনের কাছে যেটি ভাল অন্যের কাছে সেটি মন্দ মনে হতে পারে। বিষয়গুলির সঙ্গে কখনও স্বার্থও জড়িত থাকে। ভাল মন্দের পার্থক্য নিরূপনের বিষয়টি তাই শুনতে যত সহজ, বাস্তবে তার নিরূপন ততটা সহজ নয়। আবার জেনে-শুনে-বুঝেও অনেকে ভূল পথে পা বাড়ায়। নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। এ এক জটিল অংকের খেলা। অনেক বিষয় এর ওপর কাজ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষের আছে বিপরীতমুখী সহজাত ধর্ম। সিদ্ধান্ত গ্রহনে তার আছে অবাধ স্বাধীনতা। অসংখ্য মন্দ দিকও তাকে ভীষনভাবে আকর্ষন করে। তাকে বাধা প্রদানে কেউ নেই। তার প্রকৃত রূপটি বোঝা তাই সহজ নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষ সুবিধাজনকভাবে ভাল কিংবা মন্দ কোন রূপটি বেছে নেবে, সেটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার সুপ্ত প্রকৃত রূপটি অনিশ্চিত।

মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হলে তাই তার মধ্যে একটি নিশ্চিত রূপের ধারাবাহিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বেশ অনুভত হয়। বিশেষত তাকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে। আবার তার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রেও। কেননা এটি মানুষকে বুঝতে সহায়তা করে।

এক হিসেবে মানুষকে কোন নির্দিষ্ট দিকে পরিচালনা করার মত কেউ নেই। এটি মানুষের সহজাত একটি প্রাথমিক অবস্থা। এ অবস্থাটিকে মানুষের ওপর কোনরূপ ব্যবস্থা আরোপ করার পূর্বাবস্থারূপে ভাবা যেতে পারে। এমনতর স্বাধীনতা ভোগ করাকালীন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত না হলে, কিংবা তাকে কোনরূপ বিধান দ্বারা সঠিক

পথে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা নেয়া না হলে, সে মন্দ পথে যেতে দ্বিধাবোধ করার কথা নয়।

স্বার্থ যদি অক্ষুন্ন থাকে এবং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, চিত্ত যদি বিনোদিত হয় এবং সঙ্গে যদি থাকে ক্ষমতা ও শক্তি, তবে ক্ষণকালের এ এককালীন জীবনে যথেচ্ছাচারিতায় বাধা কোথায়? কেনই বা মানুষ তার মুঠোয় থাকা শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ না করে ভোগ-উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে?

মানবের অগাধ স্বাধীনতা- যে স্বাধীনতা তার স্বেচ্ছাচার আচরণকেও সম্ভব করে তোলে, বস্তুত সে স্বাধীনতা ভোগের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাড়াতে পারে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা। ভাল মন্দের বিধি-নিষেধ দিক নির্দেশনা থেকেই আসে। সঠিক দিক নির্দেশনাই সঠিক চিন্তা ও সুস্থ ধারণা মস্তিস্কে প্রবশে করায়। দিক নির্দেশনা প্রদত্ত ভাল মন্দের পার্থক্যপূর্ণ জ্ঞান মানবের যথেচ্ছাচার আচরণের পথে বাধা হয়ে কাজ করে। এটি কাজ করে মানসিক বাধা হয়ে। মানসিক বাধা হচ্ছে সর্বপ্রথম বাধা। এটিকে নিজ থেকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু মানুষ কি তা মেনে চলবে? কেন? মানুষ যেন প্রদর্শিত সঠিক পথ অনুসরণ করে চলে, সে কারনে কিছু উপায় অবলম্বন করতে হয়।

সঠিক পথে চলতে মানুষকে বাধ্য করা যায় না। কোন দিক নির্দেশনা মানুষকে সঠিক পথে জোরপূর্বক চালাতে পারে না। তবে এর জ্ঞান বহু মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে। যে জ্ঞানের অভাবে হয়তবা যারা আজ সঠিক পথে চলছে তারাও ভূল পথে চলতে পারতো। জ্ঞানের কারনে তারা স্বেচ্ছায় বা নিজ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথটিকে ধারণ করে আছে। বস্তুত জ্ঞানের অভাবই মানুষকে ভূল পথে চলতে সহযোগীতা করে। সঠিক জ্ঞান প্রবেশ করলে মস্তিস্ক মানুষকে সে পথে চলতেই পরামর্শ দেয়।

কিছু মানুষ চিরকাল জেনে বুঝেও ভূল পথে পা বাড়ায় এবং বাড়াবে। জগতের যত সমস্যা এদেরকে নিয়ে। এটিও বিধাতার এক সৃষ্টি। তাদের বাধাদানের পন্থা ভিন্ন। তাদের কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে মানুষেরই অপর আরেকটি দল। গড়ে তুলতে পারে শক্ত প্রতিরোধ। সামাজিক প্রতিরোধ। সেভাবেই সত্যিকার অর্থে মন্দকে প্রতিহত করা সম্ভব।

"... যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

মন্দের বিপক্ষে সামাজিক এ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলতেও দিক নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ধারণা ও শক্তির উৎস মূলত নানাবিধ দিক নির্দেশনা প্রদত্ত প্রেরণা থেকেও আসে। সঠিক পথ প্রদর্শন করে তেমন কোন দিক নির্দেশনাকে চলার পথের পাথেয় হিসেবে বাছাই করে নেয়ার বিষয়টি তাই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা কোনটি? সত্যিকার অর্থে এর একক কোন সঠিক উত্তর হতে পারে না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে জীবনের নানান বিষয়ে নানান দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। জ্ঞান দ্বারা বিচার বিবেচনা করে ব্যাক্তি ও সমাজকে নিজেদের জন্য সেটি নির্ধারণ করে নিতে হবে।

মানুষের দ্বারা গ্রহণযোগ্য না হলে কোন দিক নির্দেশনা কাজ করবে না। মন্দের বিপক্ষে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেটি কার্যকর ভূমিকাও পালন করতে পারবে না। তাই সঠিক কোন দিক নির্দেশনাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জীবন ও সমাজের জন্য কোন একটি দিক বেছে নিলে তাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করাও প্রয়োজন। সেটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করে রাখার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যথায় বিষয়গুলি মানবের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে না। ফলে সেটিকে কাজে লাগিয়ে উপকার পাওয়া সম্ভব হবে না।

জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে ভূমিকা রাখে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে, কুসংস্কার দূরীকরনে ভূমিকা রাখে তেমন কোন দিক নির্দেশনাকে সঠিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সত্যি বলতে সঠিক দিক নির্দেশনার কারনেই মানুষ জীবনকে অর্থবহ দেখতে পায়।

পৃথিবীতে যেদিন প্রথম মানব পদার্পন করেছিল সেদিন চলার পথ জানা ছিল না। প্রকৃতি প্রসূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে মানুষকে ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। এটিই সৃষ্টিকর্তা প্রদর্শিত চলার পথ প্রদর্শনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। সেদিন থেকে পার্থিব সকল দিক নির্দেশনার গোড়াপত্তন। ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যা আজকের পর্যায়ে এসেছে।

আজকের পৃথিবী যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ইতিহাসের সে ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে আজকের জ্ঞান, বিজ্ঞানসহ সকল অগ্রগতি। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার প্রাথমিক পর্যায়ের অবদানকে অশ্রদ্ধা করার অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে আজকের সভ্যতাও আদিম মনে হতে পারে।

জগতের শ্বাপদ-সংকুল পথে চলতে গিয়ে যারা পূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে অথবা জ্ঞান অর্জন করেছে- তারা পরবর্তীদের সঠিক পথ সম্পর্কে জানাতে পারে। তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের অর্জন পরবর্তীদের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। সে সব পথ নির্দেশনা বিভিন্ন উপায়ে মানব সমাজে প্রচারিত, প্রসারিত ও সংরক্ষিত হয়ে আছে। আজও যার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। তবে প্রাথমিক জ্ঞানকে আকড়ে ধরে রেখে অগ্রগতিকে অস্বীকার করা কিংবা তার সাথে তাল রেখে এগিয়ে যেতে না পারাও হবে চরম বোকামি বা মূর্খতা।

নানান বিষয়ে অর্জিত মানুষের অভিজ্ঞতা, বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এসব থেকে উৎপত্তি ঘটেছে নানান মত, পথ ও দর্শনের। দর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দর্শন মানুষকে পথ প্রদর্শনে সহায়তা করে। মূলত জীবন ও জগত সম্পর্কিত নানান দর্শনই মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে।

দিক নির্দেশনা ও দর্শন

দর্শনের বিচরন সর্বত্র। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা খন্ডিত অনেক কাজ করে চলেছি। ভাববারও সময় পাচ্ছি না। সন্ধান করলে বেড়িয়ে আসবে তার আদি। যেখানে রয়েছে দর্শন। সকল কাজের উৎপত্তির একটি কারন ও যৌক্তিকতা আছে। যা খুঁজে পাওয়া যাবে দর্শনে।

আপাতদৃষ্টিতে মানবের চালিকা শক্তি তার গৃহীত সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ একটি কদম চলতে পারে না। সে যখন চলার সিদ্ধান্ত নেয় তখন চলে। সে যখন না চলার সিদ্ধান্ত নেয় তখন চলে না। সে যেমন সিদ্ধান্ত নেয় তার চলাচলটি হয় তেমন।

মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহনে জীবন ও জগত সম্পর্কিত তার দর্শন প্রভাব ফেলে। দর্শনের শিক্ষা দ্বারা সে পরিচালিত হয়। দর্শন জীবনকে তার প্রদত্ত জ্ঞানের

নির্দেশনা অনুযায়ী চালনা করে। মানবকে ড্রাইভ বা পরিচালনা করে মূলত তার গৃহীত জীবন দর্শন। জীবন দর্শনই দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে।

নাস্তিক্যবাদের দর্শন মানব জীবনকে একভাবে চালনা করে। আস্তিক্যবাদ চালনা করে আরেকভাবে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রত্যেকেই যার যার দর্শনের শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত। ব্যাক্তি, সমাজ বা জীবন সকল ক্ষেত্রে দর্শনের উপস্থিতি লক্ষনীয়।

পূঁজিবাদবাদী সমাজ একভাবে চলে। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র, স্বৈরতান্ত্রিক সমাজ নিজ নিজ দর্শনের দেখানো পথে চলে। ভোগবাদী সমাজ একভাবে চলে। কল্যান রাষ্ট্র একভাবে চলে। ব্যাক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা জীবন সকল ক্ষেত্রে দর্শনের রয়েছে শক্তিশালী প্রভাব।

পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যাবস্থাপনা জীবনের করণীয় প্রতিটি কর্মযজ্ঞের পেছনে রয়েছে দর্শন।

দর্শনের দেখানো পথে একটুখানি ভূল জগত সমাজ ও সংসারকে ভূল পথে নিয়ে যেতে পারে। একটি ভাল দর্শনের ভূল বা অপব্যাখ্যাও জীবন ও জগতকে ভূল পথে নিয়ে যেতে পারে।

'জোর যার মুল্লুক তার' কিংবা 'সারভাইবেল অফ দ্যা ফিটেষ্ট' বা 'বন্দুকের নল সকল ক্ষমতার উৎস' এমনিতর নানাবিধ খন্ডিত শ্লোগানও সমাজ ও জীবন পরিচালনায় প্রভাব রাখে। যার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

দর্শনের মধ্যে নিহিত থাকে স্বপ্ন। ইংরেজীতে যাকে বলি ভিশন। দর্শন জীবনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে এবং দেখায়। নানান স্বপ্নকে সামনে রেখে মানুষ ছুটে চলে। স্বপ্ন সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলের পক্ষে তা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। জীবনের খন্ডিত কোন একটি অংশের জন্য একটি রূপকল্প তৈরী করা তুলনামূলক সহজ কাজ। কিন্তু সামগ্রীক জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি রূপরেখা তৈরী করা অসাধ্য সাধন। যারা করে গিয়েছেন তাঁরা মহামানব। তাদের রচিত স্বপ্নকে সামনে রেখে আজও মানুষ আঁধারে আলোর পথ ধরে চলার প্রয়াস পায়। তাদের প্রদর্শিত পথ বা জীবন দর্শন চলার পথে আলোর দিশারী হয়ে কাজ করে।

স্বপ্নগুলি মানব মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ প্রোগ্রাম হয়ে কাজ করে। পথ প্রদর্শন করে। নির্দেশনা দেয়। মানুষ তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে যৌক্তিকতা সৃষ্টি করে। অতঃপর কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তা অর্জনে সচেষ্ট হয়।

নোঙ্গর যেমন তার লম্বা শিকলের পরিধীর মধ্যে জাহাজকে বেঁধে রাখে। কোন দর্শনে আস্থা স্থাপন তেমনি মানবকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেও নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দর্শন জীবনের জন্য সুশৃংখল সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করে।

জীবনকে একটি সুশৃংখল সীমানার মধ্যে আনতে ব্যার্থ হলে মানুষ যথেচ্ছাচার করবে। নয়তো ক্ষমতার বাইরে কল্পনার জগতকে ছুঁতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলবে। কিংবা বিশাল ব্রম্মান্ডে নিজের গন্ডি বুঝতে অক্ষম হয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুড়ে বেড়াবে।

একটি দর্শনের ছায়াতলে পথ চলা মানব জীবনের জন্য তাই সুবিধাজনক। কিন্তু অসুবিধাজনক হচ্ছে একটি দর্শনকে বেছে নেয়া। একটি পরিশুদ্ধ বা সঠিক দর্শন কোনটিকে বলা যেতে পারে? এর কোন একক সঠিক উত্তর নেই। যৌক্তিকভাবে মুগ্ধ হলে মানুষ কোন একটি দর্শনের দেখানো পথে অন্তর থেকে আস্থাশীল হতে পারে। আস্থা স্থাপিত হলে সে দর্শনের গন্ডির মধ্যে বাধা পরে যায়। জন্মগত কারনেও মানুষ কোন জীবন দর্শনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। দর্শন যদি ভাল পথ নির্দেশ করে তবে মানুষ ভাল পথের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে।

খুবই নড়বড়ে প্রাণী মানুষ। তাকে বোঝা মুশকিল। সুনির্দিষ্ট রূপে তাকে শক্তভাবে বেঁধে রাখা না গেলে সে অনিশ্চিত রূপ ধারণ করে। কখন সে কোন রূপ ধারণ করবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। যে কোন সময় সে তার রূপ পরিবর্তন করে ফেলতে পারে।

কোন দর্শনের ছায়াতলে মানুষকে নিয়ে আসা সম্ভব হলে তাকে একটি নির্দিষ্ট রূপে দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে মানবের অনিশ্চিত রূপকে একটি নিশ্চিত রূপ দান করা সম্ভব হয়। তাকে জানা ও বোঝা সহজ হয়। ফলে তাকে পরিচালনা করা সহজ হয়। যারা মানুষকে পরিচালনা করে বা করতে চায় তাদের জন্য বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ কেবল তার দেহ নয়। তার একটি ভেতর আছে। সেখানে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এই ভাল তো এই মন্দ। তার সহজাত ধর্ম দ্বিমুখী প্রবনতা

প্রদর্শন করে। মানুষ নিজেও নিজেকে সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। তার সব কিছু তার নিজের নিয়ন্ত্রনে নয়। সেখানে যেমন আছে নিরীহ প্রাণীর চরিত্র। আছে হিংস্র প্রাণীর বৈশিষ্ট। নিরীহ প্রাণী ডাক শুনে চলে আসে কিংবা তার কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু হিংস্র প্রাণীর কাছে যাওয়া যায় না। শুনাতে চাইলে শুনে না। আক্রমন করতে চায়। তাকে পোষ মানাবার অবিরাম চেষ্টায় রত থাকতে হয়।

দর্শন হিসেবে ধর্ম মানবের অন্তরস্ত হিংস্রতাকে পোষ মানাবার পথ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়। নানান উপায় বাৎলে দেয়। ধর্ম মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশে নানাবিধ বিধি-বিধানের অবিরাম চর্চ্চার মাধ্যমে তার বাস্তবায়নকেও সম্ভব করে তোলে।

নির্জ্ঞানতার ফলে মানবাত্মা মন্দ পথে সহজাতভাবে ধাবিত হতে চায়। সঠিক দর্শনের পথ ধরে চললে মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিটি একক ব্যাক্তির নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক ও সামষ্ঠিক সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রনের জন্যও সহায়ক। ধর্ম প্রতিটি ব্যাক্তি মানুষের বিকাশ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠাকরনের মাধ্যমে ব্যাক্তিক, সামষ্ঠিক তথা সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃংখলা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দিক নির্দেশনা ও ধর্ম

দর্শনের উপস্থিতি সর্বত্র। ধর্মীয় জীবন বিধান সমুহও এক একটি দর্শন। দর্শন ব্যাতিত কোন ধর্ম নেই। দর্শনে যখন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি থাকে তখন সেটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। মানব জীবনে দিক নির্দেশনা বা পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে ধর্মসমুহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দর্শন হিসেবে ধর্ম সৃষ্টিকর্তার ধারণার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক।

একটা সময় ছিল যখন জৈবিক তাড়না মানুষকে প্রতিদিন তাড়িত করেছে। পরোক্ষভাবে সে তাড়নাই ছিল মানুষকে চালিত করার দিক নির্দেশনা। বিশেষত ক্ষুধা মানুষকে দিকবিদ্বিক ছুটে বেড়িয়েছে। পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে মানুষ। হয়েছে বিচ্ছিন্ন। একে অন্যেরটা জোরপূর্বক দখল করে নেয়ার চেষ্টা করেছে। বিশৃংখলার

আবির্ভাব ঘটেছে। জীবনাচরন ছিল যথেচ্ছাচার। জীবনের সামগ্রীক লক্ষ্য জানা ছিল না। ধরে নেই এসব অনেক অনেক দিন আগের কথা।

উদ্দেশ্যহীন এমনিতর বিশৃংখল জীবন ও জগত অনুসন্ধানি মনকে ভাবিয়েছে। ভাবনার ফলস্বরূপ আবির্ভাব ঘটেছে নানান দর্শনের। সকল দর্শনকে পরিশেষে একটি কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতে হয়েছে। কোন মহা শক্তিধরের কাছে। সে শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে কখনও রাজা, রাণী, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, শাহেনশাহ, বাদশাহ ইত্যাদি। কালে কালে এগুলি বিতর্কিত হয়েছে। শক্তিশালী হয়েছে পার্থিব কর্মকান্ডের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাবদিহিতার ধারণার। সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাবদিহিতার ধারণা মানবের ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক উচ্ছৃংখল জীবনাচরনকে সুশৃংখল নিয়মবদ্ধ করতে ভূমিকা রেখেছে। জীবন পরবর্তী জীবনের ধারণা মানব জীবনকে করেছে অর্থপূর্ণ। মানব জীবনের জন্য একটি সামগ্রীক লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

রাজা, রাণী, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী বা কোন মানবের একার পক্ষে মানব সমাজকে সুশৃংখল নিয়মে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি। আজও সম্ভব নয়। ব্যাক্তি, দল বা গোষ্ঠীসমুহের পারস্পরিক চাপ সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখে সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র এ একটি শক্তি এককভাবে মানুষের ওপর কাজ করে না। আরও অনেক বিষয় ক্রিয়া করে। সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নানান জীবন দর্শন এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় দর্শনসমুহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাবদিহিতার ধারণা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। পৃথিবীব্যাপি বিশাল জনগোষ্ঠীর ব্যাক্তিক ও দলগত জীবনকে দারুনভাবে প্রভাবিত করছে ধর্ম।

ধর্মের দিক নির্দেশনা আবর্তিত হয় সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। যা বাস্তবে নেই। ধরা যায় না। ছোঁয়া যায় না। দেখা যায় না। অথচ মানুষের ওপর তার প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে।

মনুষ্যবিহীন পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন ছিল না। আবার যদি কেবল আদম এবং হাওয়াই বসবাস করতো, তবুও পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন হতো না। জগত জুড়ে বিশাল সংখ্যক মানুষের ব্যবস্থাপনা এবং শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার প্রয়োজনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্ম মানুষের ব্যাক্তিক উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশের মাধ্যমে সামষ্ঠিক মানুষকে পরিচালনায় ভূমিকা রেখে চলেছে প্রাচীনকাল থেকে।

যখন কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজ ভীষনভাবে কলুষিত হয়েছে তেমন সময়ে উক্ত সামজে কোন মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে। তার সঙ্গে এসেছে জীবন দর্শন ও ধর্ম। অন্ধকারের হাত থেকে মানব জীবনকে আলোর পথ প্রদর্শন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম। বিধাতার পরিচালন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বিষয় এগুলি।

কালে কালে স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মকেও নিজেদের হীন স্বার্থে কাজে লাগিয়ে কলুষিত করেছে। করেছে বিতর্কিত। যা ধর্মীয় দর্শনের বা রিতি-নীতির সমস্যার চাইতেও অপব্যবহারকারীদের প্রয়োগের সমস্যারূপেই বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজকের দিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে ধর্মসমুহের চাইতে উত্তম কোন একক দর্শনের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। বিশেষত এ কারনে যে, ধর্ম জবাবদিহিতার ধারণা ও পরবর্তীতে প্রত্যেক ব্যাক্তির কর্মের ফলাফল প্রদানের ধারণার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। যা মানব জীবনকে অর্থপূর্ণ ও প্রাণবন্ত ও জবাবদিহিমূলক করে গড়ে উঠতে ভূমিকা রেখেছে।

ধারণার দিক থেকে হলেও সৃষ্টিকর্তাবিহীন জীবন দায়িত্বহীন, যা যথেচ্ছাচার জীবনাচরনের সম্ভাবনাকে রোধ করে না। যদিও অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ তেমনটি করে না। তবে তেমন মানুষের সংখ্যাটি পৃথিবীর সমগ্র মানুষের তুলনায় নিতান্তই নগন্য এবং সেটিও একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব বদান্যতা। দর্শনের নয়।

পরবর্তী প্রত্যাশাবিহীন জীবন ধারণার দিক থেকেও বর্তমান জীবনকে অর্থহীন, বর্ণহীন, হতাশাযুক্ত ও নিরানন্দময় করে দেয়। অন্যায়কারী অন্যায় করে নিদেনপক্ষে মানসিকভাবে হলেও চিরদিনের জন্য পার পেয়ে যায়। পরপারে চলে যাওয়া ভূক্তভোগীর কোনরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই। বর্তমান জীবন-যাপনকারীদের জীবনকেও উচ্চৃশংখল হতে উৎসাহিত করে। জীবন হয়ে যায় প্রত্যাশাবিহীন হতাশার।

সত্যি বলতে বাস্তব জীবনও এক অর্থে স্বপ্নের মত। একবেলা ভাল কিছু খেলে পরের বেলা সে তৃপ্তির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। স্বাদের অনুভূতিটুকুও চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। পরবর্তী বেলায় ক্ষুধা বা লালসা পূর্ণ মাত্রায় জেগে ওঠে। এক বেলা আগের তৃপ্তিটুকুও কাজে আসেনা। একটি ভাল স্বপ্ন- স্বপ্নের মধ্যেও বাস্তবের আনন্দ দেয়। ঠিক যেমন বাস্তবে আগের বেলার গ্রহণকৃত খাদ্যের স্বাদ স্বপ্নের মত

হারিয়ে যায়। ধারণায় সৃষ্টিকর্তাবিহীন জীবন স্বপ্নের বাস্তবতা হয়ে ক্ষণিকের আনন্দটুকু দিতেও কার্পন্য করে।

যারা সৃষ্টিকর্তার দর্শনে বিশ্বাস করে না, জীবনের অর্থকে তারা অসন্মানজনকভাবে সংকীর্ণ ও নিরানন্দময় করে দেয়। জীবনের অর্থ দাড়ায় কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভ্রমন, বিলাসিতা, সাজসজ্জা, আড্ডাবাজী, রিপুর ইচ্ছে চরিতার্থকরন ইত্যাদি। এ সবের সর্বশেষ কোন গন্তব্য নেই। যৌবনে ভাল বোধ হয়। কিন্তু মৌবনের সে যৌবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। দেহের সব রস নিঃশেষ হয়ে গেলে জীবনের অর্থ অন্য রকম ফ্যাকাশে হয়ে দেখা দেবে। লক্ষ বছর আয়ু প্রাপ্ত হলেও বা লাভ কি? একই বিষয়গুলির পুন: পুন: আগমন বিরক্তিকর ও এক ঘেয়েমি হয়ে যাবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন থেকে একদিন নিজেকে ভীষন একা বোধ হবে। সেদিন কোন আকাংখা বেঁচে থাকবে না।

সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্বলিত দর্শনের প্রায়োগীক কর্মযজ্ঞ মানুষকে অনাবিল আনন্দে ভাসিয়ে দিতে পারে। সৃষ্টিকর্তায় নিজেকে সমর্পন করে নিমগ্ন হয়ে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। তাঁর সান্নিধ্য-প্রত্যাশীর আশা কোনদিন নিঃশেষ হবে না। আশাব্যাঞ্জক জীবন হবে কেবলি আনন্দের।

হঠাৎ করে এসব আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি, সাধনা আর চর্চ্চার প্রয়োজন আছে। ধীরে ধীরে মনকে সেই দিকে নিয়ে যেতে হবে। সৌভাগ্যবানের মধ্যে যেসবের প্রবেশ ঘটতে পারে আপনা থেকে। মানসিকতার পরিবর্তন এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের কোন এক সময় মানুষ এসবের প্রয়োজনীয়তা বেশী বোধ করে।

বাস্তব হচ্ছে মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের একটি খন্ডিত অংশ মাত্র। মানুষের কল্পনা বা স্বপ্নেরও একটি জগৎ আছে। মানুষের অনুমানের একটি জগত আছে। যেগুলি বাস্তব থেকে অনেক অনেক বেশী অগ্রসর। সেখানেও চাহিদা আছে। সব মানুষ যেমন এক রকম নয় তেমনি সব মানুষের আর্থিক, সামাজিক, মানসিক অবস্থাও এক রকম নয়। আবার একদিনে কারও পক্ষে তা সমান করে দেওয়াও সম্ভব নয়। অন্তত আজকের দিন পর্যন্ত। ফলে কল্পনা, স্বপ্ন বা অনুমানের জগতের সে সব চাহিদা পুরনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

ধর্ম সৃষ্টিকর্তাকে সামনে উপস্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সেটি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে মানসিক প্রশান্তি আনয়নে, তেমনি সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও। যে সব দর্শনে সৃষ্টিকর্তা নেই কাজটি তাদেরও একই। তবে ধর্ম মানুষের মনজগতের চাহিদা পুরনেও কাজ করে। কঠিন বাস্তববাদী দর্শনগুলি তা করতে ব্যার্থ। বলা যায় সাধারণ দর্শন মানবের সার্বিক চাহিদা পুরনে সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মান্ড ও মানব জীবনের সেখানে কোন সর্বশেষ লক্ষ্য নেই। মনের চোখে পর্দা ফেলে দিয়ে দৃষ্টিশক্তি একস্থানে শেষ করে দিতে বাধ্য করে।

বৌদ্ধ ধর্মে কোন ইশ্বরের ধারণা নেই। ফলে কিছু অনুসারি মূল দর্শন থেকে বিভক্ত হয়ে স্বয়ং বুদ্ধকে পূজা করতে শুরু করে। এটি করে অধিক সংখ্যক মানুষের মনের চাহিদা পুরনার্থে। যদিও বিষয়টি সত্য নয়। অর্থাৎ বুদ্ধই ইশ্বর নয় বা হতে পারে না।

যারা পথ প্রদর্শক তাদের কিছু দায়িত্ব থাকে। তারা কেবল নিজেদের জন্য সব কিছু করে না। লক্ষ কোটি মানবের হৃদয়েও কিছু মানসিক খোরাক দিতে হয়। ধর্ম সে কাজটি করে।

না চেয়ে না নিয়েও কিছু মানুষ তৃপ্তি নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এটিও সত্য। এরাও জীবনে সফল। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে এরা অল্পতে সুখী। যারা বেশী পেয়ে সুখী তারাও বা কতই লাভবান? ক্ষণস্থায়ী সুখের অনুভূতিটুকু থাকে না। মস্তিস্কের ক্ষণ সময়ের অনুভূতিটুকু চলে গেলে আবার নিঃস্ব। যেন স্বপ্নের মত। আবার অধিক প্রাপ্তির যন্ত্রনাও আছে। তাড়িয়ে বেড়ায়। কেননা মাত্রাতিরিক্ত প্রাপ্তি সুপথে অর্জন সম্ভব নয়। ফলে সুখভোগ হয় না। অধিকন্তু তাদের আচরণ তাদের অপকর্মকে প্রকাশ করে দেয়।

ধর্ম মানব জীবনে চলার পথে দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। ধর্ম বৃহৎ পরিসর থেকে শুরু করে জীবনের খুটিনাটি সকল বিষয়ের বিধি-বিধান ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়। এ কারনে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নামেও পরিচিত।

আজ মানুষ যত শিক্ষা-দীক্ষা রপ্ত করেছে তার পেছনে প্রাথমিক কালের দিক নির্দেশনাগুলির ভূমিকা রয়েছে। ঠিক যেমন প্রত্যেকটি ব্যাকডেটেড মা-বাবা আজকের স্মার্ট মানুষটিকে কথা বলতে শিখিয়েছে, হাটতে শিখিয়েছে তেমন। সুতরাং কুসংস্কার এবং স্বার্থান্বেষনের ক্ষেত্র ব্যাতিত ধর্মকে কোনভাবেই অবজ্ঞা করা

যাবে না। যেমন এক-কে অস্বীকার করে একশ-তে যাওয়া যাবে না, বিষয়টি তেমন। আবার এক অর্থে কথাটি সঠিকও নয়। কেননা প্রাথমিক অবদানকে অস্বীকার করেও সামনে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তবে সত্য বিদ্যমান থাকবে এবং সাক্ষ্যও দেবে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহনে মানুষের আছে পূর্ণ স্বাধীনতা। তাকে বাধা প্রদানে কিংবা কোন নির্দিষ্ট দিকে পরিচালনা করার মত কেউ নেই। কুসংস্কার কিংবা ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে পরিহার করে, দর্শনের সঠিক শিক্ষায় আস্থা স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে তাতে সমর্পন মানবের যথেচছাচার জীবনাচরনের পথে বাধা হয়ে কাজ করে। এটি মানসিক বাধা হয়ে কাজ করে। যেটি প্রথম, প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাধা। ব্যাক্তি, দল বা গোষ্ঠীসমুহের পারস্পরিক চাপ অপেক্ষাও এটি বড় এবং পন্থা বা উপায় হিসেবে এটি শান্তিপূর্ণ। আজও সমাজে শান্তির পথে অধিকাংশ মানুষ আপনা থেকে ভাল হয়ে চলে কোন ধর্মের প্রভাবের কারনে। এটিও বাস্তব এবং সত্য।

মানুষের রূপ অনিশ্চিত। মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হলে তার মধ্যে একটি নিশ্চিত রূপের ধারাবাহিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বার বার গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন দর্শন বা অন্যকথায় কোন ধর্মের পথ বেছে নেয়া ও তাতে আস্থাশীল হতে পারা একটি মানুষকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দান করতে পারে। সে রূপ থেকে মানুষ সহজে বেড় হতে পারে না। এ রূপটি তাকে পরিচালনা করা বা কারও দ্বারা পরিচালিত হওয়াকে সহজ ও বোধগম্য করে। অর্থাৎ একজনকে বুঝতে সহায়তা করে।

ধর্মীয় জীবন বিধান মানুষকে তার নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। কেবল শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত হয় না। ব্যাক্তির ভেতরে প্রয়োজনীয় নানাবিধ গুণাবলীর বিকাশ সাধনকে বাস্তবায়নে ব্যাবস্থাও গ্রহণ করে। সুপ্ত বিষয়গুলিকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

ধর্ম দু'ভাবেই কাজ করে। এক: ব্যাক্তিক বিকাশের সহায়ক হয়ে এবং দুই: মানবের সামষ্ঠিক কল্যানের পথ প্রদর্শন করার মাধ্যমে।

সামষ্ঠিক মানুষকে পরিচালনা বা অন্যভাবে বলা যায় কৌশলে পরিচালনা করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে ধর্ম সহায়তা করে। ধর্ম পথ প্রদর্শন করে মানব জীবনের পরিপূর্ণ সফলতার জন্য। অর্থাৎ পার্থিব জীবন এবং ধারণায়

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতার জন্য। ধর্মীয় বিধি-বিধানসমুহ বাস্তব জীবনে সামাজিক কল্যান প্রতিষ্ঠার কৌশলরূপেও বিবেচিত হতে পারে।

দিক নির্দেশনা ও আইন-কানুন-প্রথা

সমাজে চলতে গিয়ে একজন মানুষ কতটুকু করতে পারবে কতটুকু করতে পারবে না, সীমা লংঘিত হলে পরিণাম কি হতে পারে সে সব বিষয় আইনে বলা থাকে। এক অর্থে আইন এবং নানাবিধ সামাজিক প্রথাও মানুষকে চলার পথের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

আইন কানুন নানাবিধ প্রথা একদিনে গড়ে ওঠে নাই। এসবের উৎপত্তি ও বিকাশের পেছনে মানুষের অভিজ্ঞতা, নানান দর্শন ও ধর্মসমুহেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দিক নির্দেশনা এবং দর্শন ও ধর্ম

দর্শনের উপস্থিতি সর্বত্র। দর্শন ব্যাতিত কোন ধর্ম নেই। ধর্ম সমুহও এক একটি দর্শন। সাধারণ দর্শন ও ধর্মীয় দর্শন দুটোই মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। তবে প্রায়োগীক দিক থেকে সাধারণ দর্শন বিষয়টির সঙ্গে একটি ঐচ্ছিকতার সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দর্শনের মত কোন বাধ্য-বাধকতার নিয়ম রিতিনীতি নেই। অর্থাৎ দর্শনে তুষ্ট হওয়া সত্বেও নিজ জীবনে তা পরিপালন করার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

ধর্মের ক্ষেত্রেও বাধ্য-বাধকতা বা জোর-জবরদস্তী নেই। কেউ কোন একটি ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে আবার নাও পারে। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি সাধারণ দর্শন থেকে একটু ভিন্ন। কোন একটি ধর্মকে গ্রহণ করে নিলে একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমুহ মেনে চলতে ধর্ম বলতে গেলে মানসিক স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে এক প্রকার বাধ্য করে। যদিও কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কথাটি সম্ভবত ভালভাবে বোঝানো গেল না। অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজেকে বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য করে যখন সে বিশ্বাসী হয়।

ধর্মীয় দর্শনে কেউ আস্থা স্থাপনকারী হলে সে আপনা থেকে তা পালন করে চলে। ধর্মের নানা প্রকার কলা-কৌশলগুলির প্রয়োগ স্বতঃস্ফুর্তভাবে মানুষকে তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

কোন একটি একক ধর্ম বৈশ্বিক, সামাজিক ইত্যাদি বৃহৎ ভাবনা থেকে শুরু করে জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়। তাই ধর্মগুলি পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে পরিচিত। সাধারণ দর্শনের ক্ষেত্রে কোন একটি একক দর্শন জীবনের সকল বিষয়কে স্পর্শ করে তেমনটি হতে দেখা যায় না। বিশেষ কোন দর্শনকে জীবনের খন্ডিত কোন একটি অংশ বা বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করতে দেখা যায়।

ধর্মীয় দিক নির্দেশনা মানুষকে মন্দ পথ পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সারা জীবনব্যাপি ধর্মীয় নানাবিধ বিধি-বিধানের ধারাবাহিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে চলে। যার পরিপালন ব্যাক্তিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করে। মানুষ অভ্যস্থ হওয়া থেকে শুরু করে তা আত্মস্থ করে। যা ভাল পথে চলাকে সহজ ও নিশ্চিত করে। এটি ব্যাক্তি থেকে শুরু করে দলবদ্ধভাবেও হয়ে থাকে।

ধর্মীয় কোন দর্শন যদি যৌক্তিকভাবে পরীক্ষিত শুদ্ধ পথ প্রদর্শনকারী হয় এবং তাকে স্বার্থান্বেষীদের হাত থেকে কুসংস্কারমুক্ত রাখা সম্ভব হয়, তবে বলা যায় এটি সমাজে ভাল প্রতিষ্ঠাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিশ্চিত করে। কিন্তু সাধারণ দর্শন তা করে না। ধর্মীয় দর্শন প্রায়োগীক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকে সঙ্গে নিয়ে সৃষ্টি হয়। সাধারণ দর্শন তেমনটি নয়। এটি কেবল ধারণা প্রদান করে।

কিছু মানুষ নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। তারা নিজেদের পরিচালনা করতে সক্ষম এবং সেটিই পছন্দ করে। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শনের প্রায়োগীক ধরনটি অধিক উপযোগী। কেননা দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও এটি তার লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবায়ন করতে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না। কোন নিয়ম মানতে বাধ্য করে না। মানুষ মানসিকভাবে চাপমুক্ত থাকতে চায় এবং থাকতে পারে। নানান দর্শনের যেটা পছন্দ সে সেটা মন থেকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্যাক্তিক জীবনে তা পরিপালন করে কিংবা করে না। ইচ্ছের স্বাধীনতা আছে। এ পর্যায়ের মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ আপনা থেকে অন্যের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকে।

অনেকটা স্বনিয়ন্ত্রিত। এদের নিয়ে সমাজে সমস্যা কম সৃষ্টি হয়। বরং এরা হিংস্রতার স্বীকার হয়। এরা জ্ঞানের সাধনা করে। এদের অনেকে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত জ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে অন্তরে ধারণ ও লালন করে।

অপরদিকে ধর্মীয় বিধি-বিধান দর্শনের চিন্তাধারাকে বাস্তবায়নে একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কোন একটি বিষয় যে পালন করতে ইচ্ছুক নয় তাকেও সেটিতে অংশ গ্রহনে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণীত করার চেষ্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখে। তবে এ মানসিক চাপটি সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে অনুভূত হতে পারে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটি আর তেমন মনে হয় না। বরং কোন নিয়ম পালন করতে না পারার কারনে অস্বস্তি বোধ হয়। চাপের বিষয়টি অভ্যস্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত। কোন একটি বিষয়কে মন থেকে গ্রহণ করা বা না করার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সঙ্গে ধর্মীয় দর্শনের মানসিক চাপ সৃষ্টির বিষয়টি জড়িত নয়। এটি মানুষের সহজাত ধর্মের একটি বৈশিষ্ট হতে পারে। নতুন কিছুতে অভ্যস্ত হতে চায় না। আবার অভ্যস্ততার মাধ্যমে পুরোনো হয়ে গেলে ছাড়তেও চায়না। তখন সেটাতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এ বৈশিষ্টকে কাজে লাগাতে পারাও কৌশলের একটি অংশ মনে করা যেতে পারে।

কিছু মানুষ অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়। জগতে তেমন মানুষের সংখ্যা অধিক। তাদের নিয়ন্ত্রনে ধর্মীয় দর্শনগুলিতে আছে কার্যকর প্রায়োগীক উপায় বা কলা-কৌশল। তবে নেতা ও অনুসারি সকলের জন্য সকল বিষয় বা জ্ঞান সমভাবে প্রযোজ্য নয়, বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল দর্শনই জ্ঞান বিচ্ছুরনের উৎস। সৌর মন্ডলের সূর্য্যের মত। সাধারণ দর্শনও তাই। কিন্তু ধর্মীয় দর্শন দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠায় নানান আচার-অনুষ্ঠান, রিতি-নীতি, বিধি-বিধানের প্রচলন করে। যার মধ্যে আছে মানুষকে পরিচালনার নানাবিধ প্রায়োগীক কৌশল। যা আরেক মহাবিজ্ঞান। বিজ্ঞান সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনা করেছে কি করে নাই সেটি একান্তই বিজ্ঞানের বিষয় নির্বাচনের বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞান কোথাও কোন প্রচেষ্টা না চালালেও সত্য তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবেই। সত্য সর্বত্র প্রতি পদে পদে বিরাজমান। আর এ বিষয়টিতে মনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা অনেক বেশী বলে প্রতীয়মান হয় ।

দিক নির্দেশনা এবং ধর্ম ও আইন

ধর্ম মানব জীবনের জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইন কানুনও মানুষকে বাস্তব জীবনে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কি করা যাবে, কি করা যাবে না, কতটুকু করা যাবে ইত্যাদি। আইন কানুনের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ হয় সাধারণত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে। যে অঘটনের আশংকা থাকে সেটি ঘটেই যায়। তবে আইন প্রয়োগের ভয় কিছু মানুষকে ভবিষ্যতে মন্দ বা উচ্ছৃংখল আচরণ করা থেকে নিবৃত রাখে।

আইন পালন উপেক্ষিত হলে মানুষকে শাস্তি প্রদান করা হয় বা তা মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। বাধ্য কথাটির সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের একটি সম্পর্ক আছে। শক্তির প্রয়োগ দ্বারা স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় না। শক্তির প্রয়োগ চক্রাকারে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শক্তির প্রয়োগ সামাজিক পক্ষসমুহের শক্তি প্রদর্শনের নতুন ভিসিয়াস সার্কেল তৈরী করতে পারে। যা ঘুরে ফিরে সে শান্তিকে বিনষ্ট করবে যে শান্তির জন্য তা করা হবে। তা ছাড়া শক্তি প্রয়োগে মানুষের বোধের উন্নতি সাধন নাও হতে পারে।

আইনের অধিক প্রয়োগ সমাজে সভ্যতার ঘাটতিকে নির্দেশ করে। এর অর্থ হলো মানুষ নিজ থেকে ভাল থাকছে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ নানাবিধ জীবন দর্শন বিশেষত ধর্মীয় দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ থেকে ভাল পথে চলার শিক্ষা লাভ করে এবং তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাল পথে চলে। যেটি অনেক বেশী সভ্য। কেবল আইনের প্রয়োগ দিয়ে এত বিশাল জনসংখ্যাকে সুশৃংখল রাখা সম্ভব হতো না।

ধর্মীয় নির্দেশনা মেনে চললে মন্দ পথ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কথাটি অবশ্য আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা আইনও যদি মেনে চলা হয় তবে মন্দ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যারা মন্দ কাজ করে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত আইনও ভঙ্গ করে। আবার যারা আইন ভঙ্গ করতে পারে তারা ধর্মীয় বিধানইবা মেনে চলবে কেন? ফলে বিষয়টি উভয় ক্ষেত্রে একই হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষ কোন বিধান মেনে চলতে বাধ্য নয়। তাকে বাধ্য করাও সম্ভব নয়। বিশেষত যখন কারও ভেতরে নিজ থেকে নীতি-নৈতিকতার কোন বোধ কাজ করে না। এমন অবস্থায় লাভ ও লোভ চরিতার্থ করতে মানুষ অধিক তৎপর থাকে। নগদ

প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেনইবা মানুষ কোন দর্শনের নীতিবাক্য সম্বলিত নির্দেশনা মানতে যাবে? ফলে ধর্মীয় নির্দেশনাও উপেক্ষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আইন ও ধর্মীয় দিক নির্দেশনার পরিনতি এক।

ব্যাক্তি নিজে যদি ভাল পথ জানা সত্বেও সে পথে না চলে তবে কোন বিধানই কাজ করবে না। তাই ব্যাক্তিকে বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা অধিক জরুরী। যে কাজটি ধর্মীয় রিতি-নীতি, বিধি-বিধানের মধ্যে অন্তর্গ্রথিত হয়ে আছে।

আইনের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে দুষ্কর্ম সংঘটন না করার কোনরূপ উদ্বুদ্ধকরনের প্রচেষ্টা নেই। নেই কোন ধারাবাহিক কার্যক্রম। যতটুকু হতে দেখা যায় সেটি প্রকল্পের অর্থের বরাদ্দ সাপেক্ষে। ধর্মীয় রিতি-নীতি সে কাজ সমগ্র বিশ্বব্যাপি অধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে করে যায় অর্থের প্রাতিষ্ঠানিক কোনরূপ সরবরাহ ছাড়াও এবং উত্তরোত্তর তা প্রসারনেও ভূমিকা রাখে। এ সবকিছু হয় স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে। এতবড় এক শক্তিশালি মাধ্যমকে কোন গোষ্ঠীর নয় বরং সমাজের উপকারার্থে কাজে লাগাতে না পারা মানুষের তথা সমাজ পরিচালনাকারীদের ব্যার্থতা। এ ব্যার্থতার অন্যতম কারন কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে এর কর্তৃত্বের বৈধতা সামাজিক ও মানসিকভাবে আটকা পড়ে আছে। যারা সত্যকে জানে বা বোঝে তারাও এ বিষয়ে নিজেদের কথা বলার অধিকার দাবী করতে অপারগ ও ভীত এবং তারা এর সঠিক জ্ঞান থেকেও দুরে সরে গেছে। আবার জ্ঞানত হতাশ একদল নাস্তিক্যবাদের দিকেও ঝুঁকে পরেছে। জীবনের কোন এক সময় তাদেরকে তাদের নির্জ্ঞানতার পরিণামস্বরূপ আরও বেশী হতাশায় ভুগতে হবে।

ধর্মবিজ্ঞানকে সমাজের মঙ্গলের জন্য অধিক মাত্রায় কাজে লাগানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা থেকে ধর্মকে মুক্ত রাখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে।

ধর্মীয় দিক নির্দেশনা বা দর্শন মানুষকে নিজ থেকে ভাল পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। মানসিকভাবে মন্দ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দেয়। বাইরের কোন চাপে নয়। নির্দেশনা এখানে ব্যক্তির নিজের ভেতরে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে। ধর্মীয় দর্শন ব্যাক্তির বিকাশকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সে জন্য অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষাটি হতে হবে সঠিক।

আইন পালন উপেক্ষিত হলে আইনের প্রয়োগের ভয় আছে। যা পার্থিব জীবনে ভোগ করতে হয়। ধর্মীয় দর্শনেও কৃত অন্যায়ের কারনে ভয়ের বার্তা রয়েছে। তবে সেটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যেটি তুলনামূলক সভ্য। অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করা হলো না অথচ শাস্তির একটি ভয় ভাল পথে ধরে রাখতে সহায়তা করছে। এর অর্থ এই নয় যে চরম অন্যায়ের ক্ষেত্রে ধর্মে পার্থিব শাস্তির কোন বিধান নেই। সেটিও থাকতে হবে এবং আছে। নইলে কোন বিশেষ প্রয়োজনে সেটি ধর্মের সীমাবদ্ধতা হয়ে দেখা দেবে।

মানব জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে যেমন ব্যাক্তিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আবার সামষ্ঠিক মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক প্রথা থেকে শুরু করে আইন-কানুন, ধর্ম ও দর্শন এদের প্রতিটি যেমন ব্যাক্তির উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশে দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে, তেমনি সামষ্ঠিক মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রেও এগুলি দিক নির্দেশনা বা পথ প্রদর্শক হয়ে কাজ করে।

ধর্ম প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ব্যাক্তিক উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশে ভূমিকা পালন করে আসছে। বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন ও পরিচালনায় ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। দর্শন, বিবিধ রিতি-নীতি, আইন-কানুন, প্রথা এসবের বিকাশের পেছনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞানের নানান শাখা প্রশাখার উৎপত্তিও প্রাথমিক পর্যায়ে অধিবিদ্যা (Mataphysics) থেকে শুরু হয়েছে। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ধর্ম তথা সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ভাবনা আজকের এত অগ্রগতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কাজ করেছে।

পৃথিবীতে শিক্ষিত মানুষ কত? তার মধ্যে কতজন ডিগ্রী কিংবা মাষ্টার্স এর পর্যায় অতিক্রম করেছে? তাদের মধ্যে কতজনই বা সত্যিকার আলোকিত মানুষ যারা তাদের জ্ঞানের গরিমার কারনে সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতাকে অস্বীকার করার হিম্মত রাখে? নিশ্চিতভাবেই অতি নগন্য! নগন্যকেও অবহেলা করার উপায় নেই। তবে নগন্যদের এটিও ভাবতে হবে যে, জগত তো কেবল ঐ ক'জনা আলোকিত মানুষকে নিয়ে নয়। নানান মানুষের নানান সমস্যা ও নানান চাহিদা আছে। সবাইকে নিয়ে সমাজ। প্রয়োজন তাই মানব ও মানব মনের সঠিক ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে ধর্ম

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। কেননা মানুষকে এটি দারুনভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে- বিশেষত সৃষ্টিকর্তার ধারণা।

পৃথিবীময় বিশাল জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালনা করার মত দুরূহ কাজ ধর্মের প্রদর্শিত পথে চলার কারনেও সম্ভব হয়ে ওঠে। যেটুকু ভূল পরিলক্ষিত হয় তা ধর্ম বা দর্শনের নয় বরং প্রয়োগের ভূল। বোধ ও বুঝের ভূল। এ ভূল সর্বত্র আছে। জ্বালানী কিংবা বিদ্যুতের ব্যবহারেও সিস্টেম লস আছে। কোন কিছুই আজও শতভাগ উৎকর্ষ সাধনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। না গনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র!

ধর্মীয় দিক নির্দেশনায় একবার বিশ্বাস স্থাপন কারানো সম্ভব হলে মানুষ আপনা থেকে বা স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে প্রদর্শিত পথে চলে। ফলে মানবসম্পদ তথা সমাজ ব্যবস্থাপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে আসে। প্রশ্ন হচ্ছে- ধর্মের কারনে কেন মানুষ এমন আচরণ করে? মানুষের সঙ্গে ধর্মের বিষয়গুলির সম্পর্ক বা বন্ধনটি কোথায়?

সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার সঙ্গে লক্ষ্য অর্জনে সফলতার একটি সম্পর্ক আছে এমনটি ধরে নিয়ে লেখাটি শুরু করেছি। সৃষ্টিকর্তা বিষয়টির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটি নিবিড়। কেননা সৃষ্টিকর্তার ধারণা ধর্মীয় দর্শন থেকেই এসেছে। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা ও কর্মে সফলতা অর্জনের বিষয়টির সম্পর্ক বুঝতে হলে তাই ধর্মকেও বুঝতে হবে। এ দু'য়ের পরস্পরিক সম্পর্কটি জানার প্রয়োজনে ধর্ম নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

৪. ধর্ম

সহজাত ও আরোপিত ধর্ম

মানুষের কিছু গুণ, বৈশিষ্ট বা ধর্ম আছে যা সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্ট। এগুলি তার সহজাত ধর্ম। সহজাত ধর্ম সৃষ্টির শুরুতে মানুষের জন্য আরোপিত সত্য। যে সত্যধর্ম সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। মানুষের সহজাত ধর্ম বিপরীতমুখী বৈশিষ্টসম্পন্ন। ধনাত্মক ও ঋনাত্মক। ভাল ও মন্দ। সহজাত ধর্মের বৈশিষ্টের এই বিপরীতমুখীতার কারনে মানুষ ভাল ও মন্দ দু'রকম রূপেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। বল কিংবা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহজাত ধর্মের প্রকাশে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আরোপিত ধর্ম বিষয়ে আলোচনার অবতারনা করতে চাই।

আরোপিত ধর্ম মানবের সহজাত ধর্মের ভাল দিকগুলির বিকাশ এবং মন্দ দিকগুলির নিয়ন্ত্রন ও তার কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিতকরনে সহায়তা করে। মানুষ যেন কেবল তার সহজাত ধর্মের স্বাভাবিক প্রবনতা বা ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে গিয়ে মন্দ বিষয়গুলিকে গ্রহণ না করে আরোপিত ধর্ম সে কাজটি করে। তা না হলে মানুষের দ্বারা মন্দ কাজ সম্পাদনের ঝুঁকি বা সম্ভাবনা থেকে যায় বা বলা যেতে পারে বৃদ্ধি পায়। কেননা সহজাত ধর্মের মন্দ দিকও মানুষকে ভীষনভাবে আকর্ষন করে এবং এটি সর্বজন স্বীকৃত।

".. মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষন করে। ...।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

কিছু নিয়ম নির্দেশনার অনুসরণ ও চর্চ্চার মধ্য দিয়ে মানুষকে তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে আরোপিত ধর্ম সে কাজটি করে। এটি মানুষের সহজাত ধর্ম নয়। এটিকে পার্থিব জীবনে মানবের ওপর আরোপ করতে হয়। তাই এটি আরোপিত ধর্ম।

আরোপিত ধর্ম

সহজাত ধর্মের মন্দ দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শুভ বুদ্ধির উদয়ের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কলা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নামে মানুষের ওপর যে সব বিধি-বিধান আরোপ করা হয় সেটি আরোপিত ধর্ম। উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিকর্তার নামে কাজগুলি সম্পাদন করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। এটি অন্ধত্ব নয়।

আরোপিত ধর্মের নানাবিধ রিতি-নীতি, বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচেছ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা। এ ছাড়াও মানব মনে প্রশান্তি প্রদান করাও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রতিটি ব্যাক্তি মানুষকে নিয়ে সমাজ। ব্যাক্তি বিকশিত না হলে সমাজ বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। ব্যাক্তি ও সমাজের বিকাশ একটি অপরটির পরিপুরক। তাই প্রয়োজন ব্যাক্তিক জীবনে ভাল গুণাগুণ অর্জন ও তা অব্যাহতভাবে বিকশিত করা এবং ব্যাক্তির অন্তরস্ত মন্দ গুণগুলিকে পরিহার করার মানসিক শক্তি অর্জন করা।

মানুষের সহজাত ধর্ম শুরুতে বা আদিতে বা সৃষ্টিকালীন সময়ে সৃষ্ট। আরোপিত ধর্ম পরবর্তীতে আরোপ করা হয়। আরোপিত ধর্ম ধর্মীয় বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন মেনে চলতে এক রকম বাধ্য করে। তবে কোন জোর জবরদস্তি নেই।

এ বাধ্যবাধকতা মানসিক। ব্যাক্তি নিজেই নিজের ভেতরে এ বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। এ অনুভূতি তখন আসে যখন সে দর্শনের ছায়াতলে নিজেকে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এ সকল বিধি-বিধানের পরিপালন কুসংস্কার পরিহার করে আত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনকে সম্ভব করে তোলে।

আরোপিত ধর্মের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি মৌলিক নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান বা আচার অনুষ্ঠানগুলি এমনিভাবে সাজানো যা একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কিত। এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এসব বিধি-বিধানসমুহ একটি অপরটির পরিপুরক হয়ে কাজ করে। একটির পরিপালন পরবর্তীটির বা পরবর্তী ধাপে গমনের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবি করে তোলে। ধাপে ধাপে যা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। লক্ষ্য জীবন ও জগতে ‘শান্তি’ প্রতিষ্ঠা করা। যার পূর্বশর্ত হিসেবে রয়েছে মানব আচরণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন করা।

পর্যবেক্ষন, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধিবোধ, ধ্যান এক কথায় জীবন ও জগত নিয়ে দীর্ঘসময়ের ভাবনার সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এসবের সৃজন। আরোপিত ধর্মকে তাই

বিজ্ঞান ভিত্তিক বলা যেতেই পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা গবেষনা মূলত এ কাজগুলিই করে। তবে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ রোধের বিষয়টির মত এক্ষেত্রেও কুসংস্কার ও অপচর্চ্চার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আরোপিত ধর্ম মানুষকে কমান্ড করে। সহজাত ধর্ম মানুষকে তার ভেতর থেকে কমান্ড করে। আরোপিত ধর্ম বাহির থেকে নির্দেশনা জারি করে। সহজাত ধর্ম হৃদয় থেকে কমান্ড করে। আরোপিত ধর্ম মস্তিস্ক থেকে নির্দেশনা জারি করে। সহজাত ধর্মের কমান্ড বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধ। এটি সহজাত ইচ্ছের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত। আরোপিত ধর্মের কমান্ড বিচার-বিবেচনাপ্রসূত বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত। আরোপিত ধর্মের কমান্ডগুলো সহজাত ধর্মের কমান্ডের ন্যায় মানবের মধ্যে শুরুতে প্রবিষ্ট করানো থাকে না। জগতের এক একটি পরিবেশে অবস্থানের কারনে অর্জিত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটি গড়ে ওঠে। মানুষ নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের জন্য এটি তৈরী করে নেয়। তবে সার্বিক প্রক্রিয়া বিবেচনায় এটি মূলত সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত।

সত্ত্বা হিসেবে মানুষের সৃজনটি এমন যে, সে পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে নিজেই নিজের জন্য করণীয় কমান্ড লিপিবদ্ধ করে নেয়। কোন প্রক্রিয়ায় মানুষ সে কাজটি সম্পাদন করবে সে প্রক্রিয়াটি তিনি নির্ধারণ করে দেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেন বা একটি পরিবেশের মধ্যে ফেলে দেন। সব কম্পিউটারের ক্ষমতা যেমন সমান নয়, তেমনি নিজের বা নিজেদের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করে নেয়ার কাজগুলি মানুষের মধ্যে কোন পর্যায়ে কে কতটুকু যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করে নেবে সেটি নির্ভর করে যিনি সৃজন ও পরিচালনা করেন তাঁর ওপর। প্রকৃতিও বলা যেতে পারে কিংবা যিনি আমাদের প্রকৃতির স্রষ্টা বা ধারক তিনি।

আরোপিত ধর্মের বিধি-বিধানসমুহের প্রতিপালন, নানাবিধ কর্মযজ্ঞের নিয়মিত চর্চ্চা মানব অন্তরকে দর্শনের রূপরেখায় আস্থা স্থাপন করাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। আত্মা নানান বিধি-বিধান, কর্মযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতাকে বুঝতে শিখে বা খুঁজে পেতে থাকে। ধীরে ধীরে এর দর্শনে আস্থা স্থাপিত হতে থাকে। বিশ্বাস দৃঢ়তা পেলে দর্শন নির্দেশিত কমান্ডের সঙ্গে মানবের সংযোগ স্থাপিত হয়। যৌক্তিকতা অনুধাবনের ফলে মানব সত্ত্বা স্বতস্ফুর্তভাবে আপনা থেকে প্রদত্ত কমান্ড প্রতিপালনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্তার ধারণা ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন

বিষয়টিকে কার্যকর ও আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। কমান্ড যদি সত্য ও সঠিক পথ নির্দেশ করে এবং মানুষ যদি সে কমান্ডকে ভূলভাবে বুঝে না থাকে, তবে তা জীবনকে সঠিক পথে চালিত করতে অবধারিতভাবে সহায়তা করে।

মানুষ কোন বিধান মেনে চলতে বাধ্য নয়। তাকে বাধ্য করাও সম্ভব নয়। ব্যাক্তি নিজে যদি ভাল পথ জানা সত্ত্বেও সে পথে না চলে তবে কোন বিধানই কাজ করবে না।

সঠিক পথের দিক নির্দেশনা তখনই কাজ করে, ব্যাক্তি যখন নিজে সঠিক পথে চলার বিষয়টি অন্তর থেকে উপলব্ধি করে, ফলে প্রত্যাশাও করে। অতঃপর নিজেই দুষ্টুমি পরিহার করে ভাল পথে চলতে ইচ্ছুক থাকে। আরোপিত ধর্ম সেক্ষেত্রে তাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। পথ দেখায়।

লক্ষ্য অর্জনে ব্যাক্তির নিজেকেই আরোপিত ধর্মের কমান্ড মেনে চলতে হয়। তবেই কমান্ড কাজ করবে। কিন্তু মানুষ যেমন তা মেনে চলতে বাধ্য নয় তেমনি আবার ইচ্ছুক নাও হতে পারে। সে কারনে নানাবিধ রিতি-নীতি, বিধি-বিধানের উৎপত্তি। যে এগুলিতে সুফল দেখতে পাবে সে আস্থা রাখবে এবং নির্দেশনা মেনে চলবে। নিচে উদাহরণস্বরূপ আরোপিত ধর্মের কিছু কমান্ডের উল্লেখ করা হলো। যেমন-

১. পিতা মাতাকে সন্মান করবে।
২. হত্যা করবে না।
৩. ব্যাভিচার করবে না।
৪. চুরি করবে না।
৫. মিথ্যে সাক্ষী দেবে না।
৬. প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা পোষন করবে না।

সহজাত ধর্মের কু-প্রবৃত্তি মানুষকে আরোপিত ধর্মের কোন কমান্ড ভঙ্গ করতে ভেতর থেকে প্ররোচিত করতে পারে। কিন্তু আরোপিত ধর্ম কোন কাজটি করা সঠিক এবং কোন কাজটি করা সঠিক নয় তার দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে।

"এবং (শপথ) তাঁর যিনি এটিকে (আত্মাকে) এমনিভাবে অনুপ্রাণীত করেছেন, যা তাকে বুঝতে সহায়তা করে কোনটি ভূল এবং কোনটি তার জন্য সঠিক।" (আল-কোরআন ৯১:৮)

মানুষকে আবার আরোপিত ধর্মের নির্দেশনা ভঙ্গ করার স্বাধীনতা বা ক্ষমতাও দিয়ে দেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। কর্মের ফলাফল নিজের। এটিই পরীক্ষা। মানুষের জন্য পার্থিব জীবন এক পরীক্ষার আগার।

"... আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করি ...।" (আল-কোরআন ২১:৩৫) "... তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ ...।" (আল-কোরআন ১১:৭)

আরোপিত ধর্মের আরোপকরণ বা ইনষ্টলেশন

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আরোপিত ধর্মের কমান্ড মেনে চলতে হয়। তবেই কমান্ড কাজ করবে। কমান্ড কাজ করলে লক্ষ্য অর্জিত হবে। কিন্তু কেউই কমান্ড মেনে চলতে বাধ্য নয়। আবার কমান্ড মেনে চলতে ইচ্ছুক নাও হতে পারে। তাই আরোপিত ধর্মকে মানুষের ওপর আরোপ বা ইনষ্টল করতে হয়, যেন মানুষের দ্বারা সেটি পালিত হয়। ফলে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু অবশ্যই সেটি সহজ কাজ নয় এবং প্রতিনিয়তই এর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়।

আরোপিত ধর্মকে এমনভাবে মানুষের ওপর আরোপ করতে হয় যেন সে নির্দেশনা প্রতিপালন করে। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাই আরোপকরণ প্রক্রিয়াটিকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ভূলভাবে আরোপ করা হলে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হতে পারে বেশী। ভূল ব্যাখ্যা ও কুসংস্কারের প্রবেশ তারই উদাহরণ। আর এ ভূল প্রবেশ করে আরোপিত ধর্মের সঠিক আরোপকরণে অজ্ঞতা কিংবা আরোপিত ধর্মকে কাজে লাগিয়ে কিছু ধূর্ত মানুষের স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতা। প্রকৃতঅর্থে এরা ধার্মিক নয়। ধার্মিকতার রূপ প্রদর্শন করে।

সহজাতভাবে মানুষের মধ্যে যদি কেবলমাত্র ভাল বা ধনাত্মক বৈশিষ্টগুলি বিরাজ করতো- তবে হয়তবা আরোপিত ধর্মের আর প্রয়োজন হতো না। কিন্তু মানুষের

মধ্যে মন্দ বা ঋনাত্মক শক্তিও কাজ করে যেটিকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে হয়। সে কারনে আরোপিত ধর্মের আবশ্যকীয়তা। কেননা আরোপিত ধর্ম সে কাজটি করে।

আরোপিত ধর্মকে সহজাত ধর্মের শক্তি ও ক্ষমতাকে ছাপিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু সহজাত ধর্মকে ছাপিয়ে আরোপিত ধর্ম কাজ করতে পারে না। সহজাত ধর্মের টান প্রবল। বিশেষত মন্দের টান।

আরোপিত ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে চলার কমান্ড করে। কমান্ড মেনে চললে মানবের মন্দ দিকগুলি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। সে কারনে মানুষকে দিয়ে আরোপিত ধর্মের কমান্ড অনুসরণ করাতে হয়। কমান্ড মানিয়ে চালাতে সক্ষম হলে মানুষকে দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করানো সম্ভব হয়। কিন্তু মানুষ আরোপিত ধর্মের কমান্ড এবং বিধিবিধান মানতে যাবে কেন? মানুষের অভিজ্ঞতা এটাও বলে যে, ছলে বলে কৌশলে নিজ স্বার্থ হাসিল করাও মানব জীবনে বংশপরম্পরায় সফলতা এনে দেয়। উপরন্তু যার শক্তি ও ক্ষমতা আছে তেমন একজন সুযোগইবা হাতছাড়া করতে চাইবে কেন? কিসের আশায়? কিসের আতংকে? কিসের বিনিময়ে?

সাধারণ দর্শন ও ধর্মীয় দর্শনের পার্থক্যের বিষয়টি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। ধর্মীয় দিক নির্দেশনা শুধু জীবন দর্শন বা বিধানই নয়। জীবন দর্শন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধকরনের প্রায়োগীক কলা কৌশলের দিক নির্দেশনাও এগুলিতে রয়েছে। কলা কৌশল অবলম্বনের কারনে মানুষ দিক নির্দেশনাকে নিজ অন্তর থেকে গ্রহণ করে নেয়। ফলে আপনা থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে মেনে চলতে মানসিকভাবে সক্ষম হয়ে ওঠে।

মানুষ যেন দিক নির্দেশনা প্রদত্ত কমান্ড নিজ থেকে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে পালন করে, সে কারনেই আরোপিত ধর্মীয় দর্শনে নানান রিতি-নীতি, বিধি-বিধানের বিদ্যমানতা। যেগুলির পরিপালন বা অনুসরণ ধীরে ধীরে মানব অন্তরকে আপনা থেকে কমান্ড পালনের পথে টেনে নিয়ে যায়। এগুলি আরোপকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বিষয়। এর ফলে মানুষের সহজাত ধর্মের মন্দ দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়। যা সুপরিকল্পিতভাবে নিয়মের মধ্য দিয়ে মানুষের সঠিক পথে চলাকে সম্ভব করে তোলে। এটি কেবল আরোপ করেই ক্ষান্ত হয় না। জীবনব্যাপি মানুষ যেন সে সব নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলে আরোপিত ধর্মে সে ব্যবস্থাপনাও

রয়েছে। অর্থাৎ এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে এখানে। কেবল তাত্ত্বিক নয়, প্রায়োগীক নির্দেশনাও।

ধর্মের নানাবিধ ব্যবস্থা ও তার অব্যহত চর্চা মানব সত্তাকে ধীরে ধীরে আরোপিত দর্শনে মন-প্রাণ শপে দিতে প্রস্তুত করে তোলে। একসময় সে সেটিকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে ধারণ করে। ফলে নির্দেশনা মেনে চলে। আরোপিত ধর্ম থেকে উপকার পেতে হলে তাকে শক্তভাবে ধারণ করার বিকল্প নেই। যিনি এমনিভাবে মানবকে বশে নিয়ে আসার উপায় বাৎলে দিয়েছেন- মানবের নানাবিধ বৈশিষ্ট ও চরিত্র সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল।

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর ...।" (আল-কোরআন ৩:১০৩)

এটি আরোপিত ধর্মের একটি কমান্ড। কিন্তু এ কমান্ড মানুষের ওপর কাজ করবে কেন? অর্থাৎ মানুষ এ কমান্ড মেনে চলবে কেন? মানুষ তার ওপর আরোপকৃত কমান্ড মেনে চলতে বাধ্য নয়।

উপরোক্ত কমান্ড যেন মানুষের ওপর কাজ করে অর্থাৎ মানুষ যেন উল্লেখিত কমান্ড নিশ্চিতরূপে প্রতিপালন করে এবং এর থেকে দুরে সরে যেতে না পারে, সেজন্য অবশ্যই একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। নয়তো কমান্ড কাজ করবে না। যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে প্রদত্ত কমান্ড এবং যিনি তা প্রতিপালন করবেন তার মধ্যে। অর্থাৎ কমান্ড ও মানুষ তথা বিশ্বাসীর মধ্যে।

আরোপিত ধর্ম কমান্ডকে মানুষের দ্বারা কার্যকরী করতে কিছু উপায় অবলম্বন করে, যা যোগসূত্রের সৃষ্টি করে বা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর চমৎকার বিষয়টি হচ্ছে এটি শক্তি প্রয়োগ ব্যাতিত কাজ করে। মানুষ নিজ থেকে দর্শনটিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। প্রদত্ত নির্দেশনা নিজ থেকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। নির্দেশনা পালনের বিষয়টি ব্যক্তির নিজের ভেতরে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে কাজ করে। তবে নির্দেশিত কমান্ডটি মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। কমান্ডের ভূল ব্যাখ্য বা ভূল অনুধাবন হিতে বিপরীত হতে পারে।

আরোপিত ধর্মকে মানবের ওপর আরোপকরণ বা ইনষ্টল করার উপায় বা প্রক্রিয়া নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার বই লেখা সম্ভব। যেমন হতে পারে বিষয়ের ওপর শিক্ষা

দান করা, প্রশিক্ষন প্রদান করা, অভিজ্ঞতা অর্জন, বিষয়ের অব্যাহত চর্চা ও পরিচর্যা, এমনকি মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন কিংবা ভেতরে তথ্য প্রবেশ করিয়ে দেয়া ইত্যাদি নানান কিছু। তবে সে পথের বিস্তারিত আলোচনায় গমন করা এ বইয়ের লক্ষ্য নয়।

ওপরে আরোপকরনের যেসব উপায় বা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে যে কোনটি নিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন, তার প্রতিটিকে কার্যকরীকরনের ক্ষেত্রে পেছনে চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করে প্রধানত দু'টি বিষয়। একটি হলো বিশ্বাস এবং অপরটি জ্ঞান। নিচে এ দু'টি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বিশ্বাস

কোন কিছুকে মনে প্রাণে গ্রহণ করাতে হলে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। আরোপিত ধর্মকে দিয়ে সহজাত ধর্মকে চালাতে বা ড্রাইভ করাতে হলে সহজাত ধর্মের ওপর প্রভাব রাখতে পারে সেভাবে আরোপিত ধর্মকে স্থাপন করতে হয়। মানব মস্তিষ্কে বা অন্তরে ধর্মকে আরোপকরনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস একটি উপায় হয়ে কাজ করে। মানবের মস্তিস্কের সঙ্গে দর্শন প্রদত্ত শিক্ষার সম্পর্ক ধারণ করে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বাস হচ্ছে সংযোজক। যা পরবর্তীতে মানবকে দর্শনের দেখানো পথে আপনা থেকে নিয়ে যেতে কাজ করে।

বিজ্ঞান এ সত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে কি করেনি সেটি মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। বিজ্ঞান যদি সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা না করে, তবে সেটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কোন ক্ষেত্রে পরিচালনা করা হবে যারা তা নির্ধারণ করেন তাদের বিষয় নির্বাচনের বিষয়। কিন্তু এটি যে মানবের ওপর ক্রিয়া করে তা সত্য। কেউ সে সত্য স্বীকার করুক কিংবা না করুক সত্য ঘটবেই এবং এটি সত্য বলেই সমালোচকরা একে ভাইরাস নামে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে। এটি যে মানবের ওপর ক্রিয়া করে এমন কঠোর সমালোচনাও তার স্বীকৃতি।

মানব নিজে এক স্বয়ংক্রিয় গবেষনাগার। মানবের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রাপ্তি তার নিজস্ব পর্যবেক্ষন, ধ্যান ও গবেষনার ফল। সে তার নিজের স্বাভাবিক চলাচলের মধ্যেই প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত বিবিধ বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এ সব তথ্য তার নিজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত। সংরক্ষিত এসব তথ্যের

প্রক্রিয়াকরনের কাজটি তার নিজের মস্তিস্কে প্রতিনিয়তই সম্পন্ন হচ্ছে। অতঃপর সে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। ছাপানো কাগজে সেটি লিপিবদ্ধ করা হলো কি হলো না সেটি মুখ্য বিবেচ্য নয়। মানুষের স্মৃতিতে তার সংগৃহিত তথ্যের আঁচরের চিহ্ন থেকে যায়। বিশ্বাস যে মানবের ওপর ক্রিয়া করে সেটি যদি বিজ্ঞান দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে সমর্থিত নাও হয়, তথাপি এটি মানুষের অনুধাবিত সত্য। তাই এটি বিজ্ঞান সম্মত।

আরোপিত ধর্মকে কাজ করতে হয় সহজাত ধর্মকে ছাপিয়ে। আরোপিত ধর্ম সহজাত ধর্মকে ছাপিয়ে কাজ করতে পারে না, যদি না মানব সত্তা আরোপিত ধর্মটিকে মনে প্রাণে বা অন্তর থেকে গ্রহণ করে বা তার দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে। তাই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বাস হচেছ নোঙ্গর। কোথাও ভিড়তে হলে সর্ব প্রথম উত্তাল সমুদ্রে এটিকেই ছুড়ে মারতে হয়। এই নোঙ্গর বিশাল জাহাজকে উত্তাল সমুদ্রের মাঝে স্থীর দাড় করিয়ে রাখে। মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে।

আরোপিত ধর্ম সহজাত ধর্মকে ছাপিয়ে তখনই কাজ করতে পারে যখন ধর্ম বা দর্শনের বক্তব্যে মানুষ আস্থা রাখে। মন থেকে সেটিকে গ্রহণ করতে হবে। বল প্রয়োগে গ্রহণ করানো যায় না। যে কোন তত্ত্বের ক্ষেত্রেই আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত না হলে কোন নির্দেশনাই কাজ করবে না। সেজন্য বিষয়টিকে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। তবেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, এ তত্ত্বের অনুসরণ বা প্রয়োগের দ্বারা লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এটিই বিশ্বাস। তার ভেতরে তত্ত্বের সক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপিত হলো। বিষয়টি কেবল আরোপিত ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, জীবন ও জগৎ পরিচালনার সকল দর্শনের ক্ষেত্রেই এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

সম্পূর্ন বিষয়টি একবারে ঘটে না। ধাপে ধাপে ঘটে। একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমত মানুষ কোন একটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়। অতঃপর বিচার বিশ্লেষণ করতে থাকে। বিষয় বা তত্ত্বটিকে যৌক্তিক ও সঠিক বলে মনে হলে প্রাথমিকভাবে আস্থা আনে এবং সত্য বলে ভাবতে শুরু করে। অতঃপর নিজেই নিজের মনকে সে তত্ত্বটিকে গ্রহণ করাতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ভেতরে যুক্তি উপস্থাপনা ও খন্ডন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অন্তর একটু একটু করে বিষয়টিতে সম্মতি দিতে শুরু করে অর্থাৎ সে বিষয়টিকে মেনে নিয়ে গ্রহণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে বিষয়টি বিশ্বাসে পরিনত হতে থাকে। অর্থাৎ স্থায়িত্ব লাভ করতে থাকে। ফলস্বরূপ

সে নিজ থেকে দর্শনের দেখানো পথ মেনে চলার চেষ্টা করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার বিচার বিশ্লেষন ও অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও এক্ষেত্রে কাজ করে।

বিশ্বাস স্থাপিত হলে মানুষ নতুনভাবে কিছু গ্রহণ করে এবং কিছু বর্জন করে। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কিছু কাজ ও দ্বায়-দায়িত্বের সূচনা সূচীত হয়। দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস প্রায়োগীকভাবে দৃঢ়তা লাভ করে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচেছ- ভাল কাজটি করতে না পারলেও অন্তত মন্দটি না করা।

"... নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা। ...।" (আল-কোরআন ২:১৯৭)

কেবল এতটুকু দায়িত্ব নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে ব্রম্মান্ডকে অনেক শান্তিপুর্ন করে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই বিশ্বাসীর প্রাথমিক দায়িত্বটি হচ্ছে জীবন বিধান বা ভাল একটি দর্শনের নির্দেশনা অনুসরণ বা তা মেনে চলা। সেটি করতে অপারগ হলেও অন্ততপক্ষে মন্দ কর্ম না করা।

মানুষের কর্মের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পৃক্ততার বিষয়টি এমন যে, এটি কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকান্ড- কি ব্যবসা, কি উন্নয়ন, কি রাজনীতি, কি সংসার সকল ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রথমেই সকলকে কর্মের পেছনের দর্শনটিতে আস্থা স্থাপন করতে হয়। বিশ্বাস রাখতে হয়। অর্থাৎ সম্পাদিত কাজ বা দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব সে বিষয়ে নিজের নিশ্চিত হওয়া। সকল কাজের পেছনে যেসব দর্শন কাজ করে তার সব ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। অন্যথায় কোন দর্শন কাজ করবে না। ফল দেবে না।

বিশ্বাস কোন অলৌকিক বা আজগুবি ভাবনার মধ্য দিয়ে নয় বরং করতে হবে যৌক্তিকভাবে। যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণ শেষে আসবে বিশ্বাসের বিষয়টি। মানুষের প্রতিও মানুষকে বিশ্বাস রাখতে হয়। নইলে জাগতিক সকল বন্ধন শিথীল হয়ে যায়। সমাজ অচল হয়ে যায়। কর্ম সম্পাদন অসম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস রাখা বা থাকা সত্বেও সতর্ক থাকতে হয়। এটিই যৌক্তিকতা। কারও প্রতি বিশ্বাস আনতে হলেও মানুষ মানুষকে পরীক্ষা করে। বিচার-বিবেচনা, যাচাই-বাছাই করে। বিশ্বাস কেবলই অন্ধত্ব নয়। সেখানেও তুলনামূলক বিচার বিবেচনা আছে।

বিশ্বাস বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জগতের টিকে থাকার একটি মৌল ভিত্তি হলো বিশ্বাস। এটি আঠার মত কাজ করে। একের সঙ্গে অন্যকে শক্ত ও কঠিনভাবে জুড়ে দেয়। যেটি একবার স্থাপিত হলে অতি সহজ ও সাধারণ কোন উপায়ে উৎপাটন সম্ভব হয় না। যদি কখনও উৎপাটন করা সম্ভব হয় তো সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা কাজ করে। যার ফলাফল আণবিক বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে। সে বিস্ফোরণ ভেতরে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে যেতে পারে। এটি যেমন নিজের ভেতরে ঘটতে পারে তেমনি বাইরে প্রকৃতি-পরিবেশের ভেতরেও ঘটে।

বিস্ফোরণোত্তর নতুন জ্ঞান পুরোনো বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নতুন বিশ্বাসে রূপান্তরীত হয়। এটি অভিজ্ঞতার ফলাফল। কিছু সময় নেয়। নতুন সত্যকে খুঁজে পায়। এক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে সে আরেক বিশ্বাসের অধীন হয়ে যায়। অর্থাৎ সর্বদাই সে কোন না কোন সত্যের অধীন থাকে। সূত্র বা সত্য নতুনভাবে স্থাপিত হয়। সত্য নতুনভাবে স্থাপিত হলেও বিশ্বাস আবার তার সংযোগকারীর মূখ্য ভূমিকা পালন করে নতুন সূত্রের সাথে।

বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে মানুষের মস্তিষ্ক ও সাইকোলজির কোন গভীরতম অঞ্চলের। যা বোঝা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু প্রকাশ করা কঠিন। বিজ্ঞান নিয়ে যারা চর্চা করেন তারা সে সূত্রটিও খুঁজে পেতে বা জেনে থাকতে পারেন।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সঠিক দিক নির্দেশনা থাকা সত্বেও মানুষ সে নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য নয়। তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ বক্তব্যকে অচল ধরে নিয়ে এগুতে হবে। কেননা ধরে নিতে হবে যে বিশ্বাস স্থাপিত হলে তার আর বিপরীতটি করার উপায় নেই। যদি সে বিপরীতটি করে তবে এটিও ধরে নিতে হবে যে বিশ্বাস স্থাপিত হয়নি। স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ বা সংশয়ের উপস্থিতি আছে। যা প্রকৃত অর্থে সত্যিকার বিশ্বাস নয়।

বিশ্বাসী আপনা থেকেই তার বিশ্বাসকৃত দর্শনের সকল শর্ত মন থেকে মেনে নেয়। ফলে অনুসরণ করে। এটি আপনা থেকে ঘটে। আপনা থেকে বলছি কেননা এ পর্যায়ে বিষয়টিকে আর ভাঙ্গা যাচ্ছে না বা ভাঙ্গার চেষ্টা করছি না। এটি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। এ পর্যায়ে মানুষের আর করণীয় নেই। এটিই বিশ্বাসের সবচাইতে চমৎকার অংশ! এ কাজটির কারনে পরবর্তী সকল কর্ম সহজ হয়ে যায়। একবার

কোন দর্শন ও তার বিবিধ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে দেয়া সম্ভব হলে- চিন্তা নেই। মানুষের দ্বারা সেটি আপনা থেকে পালিত হতে থাকবে। কিন্তু কাজটি কিভাবে ঘটে সেটি জানেন বিধাতা। ঠিক যেমন মানুষ জানে বিদ্যুৎ দিয়ে অনেক কর্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু বিদ্যুৎ কি মানুষ সেটি জানে না।

নোঙ্গর যেমন তার লম্বা শিকলের পরিধীর মধ্যে জাহাজকে বেঁধে রাখে। বিশ্বাস তেমনি বিশ্বাসকৃত দর্শনের সীমানার মধ্যে মানুষকে আটকে ফেলে। বিশ্বাস একটি সীমানার মধ্যে ঘুরপাক খায়। একবার বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে গেলে মানবাত্মাকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় বেধে রাখা সহজ হয়ে যায়।

মূলত মানুষ বন্দি হয়ে থাকে তার নিজের আবিষ্কৃত, সৃষ্ট বা গ্রহণকৃত ভাবনা ও চিন্তার জগতে। সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। কেননা সে বেরিয়ে আসতে চায় না। যখন বেরিয়ে আসতে চায় তখনও তাকে নিজের ভেতরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম করতে হয়। যদিওবা কখনও বেরিয়ে আসতে পারে, তথাপি পূর্বের ভাবনার প্রভাব থেকে যায় ধনাত্মক কিংবা ঋনাত্মকরূপে। নাস্তিক্যবাদ তেমনই একটি ঋনাত্মক ফলাফল। এটি ধনাত্মকরূপে পরিচিতদের কিছু কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়ার ফল।

বিশ্বাসকৃত দর্শন যদি সঠিক পথ নির্দেশ করে, তবে মানুষকে যথেচছাচার বা যে কোন মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। তাই বিশ্বাসীর চেয়ে অধিক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন দর্শনের। দর্শন প্রদত্ত নির্দেশনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের। সমস্যা যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তবে তা বিশ্বাসে নয়। দর্শনে কিংবা দর্শনের ব্যাখ্যায় অথবা স্বার্থান্বেষী মানুষের মধ্যে।

বিশ্বাস সর্বত্র কাজ করে সংযোগকারীরূপে। বিশ্বাস কোন দর্শন নয়। বিশ্বাস দর্শনের সঙ্গে মানবের সংযোগস্থাপনকারী। ফলে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীর দর্শন এবং সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসীর দর্শন সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বাস অবধারিতভাবে প্রয়োজনীয়। বিশ্বাস কখনও ভাইরাস নয়। ভাইরাস হতে পারে কোন দর্শন কিংবা তার কোন অংশের ব্যাখ্যা। কেননা একটি দর্শনই প্রোগ্রাম, বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস কেবল মানুষের সঙ্গে প্রোগ্রামের সংযোগ স্থাপন করে দেয়। ভাইরাস হোক কিংবা ব্যাকটেরিয়া হোক, মানবীয় সব প্রোগ্রামের জন্যই বিশ্বাস প্রয়োজন। কেননা দর্শনই মানুষের চালক হয়ে যায় যখন বিশ্বাস মানুষের সঙ্গে দর্শনের সংযোগ স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করে দেয়।

তাই বিচার বিশ্লেষণ যদি করতে হয় তবে রচিত প্রোগামের বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্বাসের নয়। কোথাও প্রয়োজন হলে তার সংশোধন করে নিতে হতে পারে। বিশ্বাস কেবল সংযোগ স্থাপনকারীর ভূমিকা পালন করে। সে ভাল মন্দ বোঝে না। ভাল মন্দ বোঝার বিষয়টি বিশ্বাসীর নিজের এবং সেটি করতে দর্শনের সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বাস কেবল ছোট্ট একটি শব্দ 'বিশ্বাস' শব্দটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক পরিপূর্ণ জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত দর্শন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত দর্শনের বক্তব্যেই মূলত মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ সে নিশ্চিত হয় যে, দর্শনে যে কথা বলা হয়েছে তার পরিপালনে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এটিই বিশ্বাস। যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। যখন কেউ কোন আরোপিত ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন সে কেবল এগুলোর চরম কেন্দ্র বিন্দু আল্লহ, গড বা ভগবানেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। সে তার সঙ্গে জড়িত পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু চরম কেন্দ্রবিন্দুটি সম্পূর্ন দর্শনের প্রতীক হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই কেবলমাত্র একটি শব্দ বা নাম উচ্চারনের মাধ্যমে সমগ্র দর্শনকে সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া মুহুর্তের কেবল একটি মুখের উচ্চারনই নয়। মুখে স্বীকার করে বলা হলো বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বিশ্বাস স্থাপিত হলো। অতঃপর মানুষ সুপথে চলতে শুরু করে দিলো, বিষয়টি এমন নয়। মুখে স্বীকার করে বিশ্বাস এনেছি বললেও বিশ্বাস আসে না। যদিও এটি বিশ্বাস আনয়নের প্রথম ও একটি প্রধান পূর্বশর্ত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ সময়ের একটি প্রস্তুতিজনিত বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি। কেননা এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন দর্শন সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান লাভ করা, অতঃপর সে জ্ঞানে নিজের আস্থা আনয়ন করা। জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবিধ পর্যায় পেরিয়ে তবেই বিশ্বাস স্থাপনের পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। বহুদিনের চর্চ্চার ফলে যা ধীরে ধীরে ভেতরে গ্রথিত হয়। এ সব কিছু একদিনের কর্মযজ্ঞ নয়। দীর্ঘদিনের চর্চ্চার ফল। যার শুরু শৈশব থেকেও হতে পারে। পরিবার, সমাজ ও সামগ্রীক পরিবেশ এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। তবে এর চর্চ্চা প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়ম মেনে প্রশিক্ষন প্রদানের মত কৃত্রিম উপায়ে করা যেতে পারে। আবার স্বতস্ফুর্ততার সঙ্গে নিজ পর্যবেক্ষন, বিচার-

বিশ্লেষণ বা ধ্যানের মাধ্যমে প্রকৃতিগতভাবেও হতে পারে। যেটিকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপাত নিয়ম বহির্ভূত মনে হতে পারে, তবে সফলতার মুখ দেখতে পেলে পরবর্তিতে সেটিও আবার মানুষের অনুসরণের কারনে নিয়মে পরিনত হয়ে যায়। এভাবে নতুন পথের সন্ধান মেলে। নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা পায়।

রাজা তার ছেলেকে রাজা বানাতে চায়। অন্যতম কারন তার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। এর সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত। দোকানে সবাই একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রত্যাশা করে। হিসাব সংরক্ষণকারীকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত পেতে চায়। স্ত্রীকে বিশ্বাসী পেতে চায়। স্বামীকে বিশ্বাসী পেতে চায়। বিশ্বাস বলতে কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস বোঝায় না। তবে সৃষ্টিকর্তা সকল বিশ্বাসের সমন্বিতরূপের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে কাজ করে। ধারণায় জগতের সমস্ত বিশ্বাসকে ধরে রাখার মূর্ত প্রতীক সৃষ্টিকর্তা। সব নদীর পানি যেমন সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি জগতের সকল বিশ্বাসের ভার পতিত হয় সৃষ্টিকর্তার ওপর। তাই বিশ্বাস ভঙ্গ হলে অন্তর সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাব প্রত্যাশা করে। তিক্ত অভিজ্ঞতাবিহীন অনেকেই কথাটির মর্ম অর্থ হয়তবা সঠিকভাবে অনুধাবন নাও করতে পারে। পার্থিব জীবনে অসহায় যেমন কারনে-অকারনে সরকারের কাছে জবাব প্রত্যাশা করে বিষয়টি তেমন। সৃষ্টিকর্তার ধারণাই জগতের সকল বিশ্বাসের সামগ্রীক ধারণাকে সমুন্নত রাখে। জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই বিশ্বাসী। তবে অবশ্যই বিশ্বাসী যখন সঠিক পথ চিনে নিতে সক্ষম হয় তখন।

“নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, সৃষ্টির মধ্যে তারা সর্বোৎকৃষ্ট।” (আল-কোরআন ৯৮:৭)

যদিও এখানে একটি নির্দিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে। তবে এটি সকল দর্শনের অনুসারিদের জন্যই প্রযোজ্য কথা। এটি সার্বজনিন বক্তব্য। বিশ্বাস ভিন্ন মানুষকে ধরে রাখা কঠিন। বিশেষত যেখানে নগদ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। তেমন ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপনই পারে মানুষকে দিয়ে একটি দর্শনের নির্দেশনাগুলিকে পালন করাতে। তাই চলার পথের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক জীবন বিধান বা দর্শন বাছাইকরন এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়; যা মানুষকে দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করাতে পারে। অর্থের বিনিময়ে লক্ষ্য অর্জনের দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অনেক।

যা হতে পারে ভঙ্গুর এমনকি ধ্বংসেরও কারন। কেননা এ ব্যাবস্থার সাথে তার নিজস্ব কিছু ত্রুটি সম্পৃক্ত থাকে যা এড়িয়ে চলা কঠিন। আবার সেটি এড়িয়ে চলতে হলেও সম্মিলিতভাবে মানুষকে পরিশেষে আরোপিত ধর্মের বিষয়াবলী বা বিধি-বিধানেই সমর্পিত হতে হবে।

জ্ঞান

বিশ্বাস কোন অলৌকিক বা আজগুবি ভাবনার মধ্য দিয়ে হয় না বা আসে না। এটি আসে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত গভীর পর্যবেক্ষণ, অনুভব-অনুধাবন এবং যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যম হয়ে। যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণ শেষে আসবে বিশ্বাসের বিষয়টি। বিষয়টিকে কোন দর্শনের প্রথম ব্যাক্তির অনুধাবনের প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে। কেবল পরবর্তী অনুসারিদের মত করে ভাবলে হবে না। পরবর্তীদের মধ্যে ভূল বুঝার এবং ভূল বুঝাবার আশংকা থেকে যায়। অনুসন্ধানি মন কিংবা নেতৃত্বদানকারী বা পরিচালনাকারী এবং যারা পরিচালিত হয় তথা অনুসারি সকলের জন্য সব বক্তব্য তাই সমভাবে প্রযোজ্য নয়। বিষয়টি স্মরণে আনতেই হবে। আর এ কারনে প্রত্যেককে তার নিজ ভূলের দ্বায় বহন করতে হবে। এ সমস্যাটি কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, এটি ঘটে সকল ক্ষেত্রে এবং এটি ঘটানো সম্ভব হয় জ্ঞান বিবর্জিত ও অন্ধ অনুসারীদের অসহায়ত্বের কারনে। আরও ঘটে বুদ্ধিমান ও স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থের কারনে। মূলত এটি ঘটে ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্পদের ভাগাভাগীজনিত কারনে। বিষয়গুলি সকলের জানা। এখানে এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাই না। প্রসংগে ফিরে আসি।

বিশ্বাসকে ভেতরে গাঁথতে হলে বিষয়ের গুঢু রহস্য বা সত্যটি জানা দরকার। সে কারনে প্রয়োজন জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়। জ্ঞান ভিন্ন যে বিশ্বাস সেটি কেবলি মুখ-নিঃসৃত বিশ্বাস নামক একটি শব্দ। কিংবা বলা যেতে পারে সামাজিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া বিশ্বাস। যেটি কেবলি অনুসরণ বা অনুকরণ। যা নিতান্তই ভঙ্গুর। যে কোন সময় রূপ পরিবর্তন করতে পারে।

সত্যিকারের বিশ্বাসের ভিত জ্ঞান। নিজ জ্ঞান কোন কিছুর যৌক্তিকতায় সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। সত্যিকার বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। জ্ঞান আত্মাকে উপলব্ধিবোধের মাধ্যমে সম্মত করিয়ে ধীরে ধীরে

অনুধাবিত সত্যে বিশ্বাস স্থাপনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সত্যটি জানতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, সত্যিকার অর্থে সে তখন বিপরীতে চলতে পারে না। বিপরীতে চলতে বাধ্য হলেও যথাসময়ে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

জ্ঞান মানুষের অন্তরকে যৌক্তিকভাবে ভাল পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে। জ্ঞান আত্মাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করে দিতে পারে যখন মানুষ নিজ থেকে ভাল হয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাটি অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে। বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। তবে জ্ঞানের কারনে বিশ্বাস সে সত্যে বা অন্য কথায় বলা যায় লব্ধ জ্ঞানে আপনা থেকে বাসা বেঁধে ফেলে।

জ্ঞান মানুষকে তার অনুধাবিত সত্যের সঙ্গে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে বিশ্বাস যেমন মানুষকে কোন ধারণায় বেঁধে ফেলে, জ্ঞানও তাই করে এবং সেটি করে বিশ্বাসকে মাধ্যম ধরে। কেননা সত্যের জ্ঞানটিই বিশ্বাসে পরিনত হয়। জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাস বিশ্বাসীকে নিজ জ্ঞানে অনুধাবিত সত্যের ওপর দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম।

বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার মানসে অনুসন্ধানি মন বিশ্বাসের কারন বা সত্যের সন্ধান করে। সত্যকে জানা সম্ভব হলে অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি পায়। বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সে কারনে প্রয়োজন জ্ঞানের অব্যাহত চর্চ্চা। জ্ঞান ভিন্ন সত্যকে জানা সম্ভব নয়। জানার এ অদম্য তাড়না-বাসনা ভেতর থেকে উৎসারিত। সৃষ্টিকর্তা নিজেই এ বৈশিষ্ট মানবের মধ্যে প্রবেশ করে দিয়েছেন। মুক্তভাবে জ্ঞানের চর্চ্চাকে বাধাগ্রস্ত করা তাই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে ও প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধ আচরণ। অর্থাৎ সমর্পনের বিরুদ্ধাচারন। কেননা জ্ঞানের চর্চ্চার অপর অর্থ হচ্ছে সত্যকে সন্ধান করা। সত্যকে অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে স্বয়ং তাঁকে/বিধাতাকে সন্ধান করা। তিনিই সত্য, সকল সত্যের যিনি ধারক। কেউ বলে আল্লাহ, কেউ ভগবান, কেউ গড।

"… Allah, He is the Truth …" "... আল্লাহ! তিনিই সত্য ..." (আল-কোরআন ২২:৬),

"… I am the conclusive truth." "... আমিই চূড়ান্ত সত্য।" (গীতা ১০:৩২)

বিশ্বাস ও জ্ঞান চলে হাত ধরাধরি করে। বিশ্বাস জ্ঞানের কাছে জানতে চায় সে কোন বিষয়ে বিশ্বাস রাখবে কিনা। জ্ঞান বিষয়ের ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে সম্মতি বা অসম্মতি জানায়। জ্ঞান যদি কোন বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে বিশ্বাস তাকে

শক্তভাবে ধারণ করে। জ্ঞান বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার অর্জিত জ্ঞানটিকে বিশ্বাসের কাছে আমনত রাখে। বিশ্বাস সে আমানতের খেয়ানত করে না, যতক্ষণ না জ্ঞান ভিন্ন কিছু বলে। তারা একে অন্যের পরিপুরক।

জ্ঞান মানুষকে এক পর্যায়ে তার ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব অনুধাবনেও সহায়তা করে। পারস্পরিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মানুষ মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন দেখতে পায়। একা অনুভব করে। কিন্তু সকলের পক্ষে সেটি অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে যারা জাগতিক সকল কর্মকান্ডের পরিনতির বিচার বিশ্লেষণ করেন, বিষয়টি তাদের কারও কাছে এমনিভাবে ধরা দিতে পারে। অতঃপর অবশিষ্ট থাকে শুধু সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার সর্বশেষ ভরসাস্থল বা আশ্রয়দাতারূপে তখন কেবল সৃষ্টিকর্তাকেই খুঁজে পায়। এমতাবস্থায় মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পন করে। অর্থাৎ মস্তিস্কের চিন্তা জগতের সর্বশেষ প্রান্ত এটি। কারও ধারণায় বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে অন্যকিছু হতে পারে, যেমন প্রকৃতি। অর্থাৎ যতটুকু সে বাস্তবে দেখতে পায় বা বলা যায় যতটুকু তার দৃষ্টির সীমায় সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিংবা কিছুই না- কেবলি শূন্য। পিপড়ে যেমন মহাসমুদ্রে একটি পাতার ওপর ভেসে থাকে তেমন। একমাত্র অবলম্বন। একমাত্র আশ্রয় স্থল। ভরসার স্থান। ভালবাসার স্থান। অবলম্বন। তৃপ্তি। শান্তি। আনন্দ। আত্মা তখন কেবল সৃষ্টিকর্তায় নিমগ্ন থাকে। অন্য সবকিছুকে অর্থহীন দেখতে পায়। জগতের সকল আস্ফালনই যে কেবল মিছে মরিচীকা জ্ঞান সেটি বুঝতে সহায়তা করে।

"... পার্থিব জীবন এক মরিচীকা বৈ আর কিছু নয়।" (আল-কোরআন ৫৭:২০)

জাগতিক সকল বিচার বিশ্লেষণ শেষে জ্ঞান যখন এক সৃষ্টিকর্তার কাছে এসে ভিড়ে বা সমর্পিত হয়, তখন সে বন্ধন হয় সাধারণ বিশ্বাসের চেয়েও মজবুত ও শক্তিশালী। জ্ঞানী যখন নোঙ্গর করে সে সৃষ্টিকর্তার কাছে নোঙ্গর করে, কিংবা কোন দর্শনের তত্ত্বের কাছে বা কোন মহামানবের কাছে, যিনি একটি সত্য বার্তার ধারক। এটি ঘটে যার যার শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে। যখন নোঙ্গর করতে পারে না তখন নিরব থাকে। অন্তত আস্ফালন করে না। যে ব্যাক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে নিশ্চিতভাবেই সে প্রভূত কল্যান প্রাপ্ত।

"তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রকৃত অর্থেই প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউই তা স্মরণ করে না।" (আল-কোরআন ২:২৬৯)

বিশ্বাসীর চেয়েও জ্ঞানীর মর্যাদা উচচ স্তরে। আর জ্ঞানী যদি হয় বিশ্বাসী তবে সে সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানহীন বিশ্বাসী কচুপাতার পানির মত টলটলায়মান। অপরদিকে বিশ্বাসহীন জ্ঞানী জ্ঞানের কারনেই সত্যে বিশ্বাসী। মানব জ্ঞানের সর্বশেষ পর্যায়ে জ্ঞানের যাওয়ার আর কোন পথ নেই। তাই জ্ঞানীর আত্মা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনেই আপনা থেকে অন্তরে নিজ নিজ আপাত ধারণাজনিত সত্যে সমর্পিত আত্মা-তাই বিশ্বাসী। সত্যের সে প্রতীকী নাম আস্তিক কিংবা নাস্তিক যাই হোক না কেন।

অন্ধ বিশ্বাসী

জ্ঞানের তারতম্যজনিত কারনে বিশ্বাসী দু'ভাগে বিভক্ত। এক: সত্যিকার বিশ্বাসী এবং দুই: অন্ধ বিশ্বাসী। যে ব্যাক্তি বিষয়ের গুঢ় রহস্য না জেনে বিশ্বাস করে সে অন্ধ বিশ্বাসী নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে সে কোন কিছুতে বিশ্বাসী নয়, সে কারও অনুসারি।

জ্ঞান ভিন্ন কোন মানুষকে কোন ধারণায় বিশ্বাসী করে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তা সে যত ক্ষুদ্র জ্ঞানই হোক না কেন। যারা অন্ধ অনুসারি তাদের পেছনেও কোন জ্ঞানীর জ্ঞান কাজ করে।

সাধারণত জ্ঞান দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করার পর নিজ অন্তর কোন একটি বিষয়কে গ্রহনে সম্মতি অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু সবাই বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবে না। কিছু মানুষ কেবল অনুসরণ করবে। এক অর্থে এটিরও প্রয়োজন আছে। সমাজে সব ধরনের মানুষেরই প্রয়োজন আছে। অন্তত ততক্ষন, যতক্ষন কেউ একজন নিজ আগ্রহে বিষয়গুলি অনুধাবনের চেষ্টা না করছে। অন্ধ বিশ্বাসে সমস্যা নেই। শৈশবে প্রতিটি প্রাণী মা-বাবাকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। কোন সমস্যা হয় না। বাবা-মা ভূল পথে তাদের চালনা করেন না। সমস্যা হচ্ছে নির্ভরশীলকে ভূল পথে চালনা করা।

অন্ধ বিশ্বাসীকে ভূল পথে চালনা করা সহজ। কেননা সে তত্ত্বের পেছনের সত্যটি জানে না। সে জানে না যে, সে কেন একটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখছে। সে চালিত হয় তার মাষ্টার দ্বারা। সে তার মাষ্টারকে বিশ্বাস করে। এমন বিশ্বাসীকে যে

কেউ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ভূল পথে চালনা করতে পারে। আর সেটি করে জ্ঞানী। সে কারও বিবিধ প্রকৃতির অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। বিধাতার রিতিতে সে পাপী।

নিজ বিশ্বাস দ্বারা যারা ভূল পথে চালিত হয়, তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দায়-দায়িত্ব বিচার বিবেচনা সাপেক্ষে তাদের নিজেদের, কিংবা তাদের পরিচালনাকারীদের। দর্শনের নয়। ঠিক যেমন বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের দায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর নয়। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ সত্বেও বিজ্ঞান মর্যাদার আসনে আসীন। অবুঝ বিশ্বাসীর ভূল আচরণের দায় মাষ্টারের ওপরেও বর্তায়, যিনি দর্শনের শিক্ষা দেন বা তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং জ্ঞানীর ক্ষেত্রে এ দায় তার নিজের।

বিশ্বাস ও জ্ঞান

উদ্ভূত কোন ভাবনা বা ধারণা (Idea) মানব মস্তিস্কে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোন একদিন আচমকা একটি বিশ্বাস অন্তরে বাসা বাঁধে। কথাটি কোন বিষয়ে বিশ্বাসের একেবারেই প্রাথমিক বা সৃষ্টিকালীন বা উৎপত্তিকালীন সময়ের ভাবনাকে বিবেচনা করে বলা হচ্ছে। কোন একদিনটি হচ্ছে সেই দিন যেদিন ভাবনার (Idea) বিষয়টিকে নিয়ে মস্তিস্কে বা অন্তরে জ্ঞানের অনুপ্রবেশটি আচমকা ঘটে যায়। অন্তর নিজেই চমকিত হয়ে যায় এই ভেবে যে, আরে! এভাবে তো বিষয়টিকে নিয়ে কখনও ভাবিনি! জগতের অনেক তত্ত্ব ও সূত্রের প্রাপ্তি এভাবেও ঘটেছে। চেষ্টা করেও যে জ্ঞান অর্জন করা হয়তবা সম্ভব ছিল না।

নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় যে ডুব দিয়ে আগ্রহ ও ধৈর্য্যের সঙ্গে লেগে থাকে, সত্য নিজে এসে তার কাছে ধরা দেয়। সত্যের জ্ঞান আচমকা একদিন অন্তরে এসে বাসা বাঁধে। অতঃপর বিচার বিশ্লেষণ শেষে বিশ্বাসে রূপ লাভ করে।

"তুমি যে রূপটি বা গঠন/আকার/আকৃতি বা প্রকারটি দেখছো ... তা কেবল অধ্যায়নের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয় ..., না কোন গুরুতর তপস্যা করে, দান-খয়রাত করে বা পূঁজা-অর্চনা করে বোঝা সম্ভব। এগুলি সে উপায়/মাধ্যম নয় যা দ্বারা আমি যা তা একজন দেখতে পাবে।" (গীতা ১১:৫৩) "যারা নিরন্তর সাধনা করে যায়/নিষ্ঠাবান এবং আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসার সাথে উপাসনা করে, আমাকে বুঝতে আমি (নিজেই) তাদেরকে সহায়তা দিয়ে যাই, যা দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।" (গীতা ১০:১০)

কেবল নিয়ম বা বিধি বিধানের পরিপালনের মাধ্যমেই সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়। সে বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না। কেবল নিয়মের অনুসরণই সত্যের পথ প্রদর্শন করে না, যদিও সেটি অপ্রয়োজনীয়ও নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি অনুসন্ধিৎসু মন, বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বা সত্যিকারের আগ্রহ এবং অধ্যাবসায় বা আরাধনা। নিজের আগ্রহের কর্মের প্রতি থাকতে হবে নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা, যা কৃত্রিম হবে না। কিন্তু বাস্তবে জগতের সব মানুষই কি তেমন প্রকৃতির হবে? তাই সুশৃংখল সমাজ ও মানব ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ম ও বিধি বিধানও থাকবে।

কোন সূত্র বা ধারনার আচমকা প্রাপ্তির ঘটনাটিও কিছু নিয়ম মেনে চলে। যে বিষয়ের প্রতি মানুষের সত্যিকারের আগ্রহ আছে ঘটনাটি সাধারনত সেদিকে ঘটে। জ্ঞান অর্জন কিংবা প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। আগ্রহ থেকে দীর্ঘকালীন আন্তরীক চর্চা, ধারাবাহিক পরিচর্যা এবং এসবের সঙ্গে প্রয়োজন ধৈর্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে সৌভাগ্য। সত্য অনুধাবণের ক্ষেত্রটি এসব নিয়মের ব্যাতিক্রম নয়।

এক অর্থে আবার জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে বিশ্বাস হচ্ছে প্রথম ধাপ। কেননা বিশ্বাসই প্রথম একটি নির্দিষ্ট ভাবনার সীমানার মধ্যে মানুষকে অবস্থান করতে শেখায়। ভাবনার সীমানা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ব্রম্মান্ডের বিশাল ভান্ডারে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া একটি দুরূহ বা প্রায় অসম্ভব কাজ। ফলে ধাপে ধাপে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশও অচিন্তনীয়। কোন বিষয়ে অন্তরে প্রাথমিক বিশ্বাসের আগমন ভাবনার একটি সীমানাও নির্ধারণ করে দেয়। ভাবনার এ সীমানা উদ্ভ্রান্তের চিত্তে স্থীরতা দেয়। স্থীরতা ভিন্ন কি করে জ্ঞান অর্জন সম্ভব? জ্ঞান ভূল বিশ্বাসকে দূরীভূত করে। সঠিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে।

জ্ঞান তার নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে মানুষকে বিশ্বাসের এক স্তর থেকে আরেক স্তরের বিশ্বাসীতে উন্নীত করে। মানুষকে যৌক্তিকভাবে কোন বিষয় বুঝতে সহায়তা করে। ফলে বিশ্বাস দৃঢ়তা পায়। অন্তরের এই দৃঢ়তা আস্থা ও বিশ্বাসের পথ ধরে বিশ্বাসীকে সমর্পনের পথ পর্যন্ত নিয়ে যায়। প্রকৃতি, বিধাতা বা সত্যের প্রতি সমর্পনই প্রকৃত ধর্ম! আত্মা বা অন্তর যখন বিধাতা, প্রকৃতি ও

পরিবেশের প্রতি সমর্পিত হয় তখন জ্ঞানের কারনে সে প্রকৃতই বোধসম্মতভাবে সমর্পিত হয়। সমর্পনের পথে গমনে বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। জগতে তাই বিশ্বাসী ও জ্ঞানী উভয়ই উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির যথার্থই অধিকারী।

"... তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যারা জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। ...।" (আল-কোরআন ৫৮:১১)

এক অর্থে একজন অবুঝ বিশ্বাসীর ক্ষেত্রেও জ্ঞানের অনুপস্থিতি নেই। কেননা সে কোন জ্ঞানীর বিশ্বাস বা জ্ঞানকে ধারণ ও অনুসরণ করে। জগতে তেমন অনুসারী বা বিশ্বাসীরও প্রয়োজন আছে। তেমন অনুসারী বা বিশ্বাসী ভিন্ন জগতে অনেক কাজই কেবলমাত্র পরিচালনাকারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। কথাটি কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, কর্মের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আরোপিত কোন ধর্মের অবুঝ অনুসরণকারী বিশ্বাসীদের নিয়ে সচরাচর যে আশংকা প্রকাশ করতে দেখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্মের সকল ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে যাদের দিয়ে কাজ করানো হয়, তাদের ক্ষেত্রেও পেছনের আশংকার গল্পটি একই। ধর্ম এবং কর্মের অপরাপর সকল ক্ষেত্রগুলিতেই এমন অনুসরণকারীরা মাষ্টার দ্বারা পরিচালিত হয় বাস্তব জীবনের নানান সীমাবদ্ধতার কারনে। জ্ঞানীরা তাদের কাজে লাগায়। দর্শন, জ্ঞান কিংবা বিশ্বাসের এসব ক্ষেত্রে কোন দায় নেই।

বিশ্বাস ও জ্ঞান আরোপিত ধর্ম বা দর্শনের শিক্ষার ওপর মানবাত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে। অথচ কেবল জ্ঞান আরোপিত দর্শন সৃষ্টিতেও সক্ষম।

মানুষের ওপর আরোপিত ধর্ম আরোপকরনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও জ্ঞান কৌশল হয়ে কাজ করে না। বলা যেতে পারে কৌশলকে কার্যকরীকরনের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত মাধ্যম, উপায় বা সংযোগ সৃষ্টি বা স্থাপনকারী হিসেবে এগুলি কাজ করে।

মানুষ যেন আরোপিত ধর্মের দিক নির্দেশনা নিজ থেকে মেনে নিয়ে চলতে সক্ষম হয়ে ওঠে, সেজন্য ধর্মীয় দর্শনসমুহে প্রায়োগীক নানাবিধ কলা কৌশলেরও দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেসব কলা কৌশলের পরিপালন মানসিক অবস্থাকে ধাপে ধাপে বিশ্বাসের নিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। এসব ব্যাবস্থাগুলি সামাজিক অবস্থাকেও বিশ্বাসীর অনুকূলে নিয়ে আসতে সহায়তা করে। ফলে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে দিক নির্দেশনা প্রদর্শিত পথে চলার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীর নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাসমুহও দূরীভূত হয়। স্বতঃস্ফুর্ততার ধরনটি এখানে এমন যে, এটি

বিশ্বাসীকে নিজ থেকে নির্দেশনা পরিপালনে মানসিকভাবে এক প্রকার বাধ্যও করে। অর্থাৎ কোন নির্দেশনা যথাসময়ে পালন করতে ব্যার্থ হলে বিশ্বাসী মানসিকভাবেও অস্বস্তিবোধ করে। মানসিক অবস্থাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান তথা নানাবিধ কলা-কৌশলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরোপিত ধর্মের কিছু কলা-কৌশল নিয়ে এ পর্যায়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। মানুষের ওপর ধর্ম বিজ্ঞানের যে প্রভাব কার্যকর হতে দেখা যায় তার মূল রহস্য বলা যায় এখানেই নিহিত।

৫. কৌশল

কৌশল ও তার প্রয়োগ

কৌশল শব্দটি শুনলে চমকে উঠতে হয়। ধূর্ততা, চালাকি, ষড়যন্ত্র, কুট-কৌশল এমনি সব শব্দের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে মনের মধ্যে 'কৌশল' শব্দটির বিষয়ে একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়।

কৌশল নেতিবাচক কোন শব্দ নয়। কৌশলের মধ্যে রয়েছে সূত্র বা সত্যের উপস্থিতি। সত্য হচেছ একেবারে যথাযথ বা সঠিক উপায়টি। কিছু সত্য মন্দের জন্য সঠিক। কিছু সত্য ভালর জন্য সঠিক। কৌশলের প্রয়োগ যখন নেতিবাচক ফল প্রদান করে তখন তা মন্দ প্রতীয়মান হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন তা ইতিবাচক বা ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কারনে ভাল ফল প্রদান করে, তখন তা মন্দ নয়, বরং ভাল এবং যথার্থ বা যথাযথভাবে সম্পন্ন করণীয়কে বোঝায়, যা সঠিক। তেমন ক্ষেত্রে সে সূত্রটিই সত্য।

কৌশলের প্রয়োগ সঠিক হলে হোক সেটি নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক প্রত্যাশিত ফল আসবেই। ইতিবাচক কর্মে কৌশলের প্রয়োগ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক। ধূর্ততা কিংবা চালাকির নয়।

কোনরূপ চাপের প্রয়োগ ছাড়া চুম্বক উত্তর দক্ষিনমুখী হয়ে থাকে। সূত্রটি সত্য। এটি চুম্বকের একটি ধর্ম। চুম্বকের এ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলতে জানলে গুণটিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সম্ভব।

পদার্থগুলি নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী চলে। তাদের এসব ধর্মকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়। যদিও এসব সৃষ্টি মূলত সৃষ্টি নয়। কেননা এগুলি কোন মৌলিক সৃষ্টি নয়। প্রকৃতিতে বিরাজমান কিছু সত্যের সংযোজন বিয়োজন মাত্র। তথাপি এসব সৃষ্টিতে মানুষকে সত্য বা সূত্রটিকে খুঁজে বের করে বা জেনে নিয়ে কৌশলের প্রয়োগ করতে হয়।

চাপ প্রয়োগ ভিন্ন মানুষও তার সহজাত ধর্ম অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে। মানুষের সহজাত ধর্ম বিপরীতমুখী। বিপরীতমূখী এসব সহজাত ধর্মের একেকটি গুণ একেকটি মানুষের মধ্যে অধিকভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষকে তার

পরিবেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে আয়োনাইজড বা ধনাত্মক কিংবা ঋনাত্মক চার্জযুক্ত ভাবা যেতে পারে। মানুষের একেকটি গুণ একেকটি কাজের উপযোগী। কোন কোন গুণ মানুষের দ্বারা কোন কিছু সৃষ্টিতে সহায়তা করে, আবার কোন কোন গুণ ধ্বংসের কারন হতে পারে। পরিবেশের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা মানুষের কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট যেমন- হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ ইত্যাদি ও এসবের চরম বহিঃপ্রকাশ ধ্বংসের কারন হতে পারে। তবে এসব গুণকে মানুষের উপকারার্থে কাজে লাগাতে হলে কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন। দক্ষতার সঙ্গে কৌশল প্রয়োগে সক্ষম হলে মানুষকে দিয়ে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সব কাজ করানো সম্ভব।

আণুবীক্ষনিক কিংবা দুরবীক্ষনিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা যেমন খাদ্য থেকে শুরু করে বিবিধ গুণাগুণ সম্বলিত পদার্থ খুঁজে পাই বা অন্যভাবে বলা যায় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ খুঁজে পাই যা উপকারী বা অপকারী, তেমনি একেকটি মানুষও কিছু না কিছু গুণাগুণের ধারক। অতি দুর থেকে খালি চোখে দেখা না যাওয়া মানুষগুলি তেমনি বিবিধ পদার্থ বা উপাদানের মত গুণাগুণের ধারকমাত্র; যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন শক্তির উৎস হয়ে ধরা দেয়।

ভাল গুণগুলিকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জযুক্ত মানুষকে দিয়ে ভাল কাজ করানো সম্ভব। মন্দ গুণগুলিকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ ঋনাত্মক চার্জযুক্ত মানুষকে দিয়ে মন্দ কাজও করানো সম্ভব। আবার জটিল কৌশল বা সূত্রের প্রয়োগে ভাল দিয়ে মন্দ কিংবা মন্দ দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। ঠিক যেমন সঠিক এ্যাঙ্গেলে আঘাত করে ক্যারম খেলায় সাদা গুটিকে দিয়ে কালো গুটি ফেলে দেয়া সম্ভব বিষয়টি তেমন। প্রয়োগের কৌশল যদি জানা থাকে এবং প্রয়োগ যদি সঠিক হয়, তবে যথার্থ ফলাফল আসতেই হবে। এটিও সত্য।

নিয়ত যদি ভাল হয় এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও তার প্রয়োগ যদি সঠিক হয়, তবে বলা যেতে পারে সৃষ্টিতে মন্দ বলে কিছু নেই। বিষ যেমন অপকারী তেমনি উপকারী। মন্দের উৎপত্তি মূলত মন্দ নিয়ত ও প্রয়োগের ভূল থেকে। ভাল ও মন্দ সকল গুণই প্রয়োজনীয়। সৃষ্টি যেমন প্রয়োজন তেমনি নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে ধ্বংসও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। কেবল কৌশলের প্রয়োগটি সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে, সঠিকজনের ওপর সঠিকভাবে হতে হবে।

ব্যাক্তিক এবং সামষ্ঠিক মানুষকে পরিচালনার জন্য চাই তার সহজাত ধর্মকে কৌশলে ড্রাইভ করা। অর্থাৎ তাকে নতুন কিছু সৃষ্টির ন্যায় প্রয়োজন উপযোগী করে পরিচালনা করা। নৌকা, বাতাস ও পাল এই তিনের যথাযথ সমন্বয় করে যেমন নৌকাকে চালনা করা হয় বিষয়টি তেমন। অর্থাৎ সহজাত ধর্মের গুণ বা বৈশিষ্টগুলিকে কৌশলে কাংখিত ফলাফলের সঙ্গে সংযোজন-বিয়োজন করে মানুষকে পরিচালনা করা। গুণ সবই বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল যথাসময়ে যথাস্থানে কোন একটি গুণের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা কিংবা স্থগিত রাখা।

শক্তি প্রয়োগে নয়, বাইরের কোন চাপ কিংবা আইন প্রয়োগের ভয়ে নয়, লক্ষ্য অর্জন হবে কৌশলে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে। সঠিক কৌশল প্রয়োগের কারনে কর্তা নিজেই নিজের ভেতরের মন্দ ইচ্ছের বিপক্ষে শক্তি প্রয়োগ করবে। এটিই আত্ম নিয়ন্ত্রন। মানুষ সমাজে চলতে গিয়ে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রন বা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে। ব্যাবস্থাটি প্রতিষ্ঠায় কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

মানুষের সহজাত ধর্মের ভাল ও মন্দ বৈশিষ্টগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রন বা প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল অর্জনে আরোপিত ধর্ম কৌশল অবলম্বন করে। তাই মানুষ ও সমাজের মঙ্গলার্থে এমনিতর এক কার্যকর পন্থাকে বিতর্কিত করার মধ্য দিয়ে এড়িয়ে না গিয়ে বরং কি করে অধিকতর কার্যকরী উপায়ে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে ভাবা যেতে পারে।

কৌশল ও শর্ত

প্রতিটি কাজের পেছনে একটি দর্শন কাজ করে। কাজের পেছনের সে দর্শনটিতে আস্থা বা বিশ্বাস রাখা জরুরী। অন্যথায় কাজটি আন্তরীকতার সঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। কাজে আন্তরীকতা ব্যাতিত সেটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করাও সম্ভব নয়। যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদন ভিন্ন কাজে সফলতাও আসে না। কি ব্যাক্তিক কি সামষ্ঠিক, কাজে সফলতা প্রাপ্তির জন্য মানুষকে তার কর্মের পেছনের দর্শনটিতে বিশ্বাস রাখতে হয়। ওপরে জ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কোন বিষয়গুলিতে বিশ্বাস রাখতে হবে সেটি আলোচনা করা হয়নি।

আরোপিত ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিছু অর্জন করতে হলে কতগুলি শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। শর্তগুলি কৌশলের অংশ। শর্তগুলি

অলীক নয়। বিচার বিশ্লেষণ শেষে যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানভিত্তিক এ কারনে যে, এখানে যেমন মানব জীবনের ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও করণীয়সমুহকে নিয়ে ভাবা হয়েছে বা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি মানবের চরিত্র-গুণাগুণ ও বৈশিষ্টগুলিকে নিয়েও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিচার-বিশ্লেষণ মানুষকে নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে বা প্রভাবিত করে সেসব বিষয় বুঝতে সহায়তা করেছে। ফলে মানুষকে কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত ফল অর্জনের উপায় বা পথ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। করণীয় নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। আর এ পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে জ্ঞান মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। জ্ঞান ভিন্ন এসব উপায় বা পথের সন্ধান লাভ করা কখনই সম্ভব হতো না। তাই বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়টিও সঙ্গত কারনেই আলোচনায় চলে আসে। মানুষ ও তার করণীয় সম্পর্কে আরোপিত দর্শনসমুহ যেসব পথ বা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে, জ্ঞান ভিন্ন সেসব বিষয়ে এত সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। জ্ঞানই মানুষের কাছে বিষয়গুলিকে বোধগম্য করে তুলে ধরেছে। ফলে জ্ঞান এবং জ্ঞান থেকে সৃষ্ট বিশ্বাস আরোপিত দর্শনের শর্তসমুহের সঙ্গে মানব জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়েছে। এ সংযোগ মানুষকে স্বতস্ফুর্ততার সঙ্গে দর্শন নির্দেশিত কমান্ড মেনে চলতে ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ করে। মস্তিষ্ক যখন কোন জ্ঞান আহরণ, প্রাপ্ত বা ধরণ করে এবং অন্তর যখন তাতে তৃপ্ত হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তখন সে আর উল্টো চলতে পারে না যদি না সে অবিবেচক হয়। কেন পারে না? যারা মস্তিস্কের মহাজটিল কর্ম প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষনা করেন কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয় হয়তবা তারা বিষয়টি জেনে থাকতে পারেন, কিংবা কখনও উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন। তবে এ লেখায় এ বিষয়ে আপাতত আর এগুবার প্রয়োজন নেই বলে মনে করি।

বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া কঠিন। কেননা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বিশ্বাস স্থাপনের কলা-কৌশল ও শর্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট কোন একটি দর্শনকে বাছাই না করে এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক উত্তর দেয়া কঠিন। অথচ চলমান আলোচনায় কোন সুনির্দিষ্ট দর্শনকে দিক নির্দেশনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি। আবার একটি নির্দিষ্ট দর্শনকে ভাল কিংবা সঠিক বলে এ লেখায় নির্ধারণও করে নিতে চাচ্ছি না। কেননা সেটি করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আবার এর কোন একক সঠিক উত্তরও নেই বা হতে পারে না। মানুষ

তার নিজ নিজ পরিবেশ, পরিস্থিতি, অভ্যস্ততা ইত্যাদি নানান বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার বিশ্লেষণ শেষে সাধারণত কোন একটি বিষয় বা দর্শনকে নিজের মত করে বেছে নেয়।

দর্শন হিসেবে ধর্মগুলি যুগ যুগ ধরে সমাজে বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে শান্তি ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যদিও এ বিষয়ে কিছু বিতর্কিত ও বিরূপ আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে, তথাপি সমাজ জীবনে ধর্মের অবদান অনস্বীকার্য। ধর্মের বিদ্যমানতা ছাড়া মানবের অতীত ইতিহাস হয়তবা আরও বিভ্রান্ত ও নারকীয়ও হতে পারতো!

ধর্মীয় দর্শনের ছায়াতলে রয়েছে নানাবিধ দর্শন। ফলে কোনটিকে রেখে কোনটিকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে আলোচনা করবো? পূর্বেই বলেছি, কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম নির্বিশেষে আমরা যে সব সাধারন আচরণ করি তার পেছনে কারনরূপে বিদ্যমান সত্যটিকে জানা এবং এ বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা প্রনয়নের চেষ্টা করা। ফলে এখানে কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে বাছাই না করে ধর্মীয় দর্শনসমুহের কিছু সাধারণ বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়ে আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমেই সত্যকে জানার বা অনুধাবনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে চাই।

অধিকাংশ ধর্মেই সাধারণ বা মূল বিষয়গুলি মোটামুটি একই রকম বলা চলে। ফলে কাজটি করার ক্ষেত্রে এটি একটি সুবিধারূপে বিবেচিত হতে পারে। তবে সেটি করতে গিয়েও লেখার সুবিধার্থে লেখকের স্বাচ্ছন্দের বিষয়টি কিছুটা হলেও প্রাধান্য পেতে পারে। পাঠককে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইলো।

কোন দর্শন বা ধর্মে আস্থা স্থাপন বা বিশ্বাস আনয়ন বলতে বোঝায়, দর্শনটি যে পথ প্রদর্শন করে তা মেনে চললে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আস্থা ও বিশ্বাস রাখা। অর্থাৎ দর্শন যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে তবে দর্শনের নির্দেশনা মেনে চললে বা দর্শন প্রদত্ত ছক অনুসরণ করে চললে ব্যাক্তিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে সে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা। সেটি করতে হলে প্রথমেই দর্শনটিকে জানতে হবে।

কোন একটি বিষয়ের অন্তরস্ত বিষয়গুলি কি জগতের সকল মানুষ নিজ জ্ঞান দ্বারা পর্যালোচনা ও বিচার-বিবেচনা করার সুযোগ পাবে? মানুষের রয়েছে নানান ব্যাস্ততা। উপরন্তু আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সমভাবে সকল স্থানে গিয়ে আজও পৌঁছাতে পারেনি। ফলে কিছু মানুষ তার মাষ্টারকে অনুসরণ করবে এটিও সত্য। বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখতে।

ঔষধ ব্যবহার করে ফল পেতে হলে সেটি ব্যবহারে কিছু নিয়ম বা শর্ত থাকে। ঔষধ কোথায় কিভাবে সংরক্ষন করতে হবে, কত সময় পর পর খেতে হবে, কতদিন খেতে হবে, কিভাবে খেতে হবে ইত্যাদি। শর্তের অন্যথা হলে ঔষধ সঠিকভাবে কাজ দেবে না। মানুষকে সফলভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আরোপিত ধর্ম যে পথ প্রদর্শন করে সে পথে চলতে হলেও কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়। সে শর্তগুলি সঠিকভাবে পরিপুরন না হলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে শর্ত পালনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত আরোপিত ধর্মের ক্ষেত্রে শর্ত পালনের বিষয়টি জগতব্যাপি বহু মানুষের সম্পৃক্ততা ও তাদের ব্যবস্থাপনার কারনে কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। উপরন্তু সহজাত ধর্মের প্রচন্ড মন্দ আকর্ষনকে উপেক্ষা করে তাকে মানুষের ওপর কাজ করতে হয়। এছাড়াও ধর্মীয় নির্দেশনা পরিপালনে এখানে নগদ কোন প্রাপ্তি নেই। বিশ্বাসীকে তাই দর্শনের শর্ত সমুহে প্রচন্ডভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয়। এখানে নিয়মের বিন্দু বা চুল পরিমান ছাড় দেবার অবকাশ নেই। নিয়মের প্রতি একটু শৈথিল্য প্রদর্শন গোটা ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে দিতে পারে। দর্শনের প্রভাব সেক্ষেত্রে মানবের ওপর শক্তিশালী হয়ে ক্রিয়া করবে না।

আরোপিত ধর্মের শর্তগুলিতে স্থাপিত বিশ্বাসই মানুষকে তার প্রদর্শিত পথে কঠিনভাবে ধরে রাখতে সহায়তা করে। সমগ্র পথ নির্দেশনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন যদি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ গীয়ার, তবে শর্তগুলি হচ্ছে তার এক একটি দাঁত। যা সামগ্রীক বিষয়াদিকে একটি লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়তার সঙ্গে আকড়ে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

আরোপিত ধর্মের যে সকল শর্তসমুহে বিশ্বাসীকে বিশ্বাস রাখতে হয় সেসব বিষয়গুলি কমবেশী সকলেরই জানা। সকল প্রধান ধর্মের সাধারণ বা মূল বিষয়গুলি মোটামুটি একই রকম বলা যেতে পারে; যেমন- সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, উপাসনা করা

এমন সব বিষয়। এসব নিয়ে এখানে তেমন বেশী কিছু আলোচনার নেই। তবে আরোপিত ধর্মীয় দর্শনসমুহে এই সকল শর্তগুলির বিদ্যমানতা কেন সে বিষয়ে আলোচনা কম হতে দেখা যায়। উপরন্তু এ বিষয়ে জ্ঞান, যৌক্তিকতা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিবোধ মানুষে মানুষে পার্থক্যপূর্ণ হতে পারে এবং সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা-

"... প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপরে আছে একজন অধিকতর/সর্ব জ্ঞানী।" (আল-কোরআন ১২:৭৬)

এ লেখার উদ্দেশ্য মূলত বিষয়ের কারন, সূত্র বা পেছনের সত্যটিকে জানা। তাই ধর্মীয় দর্শনগুলিতে যে সকল শর্ত আবশ্যকীয়ভাবে পরিপালন করতে হয়, সে সব শর্ত কেন পালন করতে হয় তার যৌক্তিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ এসব নিয়ম বা সূত্রের পেছনের কারণ বা সত্যটি কি সেটি জানার চেষ্টা করা হবে।

পৃথিবীর সকল জ্ঞানী কোন একটি বিষয়কে একই রকমভাবে ভাবে না বা বোঝে না। মানুষে মানুষে বোধ ও জ্ঞানে পার্থক্য পরিলক্ষীত হয়। তাই সত্যকে খুঁজে পেতে হলে মুক্ত ভাবনা ও আলোচনার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় পৃথিবী আজকের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতো না। নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতো না। গাছে গাছে এত ডালের সৃষ্টি হতো না যা ছাঁয়া দান করে, নদীতে এত শাখা-প্রশাখা হতো না যা কল্যাণ বিতরণ করে। এমনকি যে সকল ধর্ম তাদের উৎপত্তিকালীন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও মুক্ত চিন্তার ধারক ও বাহকরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তারাও প্রসার লাভ করে আজকের পর্যায়ে আসতে পারতো না এবং মানব মুক্তির পথ প্রদর্শক হয়ে আবির্ভূত হতে পারতো না।

যুগের সঙ্গে তাল রেখে জ্ঞান অগ্রগতি লাভ করে। ফলে নতুনভাবে বিচার বিশ্লেষণ হবে ও নব নব জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটবে। বলা যায় প্রতিটি মস্তিস্কই নতুন নতুন ধারণার ধারক। আর এগুলি সব বিধাতাই করেন। অন্তর যার অনুসন্ধানি নয় হয়তো তার জন্য সত্য সন্ধানের প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমানে মানুষ যা কিছু ভোগ করে চলেছে, অগনিত অনুসন্ধানি আত্মা যারা নিজেরা ফল ভোগ করে যায়নি, তারা সে পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

আরোপিত দর্শনের পথ ধরে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে হলে দর্শনের শর্তসমুহে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য্য। তবে সেটি করতে হবে জ্ঞানকে ব্যবহার করে। নিজ জ্ঞান যতক্ষন পর্যন্ত সামগ্রীক বিষয় উপলব্ধি করা সাপেক্ষে তাতে সম্মতি প্রদান না করছে, ততক্ষন অন্তরে বিশ্বাস বাসা বাঁধবে না। অবশ্য কেউ যদি তার মাষ্টারকে বিশ্বাস করার কারনে শর্তগুলিতে বিশ্বাস রাখে তবে সেটিও সফলতার মুখ দেখবে। সে কারনেই দার্শনিক, নেতা, প্রবক্তা এবং তাদের অনুসারিদের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

"... এই সেই গ্রন্থ, যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ প্রদর্শনকারী, তাদের জন্য, যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে, যারা না দেখা (Unseen) বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ...।" (আল-কোরআন ২:২-৩)

গ্রন্থ - যা আরোপিত ধর্ম বা দর্শনের বক্তব্যকে মানবের সামনে তুলে ধরেছে, সেটি সন্দেহাতীতভাবেই মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক বা দিক নির্দেশনা- এ বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থের শুরুতে সর্বপ্রথম এটিই ঘোষনা করা হয়েছে যে, এটি মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনা। তবে এই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এটি সঠিক পথের দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে তাদের জন্য, যারা মন্দ পথ ও কাজ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ আরোপিত ধর্মকে দিক নির্দেশনা হিসেবে পেতে চাইলে মন্দ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলার একটি মানসিক অবস্থা বা ইচ্ছে নিজের ভেতরে থাকতে হবে কিংবা সে অবস্থা তৈরী করে নিতে হবে। এটি সর্ব প্রথমেই অন্তরকে নমনীয় করে নেয়ার একটি কৌশল, অর্থাৎ নতুন কিছুকে গ্রহণ করার পূর্বে নিজের ভেতরে তার জন্য একটি ধনাত্মক মানসিক অবস্থা তৈরী করা। পথ নির্দেশনা থেকে উপকার পেতে হলে এটি মেনে চলতে হবে। এটি একটি শর্ত।

ওপরের উদ্ধৃতিটি কোরআন থেকে নেয়া হয়েছে। গ্রন্থ হিসেবে কোরআনকে মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক বা দিক নির্দেশনা হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে, এ দিক নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে হলে কিছু 'না দেখা' (Unseen) বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এই না দেখা বিষয়গুলিই হচ্ছে শর্ত, যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। শর্তগুলি কৌশলের অংশ। আরোপিত ধর্ম বা দর্শনের অনুসরণ থেকে কাঙ্খিত ফল পেতে হলে এ সকল শর্তে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সেটি কেউ তার মাষ্টারকে অনুসরণের

কারনে অন্ধভাবে রাখতে পারে, আবার কেউ জ্ঞান দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করেও রাখতে পারে। দু'ভাবেই এটি কাজ করবে। নিচে শর্তগুলি নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. **সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস :** দর্শন হিসেবে ধর্মের সফলতা যে সব শর্তের ওপর নির্ভরশীল তার অন্যতম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস। আদিম কাল থেকে মানব মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়ে আসছে। কোথা থেকে এলাম? কে পাঠালো? কেন পাঠালো? কে সে জন, যার গড়া নিখিল ভূবন?

বিজ্ঞান অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি কিভাবে হলো? কে সৃষ্টি করলো? সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই? কি তার রূপ? সৃষ্টির কারন কি? এসব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে আজও জানতে ও জানাতে পারেনি। আছে কিছু ধারণা বা তত্ত্ব। কেউ কেউ অনিশ্চিত এসব তত্ত্বের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাও অন্ধ বিশ্বাসী। এই যে বিজ্ঞানের এত জয় জয়কার এখানে এসে সে অসহায়।

বিজ্ঞান যেদিন সব রহস্যের জাল উদঘাটন করতে সক্ষম হবে, সেদিন মানব মনে হয়তবা আর কোন প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু আদিম কাল থেকে আজ অবধি মানব মনের আকুতি পুরনে কিছু একটা ব্যাবস্থা তো থাকতে হবে।

যেদিন মোবাইল ফোন ছিল না সেদিনও মানুষ যোগাযোগের জন্য সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোন একদিন মোবাইলের আগমন ঘটবে বলে বসে থাকেনি। বিজ্ঞান যেদিন সৃষ্টিকর্তাকে আবিস্কার করে ফেলবে কিংবা সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই তা প্রমাণ করে দিতে সক্ষম হবে, সেদিন হয়তো মনোজগতের এতসব সমস্যা থাকবে না। তবে বর্তমানের জন্যও তো কিছু একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মানুষের বস্তুগত চাহিদার পাশাপাশি মনেরও কিছু চাহিদা আছে। এক পর্যায়ে গিয়ে সে কারও ওপরে ভরসা করতে চায়। কেননা তেমন পর্যায়ে মানুষ নিজেকে একা দেখতে পায়। আশ্রয় খুঁজে। এ সবের পরিনামে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস।

মানুষ যখন উপলব্ধি করতে বা বুঝতে শিখে যে সর্বশেষ পর্যায়ে এমন একজনও নেই যার ওপর ভরসা করা যায়, উপরন্তু সাধারণ মানুষ যার ওপর ভরসা করতে চায় সে নিজেও এক চরম অসহায়, সে নিজেই নিজের জন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে রত, তখন এ জ্ঞানের কারনেই মানুষ অজানা-অদেখা সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে বাধ্য হয়। এগুলি একান্ত ব্যাক্তিক পর্যায়ের ভাবনা। কারও জন্য হয়তো এসব

ভাবনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কারও জন্য আছে। জগত তো কেবল কিছু সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ও আলোকিত বা জ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষের জন্য নয়; সকলের জন্য। বলা যায় অধিক সংখ্যক মানুষের আশ্রয়ের জন্য এমন ভাবনার প্রয়োজন আছে। এ জগতে সকলের জন্যই কোন না কোন ব্যাবস্থা আছে, নয়তো থাকতে হবে। কেননা এগুলি বিধাতা করেন। নিজের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে তাল রেখে মানুষের মধ্যে যে যেমনটি প্রত্যাশা করুক না কেন তিনি সব কিছুর মিশ্রন ঘটান।

আজকের দিনেও কিছু মানুষের অন্তরে কিছু চাহিদা আছে। মানুষ আশ্রয় ও ভরসার স্থল হিসেবে মহাশক্তিধর কোন সৃষ্টিকর্তাকে ভাবতে চায়। বিশেষত যেখানে এসে জ্ঞান আর কোন কাজ করে না সেখানটায়। সমাজ ও মানুষের পরিচালনায়ও সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে। কোন একটি বিষয়কে অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যও সৃষ্টিকর্তার ধারণার প্রয়োজন আছে।

মানব মনের চাহিদা পুরনে সর্বোচচ পর্যায়ে অন্তত ধারণায় হলেও একজন চরম মহাশক্তিধর ও চরম ন্যায়পরায়ন সৃষ্টিকর্তার 'প্রয়োজন' আছে। যিনি থাকবেন সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। এখানে 'প্রয়োজন' শব্দটি ব্যবহার করেছি এজন্য যে, কিছু মানুষ সৃষ্টিকর্তার বিষয়টি মানতে ইচ্ছুক নয়। হয়তো তাদের মানসিক অবস্থাটি ভিন্ন রকম। তবে যুক্তি ও জ্ঞান বলে একজন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ভেবে নেয়া যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। কেননা পরিবেশ বা প্রকৃতি আমাদের সে শিক্ষা দেয়।

শিশুকে যেমনটি নির্দেশনা দেয়া হয় সে তেমনটি পালন করে। কিন্তু সে সন্তানই একদিন বড় হয়ে জ্ঞান অর্জন করে। নানান বিষয়ের আলোচনায় পিতামাতার সঙ্গেও যুক্তিতর্কে অবতীর্ন হয়। এমনকি বিরোধীও হয়। জ্ঞানের আলোচনা ও বিতর্কের এমনও স্তর বা পর্যায় আছে যখন একজন মানুষ অপরজনকে কিংবা অপরের বক্তব্য বা দর্শনকে মেনে নিতে পারে না। এসবের মধ্যে আবার স্বার্থ এবং দলগত রাজনীতিও প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় বিশৃংখল মানব সমাজে শৃংখলা বজায় রাখতে গ্রহণযোগ্য তৃতীয় কারও উপস্থিতি প্রয়োজন।

'হ' যদি ন্যায় কথা বলে তো 'খ' মেনে নেয় না। 'খ' যদি ভাল কাজ করে তো 'হ' সেটিকে গ্রহণ করতে চায় না। ন্যায়ের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী একেক জনের কাছে দর্শনের কারনে যেমন একেক রকম, তেমনি স্বার্থ ও নিজ মর্যাদা সমুন্নত রাখার কারনেও। এমনকি বাস্তবে কর্মক্ষেত্রেও অফিসে-আদালতে মুখোমুখী ক্ষুদ্র দলগুলির

দ্বারা সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করার জন্য কাজের সমন্বয় করতে হয়। সমন্বয়ের প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য কোন একজনের মধ্যস্ততাকে মেনে নিতে হয়। তেমনিভাবে কর্ম ও জ্ঞানের এমনও উচ্চ পর্যায় আছে যখন আর মানুষ নয়, মানুষের কথাটি সকলের বা অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নির্দেশনাগুলিকে সৃষ্টিকর্তার নামে উপস্থাপনাটি উত্তম বা বলা যায় সুবিধাজনক। নির্দেশনার গ্রহণযোগ্যতার জন্যও সৃষ্টিকর্তার ধারণার প্রয়োজন আছে। তবে সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে।

শর্ত হচ্ছে- সৃষ্টিকর্তার ধারণায় কোন প্রকারের অন্যায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ পর্যায়ে অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ ধূর্ততাও অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় এমন দ্বিধা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ন্যায়ের সন্ধানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আলোচনা হতে পারে। তাতেও সমাধা না হলে অধিকাংশের মতটিই আপাত গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া বাঞ্ছনীয়। এটিই গণতন্ত্র। তবে অধিকাংশের মত প্রতিষ্ঠায় সূক্ষ কারচুপিও গ্রহণযোগ্য নয়। আরও একটি পথ খোলা আছে এবং সেটি হলো শক্তির প্রয়োগ। নির্দিষ্ট সমাজ বা মানব সমাজকেই বেছে নিতে হবে যে সে কোন পথ বেছে নিবে। পরিশেষে সৃষ্টিকর্তার ধারণাই কল্যাণকর।

ন্যায়সম্মত কোন দিক নির্দেশনা 'হ' কিংবা 'খ' এর নামে জারী করার চেয়ে- ন্যায়ের পথে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনার সঙ্গে যৌক্তিকভাবে বিষয়সমুহকে উপস্থাপন করতে পারার সক্ষমতা যে কোন বিষয়কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে। তার জন্য অনুসারীদের সৃষ্টিকর্তার ধারণায় বিশ্বাসী হতে হবে।

গ্রহণযোগ্য এক সৃষ্টিকর্তার ধারণা তাই দিক নির্দেশনার সফলতা এবং সমাজে শান্তি আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ও বলা যায় পূর্ব শর্ত। সকল মানুষের কাছে নির্দেশনাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি নমনীয় ধারণা। তবে শর্ত একটিই, এক্ষেত্রে কোনরূপ অন্যায়ের প্রবেশ ঘটতে দেয়া যাবে না। এর ব্যাতিক্রম হলে সৃষ্টিকর্তার ধারণা কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। জগত পতিত হবে মহা সংকটে!

কিছু মানুষ কিছু মানুষের চালক। আবার কিছু মানুষ কিছু মানুষ দ্বারা চালিত। যারা চালিত হয় তেমন ধরনের মানুষের সংখ্যা অধিক। দু'ধরনের মানুষের কাছে

জগত সম্পর্কিত জানার পরিধি বা তথ্যের প্রবাহ সমান নয়। ফলে আচরণও এক রকম নয়। তবে এ পার্থক্য মানুষের ত্রুটি নয়। কেননা পৃথিবীতে সকল রকমের মানুষেরই প্রয়োজন আছে। একেক রকম মানুষের একেক রকমের প্রয়োজনীয়তা। একেক রকমের গুণের কারনে একেক রকমের মানুষ একেক রকমের কাজে পারদর্শী। একজনেরটি দিয়ে অন্যজন তথা জগত উপকৃত হয়।

যারা চালিত হয় এরূপ মানুষের পরিচালনায় সৃষ্টিকর্তার ধারণা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্যথায় সমাজ হতো বিশৃংখল। সৃষ্টিকর্তার ধারণার বিদ্যমানতার কারনে সমাজে আজও শৃংখলা বজায় আছে। শৃংখলা বজায় আছে বিধায় কিছু মানুষ সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে অস্বীকার করার প্রয়াস পায়। সমাজ কথাটি দিয়ে এখানে কেবল আজকের সমাজকেই বোঝানো হয়নি। আদি থেকে যে পথ পাড়ি দিয়ে সমাজ আজকের পর্যায়ে এসেছে তার সবটুকুকে বিবেচনায় নিয়ে কথাটি বলা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার ধারণা এমন এক শর্ত, যাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়া সম্ভব হলে দর্শন প্রদর্শিত পথের পরবর্তী সকল কাজ সহজ হয়ে যায়। বিশ্বাসী আপনা থেকে তার নামে প্রদত্ত কমান্ড বা নির্দেশনা পালন করতে প্রস্তুত থাকে। যে নির্দেশনা বিশ্ব মানবতা, ভ্রাতৃতাববোধ, সদয়তা ও ন্যায় পরায়নতার শিক্ষা দেয়। অন্যায় ও অশ্লীলতাকে বর্জন করতে বলে।

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদয়তা(র) ... নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্টপ্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন। ... ।” (আল-কোরআন ১৬:৯০)

আরোপিত ধর্মে সকল নির্দেশনা সৃষ্টিকর্তার মাধ্যম হয়ে আসে। তাই সর্ব প্রথমেই প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা সৃষ্টি ও অন্যায়করনের মনোবৃত্তির ক্ষেত্রে পরিণাম সম্পর্কে তাঁর বিষয়ে অন্তরে ভয় থাকা।

আরোপিত ধর্মে সৃষ্টিকর্তার বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তিতে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রয়ে গেল।

২. **সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা :** সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতা মেনে নেয়া সত্ত্বেও মানুষ তাঁর নির্দেশনা মেনে চলবে না। যদি মানুষের হাতে ক্ষমতা ও শক্তি থাকে তবে কেন সে বর্তমানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে? ফলে কেবল সৃষ্টিকর্তার ধারণার বিদ্যমানতার

কারনে মানুষ সুপথ প্রাপ্ত হবে না। সেজন্য মানুষের ওপর এমন কৌশল আরোপ করতে হবে যেন সে নিজ থেকে সুপথে চলতে মানসিকভাবে বাধ্য হয়।

মানসিক বাধ্যবাধকতার শক্তি অপরিসীম। এমন ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই নিজেকে কোন বিধান মেনে চলতে বাধ্য করে। অপরকে কারও ওপর বল প্রয়োগ করতে হয় না। বরং মানুষ নিজেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং যার প্রচেষ্টা থাকে সে জয়ী হয়। জয়ী হওয়ার এ মানসিকতা সৃষ্টির জন্য শর্তসমুহে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয়।

আরোপিত ধর্মের শর্তসমুহে বিশ্বাসী না হলে বলা যায় মানুষ যেসব বিষয়ের মুখোমুখী হয়, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়টিকে মানুষের নিজের সহজাত ইচ্ছে বা স্বাভাবিক প্রবনতার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। যেখানে সে কোন প্রকার বাঁধার মুখোমুখী হয় না। ফলে সুযোগ পেলে যে কোন প্রকার মন্দ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তেমন ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টে মনে হবে স্বয়ং বিধাতাই মানুষের কাছে অসহায় হয়ে পরেছে। মানুষের ওপর যেন তাঁর কোন ক্ষমতাই নেই। যেন মানুষের করুনার ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

ধারণায় তাই সৃষ্টিকর্তাকে প্রচন্ড ক্ষমতাবান হতে হবে। সে ক্ষমতা হতে হবে জগতের সকল ক্ষমতাধরের ক্ষমতার উর্ধ্বে। সৃষ্টিকর্তা হবেন সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

যে উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে সেই ক্ষমতাবান। সৃষ্টিকর্তার ধারণায় তাই সৃষ্টিকর্তার পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

“.. আমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত এমন কাউকে আহ্বান করবো যে আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। ...।” (আল-কোরআন ৬:৭১)

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ- যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে; ... এমনই আল্লাহর পথ নির্দেশনা ...।” (আল-কোরআন ৩৯:২৩)

ভাল পথে চললে বা ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ পথে চললে বা মন্দ কাজের জন্য শাস্তি। অতএব সৃষ্টিকর্তার এ দু'টি ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

মানুষকে এর মাধ্যমে বাঁকা পথ পরিহার করে সহজ-সরল ও সোজা পথে চলার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাস্তবে কাজগুলি দক্ষতার সঙ্গে মানুষের নিজেকেই করতে হয়। কিন্তু মানুষের অন্তর কি বলে, মানুষের চরিত্র কেমন, কি তার বৈশিষ্ট ইত্যাদি বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিয়েই মানুষের জন্য এমন পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মানুষ ভাল পথে চলবে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় নয়তো শাস্তির ভয়ে। বস্তুত বাস্তব জীবনেও অফিসে-আদালতে, কাজে-কর্মে, সমাজে-পরিবারে এ কাজগুলিই আমরা করে থাকি মানুষকে সোজা পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এগুলিই সূত্র। যা মানুষের ওপর কার্যকর। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যা সত্য ও সঠিক বা যথাযথ।

কিছু মানুষ পুরস্কার বা শাস্তির কথা ভাবে না। তারা ভাল পথে চলে নিজ জ্ঞানের কারনে। তারা জ্ঞানত সঠিক পথ সম্পর্কে জানে এবং ভূল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। তারা ভাল কাজ করে দায়িত্ব মনে করে বা অন্যকথায় নিজেদেরই স্বার্থে বা কল্যাণের জন্য অর্থাৎ সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে ভাল থাকার জন্য। এরা আলোকিত মানুষ। স্ব-নিয়ন্ত্রিত। এদেরকে পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই সবদিক বিবেচনা করে চলে। তেমন মানুষের সংখ্যা কম। অধিকাংশ মানুষকে চালিয়ে নিতে হয়। তাই এত দিক নির্দেশনা।

সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম বা সর্বময় ক্ষমতায় বিশ্বাস বিশ্বাসীকে সুপথে ধরে রাখার সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্তে যে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাকে ভাল পথে চলতেই হবে। কেবল সে চলবে না যে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী নয়।

৩. **পরকাল ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাস :** সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমতা মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে সক্ষম না হলে সে ক্ষমতার ধারণা কাজ করবে না। যারা সকল নিয়ম ভঙ্গ করে মূলত তারাই জগতে সকল অপকর্মের হোতা। তারা কোন নীতিকথা মানতে চাইবে না। তাদের নিবৃত করার কোন উপায় নেই।

সৃষ্টিকর্তা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। যদি তিনি প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে মানুষের ওপর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তবে মানুষ তার কৃত অসংখ্য ভূলের কারনে সামনে অগ্রসর হতে পারতো না। তাই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের একটি যথাযথ সময় নির্ধারণ করা আছে এবং সেটি পরকাল। এর মাঝের সময়টুকুতে মানুষকে তিনি অবকাশ দিয়েছেন, যেন মানুষ স্বাধীনতাভাবে তার করণীয় করতে পারে। তিনি মানুষের প্রতি সদয়। মানুষ যেন ভূল পথে চলে না যায় সেজন্য তিনি মানুষকে

দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পরকালে তাকে তার প্রতিটি কাজের জন্য বিধাতার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। বাস্তবে যেমন মানুষকে সংসদে তার কর্মের জবাব দিতে হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তেমন।

"যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায় কাজের কারনে হিসেব নিতেন,তবে তিনি ভূ-পৃষ্ঠে জীবন্ত কোন কিছুকেই ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা সেটি না এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে, না পারবে ত্বরান্বিত করতে।" (আল-কোরআন ১৬:৬১)

সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, এ বিষয়টি বিশ্বাসের মধ্যে আনতে হবে। যারা অন্তরে ভয় অনুভব করবে তারা সুপথে চলবে, অন্য কথায় মন্দপথ পরিহার করে চলবে। পরকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই একটি ধারণার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কজনিত আরও অনেকগুলি শর্ত ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পরকালের ধারণার সঙ্গে কর্মের জবাবদিহিতার বিষয়টি জড়িত।

"... তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ এর জন্য তোমাদের হিসেবের মুখোমুখী করবেন। ...।" (আল-কোরআন ২:২৮৪)

সৃষ্টিকর্তা নেই এবং পরবর্তীতে কোন জবাবদিহিতা নেই পৃথিবীতে যদি শুধুমাত্র এমন দর্শন বিস্তার লাভ করতো তবে জগত অন্যরকম হতে পারতো। আজও পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা বেশী। তারা নিজ থেকে ভাল পথে চলে। এর পেছনে সৃষ্টিকর্তার ধারণা এবং ধর্মীয় দর্শনের পরকাল সম্পর্কিত ধারণার একটি বড় প্রভাব রয়েছে।

বিপুল সংখ্যক মানুষ পরবর্তী জীবন বা পরকালে বিশ্বাস করে। কর্মের ফলাফলে বিশ্বাস করে। ফলে নিজ থেকে ভাল হয়ে চলে। তাদের তাড়িয়ে বেড়াতে হয় না।

কিছু মানুষ চিরকালই অপকর্ম করে যাবে। তবে তাদের সে সংখ্যাটিও ধর্মীয় দর্শনের প্রভাবের কারনে অনেকটাই হ্রাসপ্রাপ্ত থাকে। কেননা তাদের মধ্যেও এমন মানসিকতার কিছু মানুষ আছে যারা অপকর্ম করার পরও অনুশোচনায় ভোগে। সৃষ্টিকর্তার কাছে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধারণা ব্যাতিত জীবনের অর্থ হতে পারতো অন্যরকম। কোথা থেকে এলাম, কিভাবে, কেন এলাম জানিনা। জানতে চাইও না। এলাম, দেখলাম, খেলাম, বর্জ ত্যাগ করলাম এতটুকুই জীবন। এমন দর্শনে যথেচ্ছাচার জীবন যাপনে বাস্তবিক অর্থে কোন বাধা নেই। নগদ প্রাপ্তি সব। কেউ যদি তেমনটি না করে তবে সেটি নিতান্তই তার নিজস্ব বদান্যতা। নগদ প্রাপ্তি ছেড়ে দেয়া ও যথেচ্ছাচার জীবন যাপন পরিত্যাগ করা তেমন দর্শনে চরম বোকামি বা নির্বুদ্ধিতা। কেননা এর জন্য কোন ফলাফল প্রাপ্তি বা জবাবদিহিতা নেই। নেই কোন শংকা। নেই কোন প্রত্যাশা। ছলে বলে কৌশলে অর্জনে তেমন ক্ষেত্রে ধারণাগতভাবে কোন ত্রুটি নেই বরং নির্বুদ্ধিতা আছে। এমন ধারনায় বিশ্বাসী মানুষ যে কোন উপায়ে বাস্তব জীবনটাকে কেবল নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে। তারা জানে যে, এরপরে আর কিছু নেই।

পরবর্তী প্রত্যাশাবিহীন জীবন অর্থহীন, বর্ণহীন, অসাড়। এমন দর্শনে জীবনের সফলতা বলে কোন কিছু কোন অর্থ বহন করে না। এক জীবনেই সব শেষ। পরবর্তী প্রত্যাশা ও আকর্ষনবিহীন কেবল ক্ষণকালের জীবন ধারণায়ও নিরানন্দময়।

অপরদিকে পরকালের ধারণা মানবের জীবন দর্শনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টিকারী। এই একটি বিষয় নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে আনা সম্ভব হলে জগতে আরও বেশী অপকর্ম হ্রাস পাবে।

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পরকালের ধারণা মেনে নেয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই একটি ধারণার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কজনিত আরও অনেকগুলি শর্ত ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় জড়িত। পরকালের ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক আছে মানবের কর্মের হিসেব সংরক্ষন, বিচার-ব্যবস্থা, পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্তি, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি নানান ধারণার।

“যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। যদিও তাদের প্রতি আমি দয়া প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করি, তথাপি তারা তাদের অবাধ্যতায় নিজেদের গন্ডির মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে।” (আল-কোরআন ২৩:৭৪-৭৫)

৪. **কর্মের হিসেব সংরক্ষন ও বিচার দিবসে বিশ্বাস :** মানুষকে তার ভাল ও মন্দ কর্মের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। এটি ঘটবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। অর্থাৎ পরকালে।

পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যখন আসবে তখন বিচার ও কর্মের হিসেব সংরক্ষনের বিষয়টি আসবে। কেননা বিচারকার্যবিহীন পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রাপ্তি হতে পারে না। আবার কৃতকর্মবিহীন বিচার কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। ফলে কৃতকর্ম সংরক্ষিত হতে হবে। অতএব বিশ্বাস করতে হবে মানুষের সকল কর্মের হিসেব সংরক্ষিত আছে। বিচার দিবসে মানুষকে তার সংরক্ষিত কৃতকর্ম প্রদর্শন করা হবে।

"সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে মুখোমুখী পাবে যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে; ... জেনে রেখ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। ...।" (আল-কোরআন ৩:৩০)

"... তারা পূর্বে যা প্রেরণ করে এবং পশ্চাতে যা ফেলে আসে প্রতিটি বিষয় আমি সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করে রাখি।" (আল-কোরআন ৩৬:১২)

কর্মের ভিত্তিতে বিচার সম্পন্ন হবে। কর্ম অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ফলে কর্মের হিসেব সংরক্ষন, একটি ন্যায়-সম্মত বিচার ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাস রাখতে হবে। প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কেবল মুখের স্বীকৃতি নয় সত্যিকারভাবে অন্তরে সে বিষয়ে বিশ্বাস আনতে হবে। তবেই দর্শনের দিক নির্দেশনা মানব ও সমাজ জীবনে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে ও কাজ করবে। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত।

৫. **পুরস্কার ও শাস্তি বা কর্মফলে বিশ্বাস :** ভাল পথে চলা বা ভাল কাজের জন্য রয়েছে পুরস্কার এবং মন্দ পথে চলা বা মন্দ কাজের জন্য আছে শাস্তি। উভয় নির্দেশনার মাধ্যমেই দর্শন মানুষকে ভাল পথে চলতে উৎসাহিত করলো। এসব শর্তগুলিতে অন্তর সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করলে মানুষ দর্শন প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য।

বিশ্বাস সেই রাখে যে মর্ম কথা বোঝে। এটি হয় জ্ঞানের কারনে। জ্ঞান অংক কষে ভবিষ্যতকে সামনে নিয়ে আসে। মানুষ তার কর্মের নিশ্চিত পরিণামকে

দেখতে পায়। তাই নির্দেশনা মেনে চলে। এতদ্বসত্বেও মানুষ খুব বেশী যুক্তি ও সন্দেহপ্রবন প্রাণী।

"... কিন্তু মানুষ সবকিছুর চেয়েই অধিক বিতর্কপ্রিয়/যুক্তিবাদী।" (আল-কোরআন ১৮:৫৪)

বাস্তবে বা দৈনন্দিন জীবনে কাজে-কর্মে, অফিসে-আদালতে এই যে এত ব্যাস্ততা, প্রসাশনিক কর্মকান্ড- মূলত মানুষ এ দু'টি কাজই করে। ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যাবস্থা করা, নয়তো মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলী। মানুষ এ চক্রে আবদ্ধ। মানুষের পরিচালনায় এগুলি বাস্তব সত্য।

কিছু মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে ভয়ের সংস্কৃতিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখাবার চেষ্টা করে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু মানুষের বাড়াবাড়ি আছে এটিও সত্য। যার জন্য প্রযোজ্য নয় সে অবশ্য বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে দেখতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষের জন্য এটি প্রয়োজন আছে। প্রাণী জগতে কেবল পশু-পাখিকে বিবেচনায় নিলেও দেখা যায় যে, দুটি প্রতিপক্ষ যখন আক্রমনাত্মক হয়ে মুখোমুখী অবস্থান নেয় তখন সংঘর্ষের পূর্ব মুহুর্তে একে অন্যকে নানান কায়দায় ভয় ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভয় প্রদর্শনে ত্রুটি নেই। ভয় প্রদর্শনে যদি কাজ হয় তবে অনর্থক ব্যবস্থা নেয়ার বা সংঘর্ষে জড়াবার প্রয়োজন কি? শাস্তি প্রদান তো মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য ভাল পথে চালনা করা।

"তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি আসে যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর? ...।" (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

মননে যিনি উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন তার কাছে শাস্তি কিংবা ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি ভাল প্রতীয়মান নাও হতে পারে। জগতের সকল মানুষ যেদিন তেমন মানসিকতায় পৌঁছাবে সেদিন তো নরক ব্যবস্থাই থাকবে না! আলোকিত মানুষেরা তো সকলের জন্য সেটিই প্রত্যাশা করে, কিন্তু বর্তমানকেও তো অবহেলা করা যাবে না।

দিক নির্দেশনাকে সফল দেখতে হলে পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে বিশ্বাস আনতে হবে। শাস্তি কেবল শাস্তি নয়। পরিশোধনও বটে। শাস্তির ভীতি শান্তিরও রক্ষক।

বস্তুত এসব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সন্তর্পনে মানুষের সহজাত ধর্মের দুটি বৈশিষ্টকে কৌশলে কাজে লাগানো হয়েছে। একটি তার লোভ। দ্বিতীয়টি তার শংকা বা ভয়। পুরস্কারের লোভে সে ভাল কাজ করবে। কিংবা শাস্তির আশংকা বা ভয়ে সে ভাল পথে চলতে বাধ্য হবে। অবুঝ মানুষ ভাল পথে চলে দুটি কারনে। এক তার সহজাত ধর্মের একটি বৈশিষ্ট ভয়ের কারনে এবং দুই তার সহজাত ধর্মের অপর বৈশিষ্ট লোভের কারনে। বাস্তবে অফিসে-আদালতে এই যে এত প্রশাসনিক বা বিচারিক কার্যক্রম তা এই ভয় ও লোভকে কাজে লাগিয়েই পরিচালনা করা হয়।

কিছু মানুষ সত্যের জ্ঞানের কারনে ভয় কিংবা লোভ ব্যাতিতই ভাল থাকে। তারা জ্ঞানের কারনেই ভাল কাজের নিশ্চিত ফলাফল সম্পর্কে জানে এবং জানে মন্দ কর্মের অবধারিত পরিণাম সম্পর্কে। তারা না ভয়কে নিয়ে ভাবে না পুরস্কারের লোভকে নিয়ে। তারা সঠিক করণীয়টিকে সঠিকভাবেই বোঝে এবং সেভাবে চলে। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য ও সঠিক পথ। এটিই সোজা পথ। এ পথ আলোকিত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যারা বিষয়গুলিকে জ্ঞানত এভাবে বুঝতে সক্ষম তারাই সত্যিকারের সুপথপ্রাপ্ত। সঠিক জ্ঞান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আশির্বাদ। কিন্তু সব মানুষ এ পর্যায়ের নয় সে বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

“তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধিবোধসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউই তা স্মরণ করে না।” (আল-কোরআন ২:২৬৯)

অধিকাংশ মানুষ সৃষ্টিকর্তায় তথা তাঁর নির্দেশনায় বিশ্বাসী হয়ে মন্দ কাজ থেকে নিবৃত হয়ে ভাল পথে চলে। স্বর্গীয় জীবনের আকর্ষন এবং নরকের ভয় মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার পেছনে ভূমিকা রাখে। যাদেরকে দেখে মনে হয় তারা লাভ-ক্ষতির হিসেব করে না, লোভ তাদেরকেও বিচলিত করে! সরল পথে চলতে ও চালাতে এ শর্ত দুটিতে বিশ্বাস স্থাপন তাই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় সমাজে মানুষের নৈতিকতা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সমাজ বিশৃংখল ও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে।

৬. **স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস :** স্বর্গ ও নরকের ধারণা দু'রকমের দু'টি পৃথক জীবন ব্যাবস্থা। পুরস্কার হিসেবে মানুষ অর্জন করবে স্বর্গীয় জীবন ব্যাবস্থা। শাস্তিস্বরূপ

তাকে পেতে হবে নারকীয় জীবন। অতএব শাস্তি ও পুরস্কারের ধারণাকে বাস্তব রূপদানকারীরূপে স্বর্গ ও নরকের ধারণায় বিশ্বাস রাখতে হবে। আরোপিত ধর্মের প্রতিটি ধারণা যৌক্তিকভাবে একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

৭. **ফেরেশতা বা দেবতাগনে বিশ্বাস :** সৃষ্টিকর্তার ব্যবস্থাপনার অধীন বিবিধ কাজে নিয়োজিত রয়েছে ফেরেশতা বা দেবতাগন। মানবের কর্মের তথ্য সংগ্রহ, হিসেবরক্ষন বিবিধ ব্যবস্থাপনীয় কাজ তারা সম্পাদন করে। জাগতিক ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য-অগনিত ফেরেশতা প্রস্তুত রয়েছে মহান আল্লাহর কেবল একটি নির্দেশনার অপেক্ষায়। অতএব ফেরেশতাদের বিদ্যমানতার ধারণায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদের নিয়োজিত করেছেন বার্তাবাহকরূপে- দুই, তিন ও চার পাখাবিশিষ্ট। ...।" (আল-কোরআন ৩৫:১)

"শপথ তাদের (ফেরেশতাগণের), যারা মর্যাদাক্রমে সুশৃংখল/সারিবদ্ধভাবে (নিজেদের) বিন্যাস করে রাখে, যারা মন্দের বিতাড়নকারী/প্রতিহতকারী এবং যারা সতর্ক বাণী উচ্চারণকারী ... (ফেরেশতারা বলে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত স্থান/অবস্থান এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান (প্রস্তুত) থাকি (কার্য নির্বাহের জন্য) এবং আমরাই আল্লাহর মহাত্ব/পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (আল-কোরআন ৩৭:১-৩, ১৬৪-১৬৬)

৮. **প্রেরীত বার্তায় বিশ্বাস :** যা কিছু বলা হলো, 'সব আমার পক্ষ থেকে বলা হলো।' এমন উক্তি কোন বার্তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'হ' 'খ' প্রদত্ত বার্তা মেনে নিতে পারে না, আবার 'খ' 'হ' প্রদত্ত বার্তা গ্রহণ করতে পারে না।

মানুষ যখন একে অন্যকে গ্রহণ করে না বা গ্রহণ করতে পারে না তখন তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থার সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থান করে বিধাতা। খন্ডিত সমাজে মানুষ যদিও নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকে, তথাপি সেখানে থাকে বিরোধী পক্ষ। বৈশ্বিক বা ব্রহ্মান্ডের বিবেচনায় কোন বার্তাকে মানবের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষ নিজে কৃতিত্ব না নিয়ে সেটি সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পন করার কৌশলটি ভাল ভূমিকা রাখতে পারে।

দিক নির্দেশনাজনিত বার্তার আগমনের বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাতে বিশ্বাস রাখা শ্রেয়, যখন সেটি ন্যায়সঙ্গত হয়। যদিও বিষয়টি সত্য, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত বার্তা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত, কিন্তু মানুষের মধ্যে সকলেই সৃষ্টিকর্তার ধারণাটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে না বা করতে পারে না। ফলে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়।

“তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ পরিমাপে পরিমাপিত/অনুধাবন করতে পারেনি। ...” (আল-কোরআন ২২:৭৪)

কোন চিন্তা বা ধারণাই বস্তুত মানবের নিজের না। যে সিস্টেমের মধ্যে তার বসবাস, তা তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এমনকি পৃথিবীতে তার নিজের উপস্থিতিটাও তার নিজের নিয়ন্ত্রনে নয়। সেটি নিয়ন্ত্রন করে অজানা তৃতীয় কেউ, যাকে আমরা বিধাতা বলি। কারও মতে প্রকৃতি। তিনি যেভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করেন কিংবা প্রকৃতি যেভাবে তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবজীবন কাজ করে। মানবের কাজ তার নিজের নয়।

“... তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে? ...” (আল-কোরআন ১০:৩১)

“নিশ্চয়ই আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সে কি মনে করে তার ওপরে কারও কোন ক্ষমতা/প্রভাব নেই?” (আল-কোরআন ৯০:৪-৫)

“বস্তুগত প্রকৃতির তিনটি অবস্থা রয়েছে। সুখী ও পীড়াদায়ক অবস্থা এবং অজ্ঞতা। জীবিত সত্তা যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সে এ অবস্থাগুলির সাথে যুক্ত হয়ে যায়।” (গীতা ১৪:৫) “এভাবে জীবিত সত্তা বস্তুগত প্রকৃতির তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনের চলার পথটি উপভোগ করে। এটি ঘটে বস্তুগত প্রকৃতির সাথে তার যোগসূত্রের কারনে।” (গীতা ১৩:২২) “অবুঝ আত্মা বস্তুগত প্রকৃতির তিনটি অবস্থার প্রভাবের মধ্যে বিরাজ করে নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বলে মনে করে, যা প্রকৃতপক্ষে সংঘঠিত হয় প্রকৃতির কারনে।” (গীতা ৩:২৭)

একটা অদৃশ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সকল কাজ সংঘটিত/সম্পন্ন হয়। মানবের ক্রিয়া বস্তুত সমর্পন নয়তো প্রতিক্রিয়া। আগত বার্তাও সে সূত্রমতে নিজ নিয়ন্ত্রনের

বাইরে কারও পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। এটিই যৌক্তিক। মস্তিস্ক ধারণা সৃষ্টি করে না। গ্রহণ করে এবং প্রক্রিয়া করে, অতঃপর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। তবে যিনি এত বিশাল কর্মযজ্ঞের স্রষ্টা, তিনি চাইলে ধারণা সৃষ্টির কাজটিও নিশ্চয়ই মস্তিস্ক করতে পারে। অর্থাৎ তিনি সব করতে পারেন। এ বিশ্বাস স্থাপনও একটি শর্ত।

সৃষ্টিকর্তার নামে প্রদত্ত কোন নির্দেশনা বা বার্তা সমাজে বার্তাটির গ্রাহ্যযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে কঠিন শর্ত আছে। উচ্চারিত বাক্য/নির্দেশনা হতে হবে সত্য ও ন্যায়সম্মত। এ পর্যায়ে একটি সূক্ষ ন্যায়বিচ্যূতিও গ্রহণযোগ্য নয়। আরোপিত দর্শন সে কথাও বলে। কিন্তু যারা সৃষ্টিকর্তার নামে অসৎ কর্ম করে বা করেছে, তারাই এ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের জন্য দায়ী।

"... তিনি তাদেরকে (আল্লাহর নামে) প্রতিষ্ঠিত এসব (মিথ্যে/ভূল) নিয়মের যথাযথ প্রতিফল দেবেন। ..." (আল-কোরআন ৬:১৩৯)

ধর্মীয় বার্তা যদি সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ায় দ্বিধা কোথায়? কোন বিষয়ে সন্দেহ বা বিতর্ক দেখা দিলে তা সমাধানে আলোচনা হতে পারে।

সত্য ও ন্যায়ের বার্তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত। বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি যৌক্তিক এবং শর্ত হিসেবেও তাৎপর্য্যপূর্ণ। অন্যথায় একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষ একে-অন্যের প্রদত্ত কোন বার্তা বা নির্দেশনাকে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে গ্রহণ করার মাধ্যমে পালন করতে চাইবে না। নিদেনপক্ষে অহমবোধও এক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে।

৯. **বার্তাবাহকে বিশ্বাস :** যার মাধ্যম হয়ে যুগান্তকারী কোন বার্তা মানুষের কাছে এসে পৌঁছে, তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রেরীত বার্তাবাহক তাতে বিশ্বাস রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করা বার্তাবাহকের মর্যাদা ও তাঁর মাধ্যম হয়ে প্রদত্ত বার্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

কারও মাধ্যম হয়ে উপস্থাপিত বার্তা তাঁকে আরও সাধারণ দশজন মানুষ থেকে পৃথক করে। কেননা তিনি মনোনীত। বিধাতা যাকে মনোনীত করেন তিনি সেটি জেনে বুঝেই করেন।

"অবিশ্বাসীরা বলেঃ এই কোরআন কেন দুই জনপদের কোন ক্ষমতাশালী/ প্রভাবশালী/ প্রতিপত্তিশালী ব্যাক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না? তারা কি তোমার পালনকর্তার দয়া বন্টন করে? ...।" (আল-কোরআন ৪৩:৩১-৩২) "... আল্লাহ ভালভাবে জানেন কার কাছে তাঁর বার্তা প্রেরণ করতে হবে ...।" (আল-কোরআন ৬:১২৪)

যিনি মনোনীত তিনি সত্য বলেন। তার পক্ষে ভূল বা অসত্য বলা সম্ভব নয়। তাহলে তিনি মনোনীত হতেন না। তিনি যা বলেন সেটি তার নিজের নয়। মনোনীতগন প্রথমেই সেটি স্বীকার করে নেন। এর মাধ্যমে প্রথমেই নিজের অহমবোধকে নিঃশেষ করে দেয়া হয়। নিজের কোন কৃতিত্ব দাবী করার মনবৃত্তি প্রদর্শন করা থেকে তাঁরা বিরত হন। প্রাপ্ত জ্ঞান বা বার্তার প্রচার ও প্রসারের ইচ্ছে, আন্তরীকতা ও নিয়তের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার তাগদটিই এতে অধিক প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ব্যাক্তি নয়, কর্ম ও মূল বক্তব্যটিই এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সত্যের বার্তার গ্রহণযোগ্যতা এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

যার মাধ্যমে একটি বার্তা উপস্থাপিত হয়, যদি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা না যায় বা তাঁকে অন্তর থেকে গ্রহণ করা না হয়, তবে তার প্রচারিত বার্তা বা দর্শনও গ্রহণ করা যায় না। অতএব তাঁকে ভালবাসতে হবে সর্বপ্রথম। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীর ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁকে মর্যাদা দিতে হবে। তবেই তার মাধ্যমে প্রাপ্ত বার্তায় বিশ্বাস আনা সম্ভব হবে। এটিও কৌশলের অন্তর্গত একটি বিষয় এবং অবশ্যই যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত।

সমাজকে আজ এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে জীবনে যারা ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছে, তাদের অবদানকে অস্বীকার করা সমীচীন নয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজে এর ইতিবাচক ও নেতীবাচক প্রভাব রয়েছে। তেমন মহামানবদেরকে সন্মান প্রদর্শন করতে অপারগ হলে সমাজে এটি শ্রদ্ধাভাজন ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা মানুষদেরকে অসন্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। ন্যায় বার্তাকে অমান্য করার ভয়াবহ প্রবনতা তৈরী করবে। জগত সংসারকে যা অশান্ত করে তুলতে ভূমিকা রাখবে। বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন ও যথাযথ সন্মান প্রদর্শন তাই গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত।

সৃষ্টি হচ্ছে এক মহাবিজ্ঞানময় কর্মকান্ড। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে রেডিও ও কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে কম্পিউটার পর্যন্ত সব কিছুর সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের ফল। এসবের প্রতিটি বিষয় পরিচালনায় আছে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিচালন পদ্ধতি। যারা এগুলি সৃষ্টি করেছেন তারা তার পরিচালন পদ্ধতিটি জানেন। পরবর্তী ব্যাবহারকারীদের পরিচালনার দিক নির্দেশনা তারাই প্রদান করেন।

এ বিশ্বব্রহ্মান্ড ও মানুষ এক মহাসত্যের কর্মকান্ডের ফল। তাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে আছে বৈজ্ঞানিক পন্থা ও কলা কৌশল। সৃষ্টি যার তিনি তা পরিচালনার পথ জানেন এবং জানিয়ে দেন ও বুঝতে সহায়তা করেন। যিনি এত প্রকান্ড সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন তার জানিয়ে দেবার প্রক্রিয়াটিও উচ্চতর, উন্নততর ও ভিন্নতর এবং এতই নিখুঁত ও সূক্ষ যে গভীর মনোনিবেশ ব্যাতিত সাধারণ চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ সেটি বুঝে উঠতে বা উপলব্ধিও করতে পারে না। বলা যায় এটিও একটি কর্মের ফল। ঔদাসিন্যের ফল। মূল কর্ম বা গন্তব্য ভূলে গিয়ে মাঝপথে কোন ষ্টেশনে যারা তর্কে জড়িয়ে যায় এবং যথাসময়ে বাহন ধরতে পারে না বিষয়টি তেমন। উদাসীন ব্যাক্তি মূল গন্তব্য ভূলে যায়, তাই তারা অনেক কিছুই দেখতে পায় না। এদের দৃষ্টির সম্মুখে পর্দা দিয়ে তিনি নিজেকে আড়াল করে রাখেন। এ দৃষ্টি কেবল চোখের দৃষ্টি নয়। কে তাকে সত্যিকারভাবে স্মরণ রাখে তিনি তা দেখেন।

ওপরে যেসব শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করা হলো এগুলো শেষ কথা নয়। আরও শর্ত আছে। শর্তের পেছনেও শর্ত আছে। তবে এত বিস্তারিত আলোচনা আপাতত প্রয়োজনীয় নয়। এ লেখার গন্তব্যে পৌঁছুবার জন্য মৌলিক কতগুলি বিষয় সম্পর্কে কেবল কিছুটা ধারণা থাকাই যথেষ্ট।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে মানুষকে কি এবং কিভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেটি। সঠিক শিক্ষায় গড়ে ওঠা মানুষ জ্ঞানের কারনে আপনা থেকে মন্দ পরিহার করে চলে। তাকে ভাল পথে চালাতে বাড়তি কৌশল কিংবা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আপনা থেকে তেমন আলোকিত মানুষের সংখ্যা নগন্য। অথচ সকলের জন্যই কোন না কোন ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন। জগতে অধিক সংখ্যক মানুষকে পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে মানুষের সফল পরিচালনার জন্য শর্তসমুহ অন্তরে মেনে নেয়া সম্ভব হলে, মন্দ পথ পরিহার করে চলা সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে পথ নির্দেশনা অনুসরণের কারনে।

সত্যের সন্ধান, মানব আচরণ ও কৌশল

কৌশল প্রসংগে আলোচনাকালে সত্যের সন্ধানে মানবের আচরণ নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে করি। পৃথিবীতে আরোপিত ধর্ম অনেক। সৃষ্টিকর্তার ধারণা একেক ধর্মে একেকভাবে উপস্থাপিত। প্রত্যেকে তার নিজের লালনকৃত বিশ্বাসটিকে সঠিক বলে মনে করে।

বস্তুত মানবের জন্য ধর্ম একটিই। কিন্তু সেটি কি সে নির্দেশনাটি সহজভাবে সকলের কাছে বোধ্যগম্য নয়। ফলে ধর্ম হয়েছে বিভাজিত।

"নিশ্চয়ই! তোমাদের এই ধর্ম এক ধর্ম (এক পথ) ... কিন্তু তারা (মানুষ) তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।" (আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৩)

একই মানবধর্মের বিভক্ত অনুসারিদের একে অন্যের ধারণাটিকে নিয়ে কটাক্ষ করতেও দেখা যায়। সত্য সন্ধানের এ আলোচনায় তাই মানুষের আচরণ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। এটিও সামগ্রীক করণীয় বিবেচনায় কৌশলের অন্তর্গত একটি বিষয় হতে পারে।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত যে সব বিশ্বাস বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত আছে সেগুলি প্রত্যেক সমাজে আদিম কাল থেকে চলে আসছে। কিছু মানুষ আধুনিক কালেও তা ধারণ করে চলেছে। কেননা নিজ নিজ সমাজ মানুষকে তাদের মত করে ধারণা বা বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে আবার সামাজিক-মানসিক চাপে সমাজের মত করে সেসব ধারণাকে ধারণ করার চেষ্টা করে। সমাজে বসবাস করে সমাজের বিপক্ষে যাওয়ার খুব একটা উপায় নেই। তবে একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষ আজও ধর্মীয় কাজগুলি ভক্তি ও সত্যিকার বিশ্বাস নিয়েই পালন করে। কিছু সংখ্যক মানুষ পালন করে এসব থেকে পার্থিব কিছু সুবিধা নেয়ার জন্য। এ দলটি সব কিছু থেকেই সুবিধা নিংড়ে নিতে তৎপর। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ বিষয়গুলি পালন করে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে কোন সমাজে প্রথম যেদিন একটি বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল, সেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকের মত অগ্রসর ছিল না। উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু হওয়া প্রবাহিত ধারণা আজও বয়ে চলেছে। পুরোনো প্রবাহ শুকোতে বা বন্ধ হতে বা নতুন

গতিপথ সৃষ্টি করতে প্রকৃতি কিছুদিন সময় নেয়। সে জানে কখন কেন তাকে নিঃশেষ হতে হবে। কিংবা নতুন কোন রূপে আবির্ভূত হতে হবে।

শক্তি প্রয়োগ করে কোন পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা বুদ্ধিসম্মত নয়। তেমন ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে ভয়ংকর কিংবা নৃশংস। প্রকৃতিকে বুঝে চলাই স্রষ্টার কাছে সমর্পন। সেটিই সঠিক ও সত্যের পথ যা বিজ্ঞানসম্মত। স্রষ্টার কাছে সমর্পন ভিন্ন কেউই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেটি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধ আচরণ। যা অগ্রহণযোগ্য। পরিনামে হতে হয় প্রকৃতির রূদ্র রোষের স্বীকার। বিশেষত যখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বা সীমালংঘন করে। মানুষকে তাই সত্যের সন্ধানে বা পথ খুঁজে নেয়ার প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষন ও অনুধাবন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণায় নিজেদের বিশ্বাসটিকে সকলেই সঠিক ভাবতে চেষ্টা করে। অন্যের ধারণাটিকে কখনও কখনও হাস্যস্পদরূপে উপস্থাপন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অন্যের ধারণাকে হাস্মস্পদে পরিনত করা কিংবা মন্দ মন্তব্য করার মত আচরণগুলি হচেছ মূলত জেতার লড়াইয়ের মত। ভূল হলেও আমাকেই জিততে হবে- অনেকটা এ রকম। যে আচরণটি সাধারণত শিশুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কি সত্যের দেখা মিলবে?

“যারা আল্লাহর পাশে অন্যদের আরাধনা করে তোমরা তাদেরকে উপহাস কর না, কেননা তাহলে তারাও ভূল করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে নিয়ে উপহাস করবে। ...।” (আল-কোরআন ৬:১০৮)

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সত্য বক্তব্য কি বিজ্ঞানও নিশ্চিতভাবে তুলে ধরতে পেরেছে? যুগে যুগে মানুষ কেবল চেষ্টা করে গিয়েছে। চেষ্টা করেছে সমসাময়িক সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রসরমানতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কেননা বিধাতা মানবের কাছে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশমান নয়। তিনি ধীরে তাকে বুঝতে সহায়তা করেন। বিধাতা সম্পর্কিত আদিম অনেক ধারণা আজ মানবের অন্তর গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না। অথচ একদিন সে সব কর্মকান্ডই ছিল মহাকর্মযজ্ঞ। সেখানেও কেউ সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তির মুখোমুখী হয়েছে। অথচ দায়িত্বজনিত পুরো কর্মকান্ডটিই ছিল ভূল! আজ কি মানুষ বট গাছকে সৃষ্টিকর্তা ভেবে উপাসনা করতে চাইবে? কিংবা সূর্যকে বা গরুকে? অথচ একদিন ইব্রাহীম (আঃ) এর মত মানুষও

বৃহৎ আকারের চন্দ্রকে উদিত হতে দেখে তাকেও গড ভেবে ভূল করেছিলেন। সূর্য্যকে আরও বড় দেখে চন্দ্র থেকে সূর্য্যতে অন্তরকে স্থানান্তর করেতে চেয়েছিলেন। ধীরে ধীরে নিরাকারে উপনীত হয়েছেন।

"যখন অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে (ইব্রাহীম) একটি তারা দেখতে পেল। সে বললো, এটিই আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, আমি ভালবাসি না সেই বস্তু যা অস্তমিত হয়। অতঃপর যখন চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলো সে উচ্ছসিত হয়ে বললো, এটিই আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো সে বললো, যদি না আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, তবে নিশ্চিতভাবেই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব এবং যখন সে সূর্য্যকে উদিত হতে দেখলো বললো, এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর! কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয় তাঁর সঙ্গে অংশীদারি আরোপ কর আমি সেসব থেকে মুক্ত।" (আল-কোরআন ৬:৭৬-৭৮)

নিরাকারে অনেক সুবিধা। কেননা এটি সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নমনীয় ধারণা। এটি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভূল কোন ধারণা বা আকার প্রদান করে না, অথচ সব আকার ধারনে সক্ষম। এ সবকিছু একদিনে ঘটেনি। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিষয়টি সত্যিই হয়তবা আমাদের জ্ঞানের পরিধীর বাইরে। তাই তাকে আমরা আজও জানিনা। তাকে নিয়ে নানান জন নানানভাবে ভাবি। তাতে দোষের কি? তাঁকে ভালবাসি, তাঁকে পেতে চাই বলেই তো তাঁকে নিয়ে এত ভাবনা ভাবি!

প্রত্যেকে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সীমায় অবস্থান করে সব কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করে। নয়তো পৃথিবীর প্রতিটি ব্যাক্তি হতো এক একজন আইনষ্টাইন। পৃথিবীতে সবাই হতো নির্দেশনা প্রদানকারী, কোন অনুসরণকারী থাকতো না। স্বয়ং আইনষ্টাইনও কি সকল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন?

অন্যের ধারণাকে কটাক্ষ কিংবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কি সৃষ্টিকর্তাকে জানা সম্ভব? যিনি অপরের ধারণাকে সহ্য করতে পারেন না, তিনি নিজেও তো কোন সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা উপস্থাপন করতে অক্ষম। কথাটি সঠিক নয়। উপস্থাপন করতে সক্ষম। কিন্তু সেটিতো সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে না।

একটি ভাল ও সত্য কথাও মন্দ বা কটাক্ষপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হলে মানুষ সেটিও গ্রহণ করতে চাইবে না। উপরন্তু ভিন্ন রকম কিছু উপস্থাপন করে বিতর্কে জড়িয়ে আলোচনার মূল স্থান থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে।

যারা বার্তা প্রচার করেছেন, তাদের আচরণ যদি তেমন মন্দ হতো তবে কি আজ তাদের এত অনুসারি দেখা যেতো? যারা পথ প্রদর্শন করে গেছেন তাদের আচরণটি কি ছিল, তারা কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন, অথচ আজ আমরা যারা সে কাজগুলি করি তারা কি করি, কিভাবে করি এবং কি মানসিকতা নিয়ে করি বিষয়গুলি নিয়ে ভাববার আছে। তারা অনেক কষ্ট সহ্য ও ধৈর্য্যধারণ করে লব্ধ জ্ঞানের বাণী প্রচার করেছেন। আজ উপাসনালয়ে স্বর্নখচিত মিনার কিংবা দরজা শোভা পায়, অথচ পৃথিবীর নানান প্রান্তে মানুষ অনাহারেও মানবেতর জীবন যাপন করে! অন্যায়!! সে কারনেও মানব সমাজে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পায় না। ফলে চেষ্টাগুলি চেষ্টার ভানে পরিনত হয়েছে।

কোন বিষয়ে সত্য ও সঠিক উত্তরটিকে খুঁজে পেতে হলে মানুষের আচরণটিকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে হবে। সকলের দর্শনকে জানার ও বোঝার মানসিকতা থাকতে হবে। জেতার জন্য নয়। সত্যকে খুঁজে পাবার প্রত্যাশায় সেটি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অন্যের ভালটিকে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। নিজের ভালর মধ্যে যে সব মন্দ প্রবেশ করেছে সেগুলিকে প্রয়োজনে বর্জন করার মানসিকতাও গড়ে তুলতে হবে। আচরণ ও মানসিকতায় এ পরিবর্তনগুলো আনতে হবে সত্যকে জানার সত্যিকারের আগ্রহের কারনে।

ভূলে ভাসতে চাই না। নিজ দর্শনে কুসংস্কার ও ভূলের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলে তাকে জেতাতে চাই না। সত্যকে চাই। আর সে কারনে যদি কোন ভূলকে আঁকড়ে ধরে থাকি তবে তাকে ছেড়ে দিতে দ্বিধা নেই। নতুন কোথাও সত্যের সন্ধান পেলে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। কেননা আমরা তো কেবল তাঁকেই পেতে চাই। যাকে আজও কেউ জানে না। যিনি সত্য। সত্যের নামে কল্পিত কোন কিছুকে নয়। আচরণটিকে যদি তেমন মানসিকতায় গড়ে তোলা সম্ভব না হয়, তবে সত্যকে জানার ও ধরে রাখার বাসনা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিয়েজিত হলে বরং জগৎ উপকৃত হবে।

স্রষ্টাকে জানতে, বুঝতে ও পেতে হলে অনুসন্ধানি মন নিয়ে এগুতে হবে। যতটুকু জানা, বোঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভব হলো তা সকলকে জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেন পরের জন আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এভাবে সামগ্রীক মানব মঙ্গলের জন্য নিজেদের অবদানগুলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে। যেন বিদ্বেষ প্রকাশ না পায়। অন্তত এটি অনুধাবন করা সম্ভব যে, এ বিষয়টি এক জীবনে সমাধানের নয়।

ধর্ম নিয়ে আলোচনায় আজকাল আস্তিক-নাস্তিক উভয় দিক থেকেই সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে যথাযথ মানসিকতার পরিবর্তে বিদ্বেষপ্রসূত আলোচনা কিংবা লেখালেখি বেশী হতে দেখা যায়। সে কারনে আলোচনাটি এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

সৃষ্টিকর্তা

পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম যে, সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রয়ে গেল। এখানে তাই সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা সংযোজন করতে চাই।

আরোপিত ধর্মের যে সব শর্তাদিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ধারণা। সম্পূর্ন লেখাটির পেছনেও সৃষ্টিকর্তা একটি বড় ভূমিকা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। ফলে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে একটু বিষদ আলোচনা গুরুত্বের দাবী রাখে।

ভগবান, আল্লাহ, গড কিংবা ইয়াহইয়ে সৃষ্টিকর্তার বিবিধ নামের সূক্ষ ও জটিল বৈশিষ্টের পার্থক্য পরিহার করে যদি সরলভাবে কেবল সৃষ্টিকর্তা বলি- যিনি একাধারে সকল কিছু সৃজন করেছেন, লালন পালন করে চলেছেন, যিনি ধ্বংস সাধনের ক্ষমতা রাখেন এক কথায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী- তবে কে সেই সৃষ্টিকর্তা? কি তার রূপ? কেউ কি তাঁকে চেনে, জানে বা দেখেছে? তাঁকে নিয়ে কতই না বিভাজন! বিভাজন মন্দ নয় যদি অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। যেমন গাছ তার ডাল-পালা ছড়িয়ে দিয়ে ছাঁয়া বিতরণ করে। কিন্তু যদি অযথা বিদ্বেষ বা হানাহানির কারন হয় কিংবা ব্যাক্তিগত বা দলীয় অনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হয় তবে হতে পারে তা মুর্খতা নয়তো অতিমাত্রার ধূর্ততা।

সৃষ্টিকর্তা কোন মানুষ নয়। কোন নর নয়। কোন নারী নয়। পশু নয়। গাছ নয়। চন্দ্র নয়। সূর্য্য নয়। নিজ হাতে গড়া কোন মুর্তিও নয়। প্রকৃতির নিদর্শন পর্যবেক্ষন, মানব জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, উন্নততর জ্ঞান অন্তত সে শিক্ষা দেয়।

তাহলে কে এই প্রকৃতির স্রষ্টা? কি তার রূপ? কেউই এসব জানে না। জানা সম্ভবও নয়। তথাপি একটি ‘এক্স’ ধরে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সৃষ্টি যখন আছে তখন তার স্রষ্টাও আছে। বাস্তব আমাদের সেভাবে শিক্ষা দেয়। প্রকৃতিও সে শিক্ষা দেয়। কোনদিন এক্স এর উত্তর পেয়ে গেলে সত্যা-সত্য প্রমাণ হয়ে যাবে।

এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরও বিশ্বাসীর কাছে সৃষ্টিকর্তা এক প্রশান্তির স্থান, ভরসার স্থান, সাহস সঞ্চারের স্থান। যেটি বাস্তবে নেই। আছে নিজ অভ্যন্তরে, মস্তিস্কে বা ধারণায়। এটিও আরেক সত্য। আরেক বাস্তবতা।

একের উদরের অভ্যন্তরে যে গ্রহীতা আহার করে চলেছে, সে জানে না খাদ্যের একজন যোগানদাতা আছে। যোগানদাতাও তার নিজ প্রয়োজনে কর্মকান্ড করে চলেছে। তাতেই অন্যের আহারের যোগানদাতা হয়ে যাচ্ছে। হতে পারে সেও অবগত নয় তার থেকে শুষে নেয়া গ্রহীতারা কারা। গ্রহীতা ভাবছে তার পরিবেশ প্রকৃতি আপনা থেকে এসব হচেছ। অথচ যোগানদাতাও বসবাস করছে আরেক পরিবেশের ভেতরে। এ চক্রের শেষ কোথায় অন্তত আজও অজানা।

নিশ্চিতভাবে পথ যখন অজানা, তখন সঠিক পথটিকে খুঁজে পেতে ভূল হোক কিংবা শুদ্ধ হোক যে কোন একটি পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। থেমে থাকা যাবে না। অতীতেও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাই করেছে। সেভাবে যুগে যুগে দিকে দিকে এত দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। এভাবেই একদিন ভূল পথ ও শুদ্ধ পথকে চেনা সম্ভব হবে। সৃষ্টিকর্তাকে জানা বা বোঝার জন্য তাই নিজের মত করে পথ চলা শুরু করে দিলাম। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি। সৃষ্টিকর্তা কে বা কি?

“The Beneficent, the Merciful.” (তিনি) দয়ালু, (তিনি) ক্ষমাশীল। (আল-কোরআন ১:১)

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ওপরের উত্তরটি বেছে নিলাম। উত্তরটি দিয়ে কি বোঝা গেল? প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তা কে বা কি উত্তরটি দিয়ে কিছুই বোঝা গেল না। তাঁর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে কোন ধারণা পাওয়া গেল না।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া মানবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এ তো নিজেরা যুগ যুগ ধরে দেখে, শুনে, বুঝে এবং জেনে আসছি। পৃথিবীর ইতিহাসও তেমন সাক্ষ্য দেয়। এমনকি যে সব দর্শন কিংবা ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি সে সব ধর্ম বা দর্শনগুলিও সে একই কথা ব্যাক্ত করে।

"দৃষ্টি/অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ধারণা/কল্পনা করতে পারে না, অথচ তিনি সকল ধারণা/কল্পনাকে জানেন। ...।" (আল-কোরআন ৬:১০৩)

"... তিনি বস্তুগত চেতনার দৃষ্টি ও জ্ঞানের (জানার) সক্ষমতার সীমানার বাইরে ...।" (গীতা ১৩:১৬)

তাঁকে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। তাকে জানা বা বোঝার চেষ্টা করে অধিক সময় নষ্ট করা অর্থহীন। বাস্তবে ফিরে আসতে চাই। তবে ওপরের আলোচনা থেকে এতটুকু বুঝতে পারি যে সৃষ্টিকর্তার কিছু গুণ আছে। তিনি দয়ালু এবং তিনি ক্ষমাশীল।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণায় আমরা মূলত তার কিছু গুণের বা শক্তির সমারোহ দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা মূলত কতগুলি গুণ ও শক্তির আধার। সীমাহীন সক্ষমতা। আমাদের কাছে তিনি এভাবেই পরিচিত। মূলত এসব ধারণা মানুষ তার মস্তিষ্কে ধারণ করে।

সৃষ্টিকর্তার এতসব সক্ষমতা মানুষ তার নিজ অভ্যন্তরে হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে। অনুভব করে বিধায় জানতে বা বুঝতে সক্ষম হয়। অন্যথায় মানুষ তার গুণসমুহকে জানতে বা বুঝতে সক্ষম হতো না। অতএব সৃষ্টিকর্তার সকল গুণ মানবের মাধ্যমে অনুভূত ও উপলব্ধ। যা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়।

"... জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন। ...।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

"আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থীত ...।" (গীতা ১৫:১৫)

সৃষ্টিকর্তার চিহ্নিত এতসব গুণ ও সক্ষমতা মানুষের মাঝেও বিদ্যমান। হতে পারে আংশিক ও বিচ্ছিন্নরূপে। কতগুলি সুপ্ত। মানুষ তার অব্যাহত চেষ্টা ও চর্চ্চার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনে সুপ্ত গুণগুলিকে জাগিয়ে তোলে।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের কল্পনার জগতের সমস্ত শক্তি ও সক্ষমতা বা গুণের আধার। তার সকল গুণ, শক্তি ও সক্ষমতার কেন্দ্রীয় টান বা আকর্ষন ধারণাগতভাবে সত্য, সুন্দর, ভাল ও ন্যায়ের প্রতি। তিনি সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংস করতে পারেন, তিনি লালন পালন করেন। তিনি সকল কারনের কারন। তিনি প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, সবজান্তা। তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি নিরাকার। তিনি সব করতে সক্ষম। চাইলে আকারও ধারণ করতে পারেন। কিভাবে পারেন সেটি তাঁর বিষয়।

প্রতিটি ধর্মের মানুষ, প্রতিটি ভাষাভাষি মানুষ তাকে সর্বশ্রেষ্ট ভাল নামটি ধরে ডাকে। এই ভাল নামগুলি তার গুণ বা সক্ষমতার প্রকাশ। ভাল নামগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সৃষ্টিকর্তার ধারণার। এগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল শক্তি ও সক্ষমতা।

“.. আল্লাহর নিকট ক্রন্দন কর কিংবা দয়াময়ের নিকট ক্রন্দন কর, যার কাছেই তুমি ক্রন্দন কর না কেন, একই। তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর। ...।” (আল-কোরআন ১৭:১১০)

ঘাত প্রতিঘাতের পৃথিবীতে চঞ্চল মানব হৃদয়কে নানামূখী অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হতে হয়। কখনও সে আত্মপ্রত্যয়ি, আত্মবিশ্বাসী, প্রফুল্ল চিত্ত। আবার কখনও লজ্জা, ভয়, অপমান, শংকা, হতাশা ও কষ্টে নিমজ্জিত।

বিপদ কিংবা হতাশার শেষ সীমানাকে যে প্রত্যক্ষ করেনি হয়তো পরিস্থিতিগুলি অনুধাবন করা তার জন্য কঠিন। একটি চরম পরিস্থিতি কল্পনা করি। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যখন কোন একজনকে বর্জন করে কিংবা নিজে যখন সকলকে বর্জন করে, এমন এক চরম পর্যায়ে একজনই অবশিষ্ট থাকে। তিনি বিধাতা। এমন পরিস্থিতি সব মানুষের জীবনে আসে না। কিন্তু একটি মানুষের জীবনে এলে তার জন্যও তো সর্বশেষ কোন না কোন ব্যাবস্থা বা উপায় থাকতে হবে। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকের জন্য একটি ব্যবস্থা বা পথ রেখেছেন।

“... প্রত্যেকের জন্যই আমি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং পথ দিয়েছি। ...।” (আল-কোরআন ৫:৪৮)

এ একটি স্থান একজন বিপদগ্রস্থকে ভরসা দিয়ে তার মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে। সুখে কিংবা কেবলি প্রাপ্তির মধ্যে থেকে বিষয়টি অনুধাবন করা কারও জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে শেষ পর্যায়ে তাঁর কাছেই সকলকে সমর্পিত হতে হয়। আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে তেমন সময় একজনই পাশে থাকে। অত্যাচারিত তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। মানবের একটু আশ্রয়ের ও ভরসার স্থান চাই। সেটি বিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা। যিনি ভালবাসা দিয়ে বিপদগ্রস্তকে আগলে রাখেন। অতঃপর নিঃশেষ হয়ে গেলেও অতৃপ্তি থাকে না। জীবনের সর্বশেষ পর্যায়ের অনুভূতি এগুলি। যখন মানবীয় সকল প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয় তখন তিনিই সর্বশেষ ভরসাস্থল।

ধারণায় সৃষ্টিকর্তা এমন এক সর্বশেষ বন্দর যেখানে এসে মানুষ নোঙ্গর করে। এটি অন্তরের প্রশান্তির একমাত্র স্থান। কিন্তু এ বন্দরে মানুষ দুঃখে ক্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভিড়তে চায় না। কিংবা জ্ঞানের আলোয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অনুসন্ধানের আকুতি ছাড়া ভিড়তে পারে না। তিনি সকলের কাছে ধরা দেন না, যদিও তিনি সেটি চান।

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব'।" (আল-কোরআন ৪০:৬০)

কিন্তু মানুষ চায় পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, চাকচিক্য ও ভোগবিলাসকে। পার্থিব প্রতিযোগীতার লড়াইয়ে নিজেকে প্রথম স্থানে দেখতে ব্যাকুল সবাই।

"কিন্তু তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক পছন্দ কর, যদিও পরবর্তী জীবন উত্তম ও অধিক স্থায়ী।" (আল-কোরআন ৮৭:১৬-১৭)

পৃথিবীতো কেবল একজনের জন্য নয়। এখানে সব ধরনের মানুষ আছে। এখানে যেমন আছে প্রাচুর্য্যপূর্ণ জীবনের ধনীর দুলাল। আছে গরীবের সন্তান। একেক জনের চাহিদা পুরনে একেক রকমের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

মানুষ সকলেই তাঁকে নিজেদের দাবী করে? তিনি জানেন তিনি সবার। সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনও সে কথা বলে। তাই ভাল মন্দ নির্বিশেষে সব রকম মানুষের উপস্থিতি সত্বেও তিনি সকলের জন্য আলো-বাতাস-আহারের সংস্থান সমানভাবে

করেন। বৈষম্য আমাদের চোখে যা দেখতে পাই তা মানুষের নিজেদের সৃষ্ট। কথিত দায়িত্ব-প্রাপ্তদের অন্তরের সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা কৌশলের অন্তর্ভূক্ত বিষয় না হলেও সমগ্র আলোচনাটিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সে কারনে এখানে এ আলোচনাটুকুর অবতারনা করা হলো।

উপাসনা ও স্মরণ

একই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বাসজনিত বিষয়াবলীতে সকলের জ্ঞান ও কল্পিত ধারণা এক রকম নয়। কেউ নিজ জ্ঞানে দৃঢ়তার সঙ্গে কোন বিষয়ে বিশ্বাসী, আবার কারও বিশ্বাস নড়বড়ে অজ্ঞতার কারনে। বিশ্বাস যদি অন্ধও হয়, তথাপি পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে কোন একদিন জ্ঞান প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিশ্বাসকে ধরে রাখা না গেলে সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

আবার জ্ঞানত যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তাদেরকেও ধাপে ধাপে অধিকতর উচ্চ বা সমর্পনের পর্যায়ে গমন করতে হয়। তাদের উচ্চতর পর্যায়ে গমনের সাধনা যেমন তাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি অন্যদের জন্যও প্রেরণা হয়ে কাজ করে। আরোপিত ধর্মের বিষয়াবলীর আরোপকরণ সহজ বিষয় নয়। একবার কারও ওপর সেটি আরোপ করার পর সেটিকে ধরে রাখতে না পারলে সকল প্রচেষ্টা ব্যার্থতায় পর্যবসিত হবে।

সকল ধরনের বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখার জন্য ও আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তাই কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যা তাদেরকে প্রতিনিয়ত দর্শনের বিষয়াবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখবে। দর্শন প্রদত্ত নির্দেশনাগুলিকে ভূলে যেতে দেবে না। তাই দর্শনের আরোপকৃত বিষয়গুলিকে মানুষের মাঝে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে প্রয়োজন এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর অব্যহত চর্চ্চা ও পরিচর্যা।

বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখার জন্য ধর্মীয় দর্শনসমুহে যেসব চর্চ্চা, পরিচর্যা বা কারুকাজের ব্যবস্থা রয়েছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে ‘উপাসনা’। ধর্ম বিজ্ঞানের সকল দর্শনে উপাসনা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে

সফলভাবে পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বিশ্বাসকে অব্যাহতভাবে ধরে রাখা ও গভীরে গ্রথিতকরণের জন্য উপাসনা একটি উপায় হয়ে কাজ করে।

উপাসনা নিয়মিতভাবে পালন করতে হয়। এটি দর্শনের বিষয়গুলির সঙ্গে বিশ্বাসীকে সার্বক্ষণিক জড়িয়ে রাখে। উপাসনা মুখ নিঃসৃত বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে অন্তরে গ্রথিতকরনে ভূমিকা রাখে। উপাসনার মাধ্যমে আমরা আসলে কি করি? উপাসনার মাধ্যমে আমরা প্রধানত সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করি।

"... আমার স্মরণার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর।" (আল-কোরআন ২০:১৪)

সৃষ্টিকর্তাকে অন্তরে যে কেউ যে কোন সময় স্মরণ করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তাঁকে স্মরণ করার বিষয়টি একান্তই ব্যাক্তির ঐচ্ছিক বিষয়। কিন্তু নিয়মমাফিক উপাসনা পালন করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে পালন করতেই হয়। এখানে কোন প্রকার ছাড় নেই। এখান থেকে সামান্য সময়ের বিচ্যূতি চিরদিনের জন্য পথ থেকে বিচ্যূতির কারন হতে পারে। এটিকে সর্বদা আপোষহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত/ধরে রাখতে হয়।

"... নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা সম্পন্ন করতে বিশ্বাসীরা নির্দেশিত হয়েছে।" (আল-কোরআন ৪:১০৩)

নিয়মিত উপাসনা এমন একটি প্রাত্যহিক করণীয় কাজ, যা মানুষকে তার বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়গুলিকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ স্মরণ বিশ্বাসীকে মন্দ পথ থেকে রক্ষায় সহায়তা করে। নিজেকে সুন্দরের পথে বিকশিত হতে সাহায্য করে। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে সর্বদা স্মরণে রাখা বা স্মরণ করা। কেননা এ একটি বিষয় দর্শন প্রদত্ত শিক্ষার অপরাপর সকল বিষয়াবলীকে সার্বক্ষণিক উদ্দীপ্ত করে রাখে।

"... নিশ্চয়ই! নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, তবে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ...।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

এই একটি কেন্দ্রবিন্দুকে স্মরণে রাখা সম্ভব হলে দর্শনের সকল বিষয় স্মরণের মধ্যে বিরাজ করে। নিয়মিত উপাসনা দর্শন নির্দেশিত বিষয়াবলীকে মানুষের

অভ্যাসের সঙ্গে একীভূত করে দেয়। এর থেকে সামান্যতম বিচ্যূতি তাকে দৈহিক পেরিয়ে মানসিকভাবেও যন্ত্রনা দেয়। ফলে বিশ্বাসীকে সম্ভাব্য বিচ্যুতি থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। এটি স্বয়ংক্রীয় যন্ত্রের মত কাজ করে। যা প্রকৃতপক্ষে তাকে তার দর্শনের দেখানো পথে মজবুত রাখে। অতএব দর্শন যদি ভাল ও সঠিক শিক্ষা দেয়, তবে এ চর্চ্চার মাধ্যমে ব্যাক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমষ্ঠি পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ভালটিই প্রতিষ্ঠা পাবে বলে ধরে নেয়া যায়। ভয় কেবল দর্শনের ভূল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস আনয়নকারী ও তাদের অনমনীয় আচরণকে নিয়ে।

অভিজ্ঞতা, অনুধাবন, পর্যবেক্ষন, ধ্যান, গবেষনা, জ্ঞান অর্জন বা প্রাপ্তি ইত্যাদি ব্যাতিত মানবের জন্য এমন রিতি-পদ্ধতির উদ্ভাবন বা উপায়ের সন্ধান লাভ করা মোটেও সহজসাধ্য কাজ ছিল না। মানব জীবনে উপসনার সফলতা হাজার হাজার বছর অবধি স্ব-মহিমায় বিরাজমান। এ সবই বিজ্ঞানময় কারুকাজ। যা মানবের মনের বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রয়োজনীয়তা, সত্য ও সঠিক সূত্রের উপস্থিতি ভিন্ন যুগ যুগ ধরে এমন সব নিয়ম বা কার্যকলাপ স্ব-মহিমায় মানব অন্তরে গ্রহণযোগ্য হয়ে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। মিথ্যে কখনই স্থায়ী হয় না। আরোপিত দর্শনে কঠিনভাবে মানুষকে জুড়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও কৌশলরূপে প্রমানিত।

বিশ্বাসীর জন্য সফলতা কেবল ইহকালের সফলতা নয়। ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনের সফলতাকেই বিশ্বাসী সফলতা বলে জানে। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করা বিশ্বাসীর জন্য সফলতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের জন্য উপাসনা তথা সৃষ্টিকর্তার স্মরণ সর্বোত্তম পন্থা।

"... আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পারো।" (আল-কোরআন ৬২:১০)

"কোনরূপ বিচ্যূতি ছাড়া যে আমাকে স্মরণ করে, আমাকে পাওয়া তার জন্য খুবই সহজ।" (গীতা ৮:১৪)

সমর্পন

সুদীর্ঘ চর্চা বিশ্বাসকে স্তর থেকে স্তর পেরিয়ে গভীরে নিয়ে যায়। গভীর বিশ্বাস ধীরে ধীরে মানুষকে সমর্পনের পথে নিয়ে যায়। এ সব কিছু একদিনের কর্মযজ্ঞ নয়। এখানে জ্ঞানেরও ভূমিকা আছে। জ্ঞান মানুষকে যৌক্তিকভাবে কোন বিষয় বুঝতে সহায়তা করে। এ বুঝটিই ধাপে ধাপে মানুষকে এক স্তর থেকে আরেক স্তরের বিশ্বাসীতে উন্নীত করে। এটি বিশ্বাসের পথ ধরে আস্থায় রূপান্তরীত হয়। সেখান থেকে পরিপূর্ণ সমর্পনের পথে। এ পথে গমনে বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।

ভেতরের গভীর রহস্য না জেনে বুঝে বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব। কিন্তু আত্মসমর্পন বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় তা জ্ঞান ভিন্ন সম্ভব নয়। সমর্পনের সঙ্গে সত্য বুঝতে পারা ও অনুধাবনের সম্পর্ক আছে। সত্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান যা বিচার বিশ্লেষনে সহায়তা করে।

বিশ্বাসের পরেও ভয়, সন্দেহ, লোভ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অবচেতন মনে কাজ করতে পারে। কিন্তু সমর্পিত আত্মা এসব থেকে মুক্ত। সে তার যৌক্তিক জ্ঞানেই জানে যে এটিই পথ। আর কোন পথ নেই। ফলে সে সুনিশ্চিত জ্ঞানে নিশ্চিত পথ ধরেই চলে। অযথা সময় অপচয় করে না।

বল প্রয়োগ বা মানসিক চাপ প্রয়োগে ব্যাহ্যিকভাবে মানুষকে দিয়ে উপাসনা পালন করানো সম্ভব। কিন্তু সমর্পন বল প্রয়োগে হয় না। সমর্পন দেহের সঙ্গে নয় বরং মন ও মস্তিস্ক বা জ্ঞানের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত। তাই তাকে বাহির থেকে দেখা বা বোঝা যায় না যদিও আচরণে প্রকাশ পায়।

নিজ জ্ঞান যখন বিশ্বাসজনিত বিষয়গুলিতে পরিপূর্ণভাবে সম্মতি প্রদান করে কেবল তখনই সমর্পন সম্ভব। এটি সৃষ্টিকর্তার প্রতি সন্দেহাতীতভাবে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বা সকল বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে ও নির্দেশনার ওপর অকৃত্রিম ভরসা রাখাকে বোঝায়। আত্মা নিজেকে সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টিকর্তায় সমর্পন করে। এ পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা দ্বিমতের অবকাশ থাকে না। বরং বিচার বিশ্লেষণ শেষে আপন জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে নির্দেশনার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পায়। ফলে নির্দেশিত পথে চলে।

বস্তুত এ পর্যায়ে নির্দেশনাগুলি অন্তর থেকে উৎসারিত হয়। অন্তরের নির্দেশনা এবং গ্রন্থ প্রসূত নির্দেশনায় সংঘর্ষ হয় না। অন্তর তার মূলের সঙ্গে নিজেকে একীভূত

অনুভব করে। ফলে নিজের প্রকৃত মূল্য বুঝতে শেখে। জগতের সকল চাওয়া পাওয়া ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়।

দর্শন প্রসূত জ্ঞানকে অনুধাবন করেই আত্মাকে সমর্পিত হতে হয়। সঠিকভাবে সত্য অনুধাবনের কারনে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাস বিশ্বাসীকে নিজ জ্ঞানে অনুধাবিত সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ফলে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সমর্পনের পর্যায়টি তাই নিজ বিশ্বাসের প্রতি মানবের দৃঢ়তারও নির্দেশক। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রেও জ্ঞান কাজ করে নিজ নিজ শিক্ষার আলোকে। আর এ কারনেই ত্রুটি প্রবেশের একটি সম্ভাবনাও থেকে যায়।

মানুষ সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিকর্তাকে জানেনা। হয়তো জানা সম্ভবও নয়। তাই সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পনের অপর অর্থ হচ্ছে আরোপিত ধর্ম বা দর্শন প্রসূত জ্ঞানে নিজেকে সমর্পন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে নিজের বিশ্বাসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন। নিজের বিশ্বাস বলতে বোঝায় নিজ জ্ঞানে নিজের ওপর বিশ্বাস। যার অপর নাম 'আত্মবিশ্বাস'। ব্যাক্তির ভেতরে এই আত্মবিশ্বাসকে গড়ে তুলতে আরোপিত ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মবিশ্বাস ব্যাতিত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসই মানুষকে পর্বত প্রমাণ করে গড়ে তোলে। নিজেকে আত্মবিশ্বাসী দাবী করলেই আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না। আত্মবিশ্বাসীর আচরণই সেটি জানান দেয়।

বিশ্বাসেরও ওপরের পর্যায়ে আত্মসমর্পন বা সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পনের স্থান। ধারণায় সৃষ্টিকর্তা বিরাজ করেন ব্রহ্মান্ডের সকল সত্যের প্রতীক বা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। যে বিন্দুতে জগতের সকল বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান একীভূত হয়েছে।

যে দর্শনে সৃষ্টিকর্তা আছে সে দর্শনে বিশ্বাস ও জ্ঞান মানবাত্মাকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পন করায়। যা সঙ্গায়িত করা সম্ভব নয় বা উচিতও নয়। তাই তিনি নিরাকার। সীমাহীন আকার। যার শেষ মানুষের অজানা। এটি একটিমাত্র কেন্দ্রবিন্দু যেখানে এসে সমস্ত জ্ঞান, দর্শন একীভূত হয়ে প্রতীকী রূপ ধারণ করেছে। যে দর্শনে সৃষ্টিকর্তা নেই সেখানে মানুষ কোন মহামানবকে বেছে নিতে পারে কিংবা জ্ঞানের কোন এক তত্ত্বের কাছে নিজেদের সমর্পন করতে পারে বা বেছে নিতে পারে প্রকৃতিকে। একটু গভীরে প্রবেশ করে ভাবতে চায় না যে, কে এই প্রকৃতির স্রষ্টা? কিংবা এই প্রকৃতিকে কে ধারণ করে আছে?

কোন একটি ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা, নিয়মিত উপাসনা করা এবং ধর্মীয় সকল কর্মযজ্ঞের পরিপালন মানবাত্মাকে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পনের পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তবে স্ব আলোকিত কিছু মানুষ নিয়মের সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে এ পথ অর্জন করতে পারে, যদি তার জন্য বিধাতার আশীর্বাদ বা অনুমোদন থাকে।

ভাল দর্শনে সমর্পন সম্ভব হলে ভাল পথ ধরে চলার কাজটি সহজ হয়ে যায়। যদিও জ্ঞান ভিন্ন সমর্পন সম্ভব নয়, তবে সম্ভব কোন জ্ঞানীর কাছে নিজেকে সমর্পনের মাধ্যমে। ঐ যে বলেছি, মানুষকে বোঝা দায়। সে ঝুঁকি থেকে যাবে। এ ঝুঁকি নিজের ক্ষেত্রেও থাকে। তেমন ক্ষেত্রে অবশ্য এটি প্রতীয়মান হবে যে বিশ্বাস এবং সমর্পন সঠিক পথে ও সঠিকভাবে হয়নি। সঠিক পথ ও প্রক্রিয়ার জন্য সঠিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

ভূল দর্শনে সমর্পন কিংবা সঠিক দর্শনের ভূল ব্যাখ্যায় নিজেকে সমর্পনের দায় ব্যাক্তির নিজের। ভূল হলে ভূল কর্মের ফলাফল নিজেকে ভোগ করতে হবে। ভূল শুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় সহজ মনে হলেও বিষয়টি তত সহজ নয়। সে কারনেই সোলায়মান (আঃ) গডের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে অর্থ, সম্পদ, ধন-দৌলত কোন কিছু প্রত্যাশা না করে কেবল সত্যের জ্ঞান প্রত্যাশা করেছিলেন। যে জ্ঞান ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপনে সহায়ক। এটিই সবচেয়ে বড় সম্পদ। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তিমাত্রই জানেন যে, জ্ঞানের মাধ্যমে জগতে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও সত্যের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, বিধাতা প্রদত্ত দিক নির্দেশনা অনুসারে মানবের জন্য ধর্ম একটিই। কিন্তু সেটি কি, সে নির্দেশনাটি সহজভাবে সকলের কাছে বোধ্যগম্য নয়।

“নিশ্চয়ই! তোমাদের এই ধর্ম এক ধর্ম (এক জাতি/এক পথ) ...।” (আল-কোরআন ২৩:৫২)

সমগ্র মানবের জন্য সঠিক ধর্ম কেবল একটি। কেউ বলে ইসলাম। অর্থাৎ শান্তি। সমর্পন ভিন্ন পরিপূর্ণ প্রশান্তি প্রাপ্তি অসম্ভব। জগতের সকল মানুষের জন্য সত্যিকার অর্থে সত্য ধর্ম একটিই এবং সেটি হচ্ছে তাঁর কাছে নিজেকে ‘সমর্পন’। আর তাই এত এত নামধারী ধর্মের রিতিনীতি ও আবির্ভাবের পূর্বেও মানুষ সত্য ধর্মের

অনুসারী ছিল। বিধাতার প্রিয়পাত্র ছিল। কেননা তারা ছিল তাঁর প্রতি সমর্পনকারী। এটিই সত্য, সঠিক ও ধর্ম নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষের জন্য একমাত্র পথ।

"নিঃসন্দেহে! আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর (ইচ্ছে ও পথ নির্দেশনার) প্রতি নিজেকে সমর্পন করা (অর্থাৎ ইসলাম)। ...।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না ...।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

"বিবিধ প্রকার ধর্মের ভাবনা পরিত্যাগ কর এবং কেবল আমার প্রতি (নিজেকে) সমর্পন কর।" (গীতা ১৮:৬৬)

কার কাছে, কিভাবে সমর্পন করতে হবে সত্যি বলতে সকল মানুষের কাছে সেটি সহজবোধ্য নয়। আর সমর্পন সম্পর্কিত আলোচনার সবচাইতে জটিল অংশটি এখানেই নিহিত। এটি লিখে বা বলে বুঝাবার বিষয় নয়। যে এ পথের পথিক, আত্মা যখন সমর্পন করবে সে নিজেই সেটি জানতে বা বুঝতে সক্ষম হবে। জ্ঞান ভিন্ন সমর্পন সম্ভব নয়। কিন্তু সমর্পনের জটিল অংক বুঝতে পারা জ্ঞানের পক্ষেও কঠিন। কিন্তু বিষয়টি অতি সহজ যখন জ্ঞান নিজে এসে ধরা দেয়। সে সৌভাগ্যবান!

সমর্পিত আত্মা সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলে। এক অর্থে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বুঝে চলাই স্রষ্টার কাছে সমর্পনের পথে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ সামুদ্রিক স্রোতের বিপরীতে না চলার মত। তবে এর মাঝেও ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝে চলতে হয়, নিজেকে সত্যের পথে ধরে রাখতে হয়। নয়তো সেটি সঠিক সমর্পন হবে না। সমর্পন কেবল ধারণা বা তত্ত্ব নয়, এটি বাস্তব কর্মের সাথেও সম্পর্কিত যা আচরণের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়।

স্রষ্টার কাছে সমর্পন ভিন্ন কেউই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেটি তার ইচ্ছে ও পথ নির্দেশনার বিরুদ্ধ আচরণ। সত্যি বলতে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বুঝে চলার বোধটি সকলের জন্য খুব সহজ নয়।

এ অধ্যায়ে মূলত আরোপিত ধর্মের কলা কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সমর্পন প্রকৃত অর্থে কোন কৌশল নয়। সমর্পনকে বরং নানান কৌশল

কার্যকরীকরণের ফলাফল বা পরিনতি বলা যেতে পারে। নানান সব কর্মযজ্ঞের লক্ষ্যও বলা যেতে পারে। তথাপি এ লক্ষ্য অর্জিত হলে দর্শনের নির্দেশনা অনুসারে মানুষকে পরিচালনা করা সবচেয়ে সহজ হয়ে যায়। ফলে তখন সেটি কৌশলেরও অন্তর্ভূক্ত বিষয় হয়ে যায়।

কৌশল ও কিছু অতিরঞ্জিত কথা

ধর্মীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য কিছু কৌশল নিয়ে ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কৌশলের বিষয়গুলি সকলের কাছে প্রকাশ না করা শ্রেয়। তাতে কৌশলের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

এক অর্থে জগতে দু'রকম প্রবণতাসম্পন্ন মানুষ আছে। এক: তাত্ত্বিক প্রবণতাসম্পন্ন এবং দুই: প্রায়োগীক প্রবণতাসম্পন্ন মানুষ। প্রায়োগীকগন বাস্তব কর্মে পটু, তত্ত্বে ততটা নয়। অপরদিকে তাত্ত্বিকগন ভাবনায় অগ্রগামী, কর্মে কিছুটা পিছিয়ে। মূলত মানুষ প্রচেষ্টাটি যেদিকে বেশী দেয় প্রবণতাটি সেদিকে গড়ে ওঠে। মানুষ আবার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার পছন্দ বা আগ্রহের দিকটিতে। যদিও সর্বত্রই কিছু ব্যাতিক্রমও আছে।

কৌশলটি যে কৌশল তাত্ত্বিক প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের কাছে সে বিষয়ের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়কও বটে। কেননা এটি তাদের জ্ঞান ও তত্ত্বের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। সত্যকে অনুধাবনে সহায়তা করে। ভবিষ্যত পথের সন্ধান প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। জ্ঞান অর্জন ও সত্য অনুধাবনের মাধ্যমে আত্মবিশাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাত্ত্বিকগন এমনতর আলোচনায় অধিক আগ্রহী।

অপরদিকে কৌশলটি যে কৌশল প্রায়োগীক কাজে যারা পটু তেমন প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের কাছে সেটি প্রকাশ না করা শ্রেয়। কেউ নিজে থেকে বুঝে নিলে ভিন্ন কথা। এ ধরনের মানুষ পূর্ব থেকেই তত্ত্বের অনেক গভীরে প্রবেশে আগ্রহী নয়। ফলে তাত্ত্বিক জ্ঞানে তাদের কিছু ঘাটতি থাকতে পারে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

একটি উপলব্ধিবোধ ও জ্ঞানের জন্য পূর্বতন আরেকটি উপলব্ধিবোধ ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। পূর্বেরটিকে বাদ দিয়ে পরেরটিকে প্রকাশ করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ফলে জ্ঞানের এ রকম ঘাটতি জনিত কারনে প্রায়োগীক প্রবণতাসম্পন্ন

মানুষের কাছে কৌশল নিয়ে আলোচনা হিতে বিপরীত হতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, অনাগ্রহের কারনে তত্ত্বের গভীরের জ্ঞানে বা পূর্বতন প্রয়োজনীয় কোন একটি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানে তাদের কিছুটা ঘাটতি আছে। ফলে এটি তাদের ধারণকৃত বর্তমান বিশ্বাস ও সে বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট আত্মবিশ্বাসকে নাশ করতে পারে। পূর্বাপর জ্ঞানের ধারাবাহিকতার ঘাটতির কারনে এটি হতে পরে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তারা সত্যকে সত্য না ভেবে বরং ভূলভাবে চতুরতা হিসেবে ভেবে নিতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসের মাঝে চিড় ধরতে পারে। সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে।

কৌশল প্রয়োগের বিষয়টি অবশ্যই হতে হবে মানুষের উপকার বা কল্যানের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অন্যথায় কৌশল মন্দ অর্থে ছলনা কিংবা ধূর্ততা বলে প্রতীয়মান হবে।

মানুষ নিয়ে আলোচনায় যত সূত্র তার সব সূত্র সকল ধরনের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। নেতৃত্বের জন্য এমন কিছু জ্ঞান বা বিষয় প্রযোজ্য যা অনুসারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। আবার সুশিক্ষিতদের জন্য এমন কিছু জ্ঞান বা বিষয় প্রযোজ্য যা স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সব জ্ঞান তাই সকলের কাছে সমভাবে প্রকাশ করা সমীচীনও নয়।

তথাপি কুসংস্কার, ধর্মের বিষয়াবলীর ভূল অনুধাবন ও অপব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা থেকে সৃষ্ট বাস্তব বিবর্জিত নিয়মের অনমনীয়তা অপ্রিয় সত্য প্রকাশে কখনও বাধ্য করে। যুগে যুগে সেটি হয়ে এসেছে। যেমন বলা হয়েছে,

“.. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। ...।” (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

আরও বলা হয়েছে, “(জেসাস বলে আমি এসেছি) ... যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ...।” (আল-কোরআন ৩:৫০)

যুগে যুগে নানান কুসংস্কার দ্বারা সাধারণ মানুষ যেভাবে আটকে ছিল, নিয়মের অতিরঞ্জিত এসব বোঝা থেকে বার্তাবাহকগণ মানুষকে মুক্তি দিতে এসেছেন, ওপরের কথাগুলি সে অর্থে বলা হয়েছে। আজও তেমনটি ঘটছে।

এগুলি বিধাতার স্বয়ংক্রিয় পরিচালন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বিষয়। সময়ে যা আপনা থেকে সরব হয়ে ওঠে। যেমন বাধ্য হয়ে বর্তমান সময়ে এমন আলোচনার অবতারণা করতে হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাতে গাছের একটি পাতাও ঝরে না। সবকিছুই তিনি করান প্রয়োজন সাপেক্ষে।

"... একটি পাতাও ঝরে না অথচ তিনি তা জানেন। ...।" (আল-কোরআন ৬:৫৯)

এ অধ্যায়ে মূলত আরোপিত ধর্মের কলা কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরোপিত দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন, তাকে ধরে রাখা এবং বিশ্বাসকে শক্তিশালীকরনে কৌশলগুলি কার্যকর উপায় হয়ে কাজ করে। বিশ্বাস দৃঢ় হলে মানুষ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টিকর্তাকে সর্বদা স্মরণ রাখে; অন্তরে ধারণ করে। ফলে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে। সৃষ্টিকর্তা তার সকল কর্মে প্রভাবক হয়ে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তার প্রভাব বিশ্বাসীকে তার সকল কর্মক্ষেত্রে সফল হতে ভূমিকা রাখে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রভাব বিশ্বাসীকে সফল হতে কেন ভূমিকা রাখে?

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ এবং বিশ্বাসীর সফলতা প্রাপ্তির মধ্যে অবশ্যই কোথাও না কোথাও একটি যোগসূত্র আছে। অন্যথায় সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে কোন উপকার পাওয়া সম্ভব হতো না। একটির কারনে অপরটি সংঘটিত হয়। যোগসূত্রটি কোথায় এবং কেন ও কিভাবে সেটি বিশ্বাসীর ওপর কাজ করে এ পর্যায়ে সে কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

৬. কার্যকারণ সম্পর্ক

এই কাজটির কারনে ওই কাজটি হয়। ওই কাজটির কারনে সেই কাজটি হয়। এই কাজটির কারনে ওই কাজটি প্রয়োজন। ওই কাজটির কারনে আবার সেই কাজটি প্রয়োজন। কি ব্রম্মান্ড, কি প্রাণী জগত সব কিছুর অভ্যন্তরস্ত যাবতীয় বিষয়সমুহ এমনি অসংখ্য জটিল সূত্রে বিনি সূতোর মালার ন্যায় গাঁথা। সূতো তো অবশ্যই আছে। মানব চোখে সব ধরা দেয় না।

কোন একটি কর্ম সম্পাদনের পেছনে কারন থাকে। আবার নতুন কারনের সৃষ্টি হয় অপর একটি কর্ম সম্পাদনের কারনে। কারনের কারনে প্রয়োজন সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন থেকে আবার নতুন কারনের সৃষ্টি। কারন-কর্ম-কারন একটি একটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বা সম্পর্কিত। এই হলো কার্যকারণ সম্পর্ক।

কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে বিরাজ করে সূত্র। সূত্র আঠার মত জড়িয়ে রাখে সকল বিষয়, বস্তু আর কর্মকে। এ আঠাই সূত্র। সূত্রই সত্য। সূত্র বা সত্যই বন্ধনের কারন। যা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় যথাযথ পরিমাপে।

"... তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই একটি পরিমাপ (মাত্রা) নির্ধারণ করেছেন।" (আল-কোরআন ২৫:২)

সত্য বা সূত্রের এ পরিমাপজনিত নির্ধারণ কেন্দ্রীয় বা চৌম্বকীয় টানের মত সবকিছুকে জড়িয়ে ধরে রাখে। তাই একটি কার্য সম্পাদনের ফলে বন্ধনে আবদ্ধ আরেকটি ফল অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে।

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও সফলতা প্রাপ্তির কার্যকারণ সম্পর্ক

বিশ্বাসী বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার সঙ্গে কর্মে উপকারীতা পাবার সম্ভাবনা আছে। বিষয়টি যদি সত্যি হয় তবে সেটি অলৌকিকভাবে ঘটে না। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা হলে আপাতদৃষ্টে তিনি নিজে এসে কোন সহায়তা করেন না! অথচ তাঁকে স্মরণ করা হলে উপকার পাওয়া যায়। এখানে কার্যকারনের একটি সম্পর্ক আছে। বিশ্বাসী এর মাধ্যমে সূত্রে আবদ্ধ এমন কিছু অর্জন করে যার কারনে কর্মে সফলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

নৌকা, বাতাস ও পাল এ তিনের মধ্যে যেমন যোগসূত্র আছে, যা নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যায়; সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ তেমনি সৃষ্টিকর্তা, দর্শন ও মানুষ এ তিনের মধ্যে একটি কার্যকর যোগসূত্র তৈরী করে। কার্যকারণ এ সম্পর্কের উপস্থিতির কারনে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ দর্শন নির্দেশিত পথে মানুষের পথ চলাকে বেগবান করে তোলে। তবে সেটি তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষটি নির্দিষ্ট দর্শনে হয় বিশ্বাসী। আর সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মানুষকে কোন একটি দর্শনে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। সে কারনেই কৌশলের প্রয়োগ করা হয়। এ পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণের কারনে কোন একটি কাজ কেন ও কিভাবে সম্পন্ন হয় বা বেগবান হয় সে সত্যটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

● **লক্ষ্য অর্জনে মানুষ ও দর্শন বা দিক নির্দেশনা :** মানুষ এমন এক প্রাণী যাকে চালনা করতে একটি ছক নির্ধারণ করে দিতে হয় বা সে নিজেই নিজের জন্য পরিবেশ থেকে একটি ছক তৈরী করে নেয়। মানুষের জন্য এটি সত্য। তাই লক্ষ্যবিহীন মানুষ উদ্ভ্রান্তের মত। পরিকল্পিত ছকে লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। এটি চলার পথের দিক নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। মানুষ সে লক্ষ্য অর্জনে ছুটে চলে।

প্রদত্ত বা গ্রহণকৃত দিক নির্দেশনা মানুষকে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে সে বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হয়। বিশ্বাস তাকে আঠার মত ছকের গন্ডিতে বেঁধে রাখে। সে ছকের গন্ডির মধ্যে পথ চলে। কল্পনার চোখে দেখা ছকে নির্ধারিত তেমন একটি চিত্রকল্প কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয় কর্মের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একটি স্বপ্ন বা ভিশন, একটি পরিকল্পিত ছক বা চিত্রকল্প এগুলি মানুষের ব্যাহ্যিক বিষয়ের অন্তর্গত। অর্থাৎ ব্যাহ্যিক এ ষিয়গুলি ছাড়াও মানুষের নিজের দেহের ভেতরেও কতগুলি বিষয় আছে যা লক্ষ্য অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কাজ করে। যার ওপরেও লক্ষ্য অর্জনের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে। যেমন তার সহজাত ধর্মের অন্তর্গত বিষয়সমুহ।

● **লক্ষ্য অর্জনে মানুষ ও সহজাত ধর্ম :** ব্যাহ্যিক দিক থেকে লক্ষ্য অর্জনের সকল পরিকল্পনা সঠিক থাকা সত্বেও মানুষের নিজের ভেতরের বিষয়গুলি যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তবে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

মানুষের চালিকা শক্তি তার সহজাত ধর্মের বিবিধ গুণ বা বৈশিষ্টের মধ্যে নিহিত। যা সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি প্রদত্ত। সৃষ্টির শুরুতেই যা শক্তির আধাররূপে মানুষের ভেতরে গ্রথিত। ভিন্ন ভিন্ন এসব বৈশিষ্ট মানুষের প্রতিটি পৃথক কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী।

“.. পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেন, অতঃপর সেটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।” (আল-কোরআন ২০:৫০)

মানুষ তথা প্রাণীসমুহের মস্তিস্ক ও হৃদয়ে তার বিবিধ বৈশিষ্ট, গুণাগুণ ও প্রকৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান বা মাত্রা বরাদ্দ থাকা স্বাভাবিক; যেখান থেকে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝা সম্ভব, যা নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারন দ্বারা।

সহজাত ধর্মের গুণগুলিকে মানুষের দ্বারা সম্পাদিত একেক ধরনের কাজের পেছনে দায়ী এক একটি কারন হিসেবে মনে করা যেতে পারে। সহজাত ধর্মের এক একটি গুণ বা বৈশিষ্টকে মানবিক এক একটি রূপ সৃষ্টিকারী জ্বালানীস্বরূপ ভাবা যেতে পারে, যা প্রকৃতি-পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সচল হয়ে ওঠে।

মানুষ কোন একটি রূপ প্রদর্শন করছে বলতে বোঝায়, তার সহজাত ধর্মের কোন একটি নির্দিষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট তার ভেতরে ক্রিয়া করছে বা উত্তাপ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। সহজাত ধর্মের এক একটি গুণ ক্রিয়া করে বিধায় দেহ এক এক রকমভাবে ক্রিয়া করে এবং এক এক রকম রূপ প্রদর্শন করে। অন্যভাবে বলা যায় দেহ ক্রিয়া করে দেহের ভেতরে সহজাত ধর্মের ক্রিয়াশীল এক একটি গুণ বা বৈশিষ্টের কারনে। সকল গুণের মধ্যে দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের যাবতীয় শক্তি ও সক্ষমতা নিহিত। অন্যভাবে বলা যায় গুণগুলি এক একটি সক্ষমতার নাম বা প্রতীক। তাই তো সর্বশক্তিমান তাঁর বিবিধ গুণের নাম দ্বারা প্রকাশিত ও পরিচিত।

সাহস কিংবা উদ্দীপনার কথা উদাহরণস্বরূপ বলা করা যেতে পারে। যার ওপর লক্ষ্য অর্জন অনেকটাই নির্ভর করে। রূপরেখা বা দিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ব্যাক্তি নিজের ভেতর থেকে কাজ করার স্বতস্ফুর্ত উদ্দীপনা বা সাহস না পেলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না বা দুরূহ হয়ে যাবে। এমনকি কর্মটিই শুরু নাও হতে পারে।

ভয় মানুষের সহজাত একটি ধর্ম। যখন ভয় ক্রিয়া করে তখন দেহ ভীত সন্ত্রস্ত রূপ প্রদর্শন করে এবং তার ক্রিয়াকলাপে সেটির প্রভাব থাকে। ফলে দেহের

কার্যকলাপ বা ক্রিয়া দর্শনে ভেতরে কোন গুণটি ক্রিয়া করছে সেটি বুঝে নেয়া সম্ভব। আবার অন্যভাবে বলা যায় সহজাত কোন বৈশিষ্টটির ক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেহ ক্রিয়া করছে বিষয়টিকে সেভাবেও বলে দেয়া যেতে পারে।

রাগ, ঘৃনা, বিদ্বেষ, প্রেম, ভালবাসা সহজাত যে বৈশিষ্টটি যখন মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করে মানুষের দেহ তেমন রূপ প্রদর্শন করে। যার প্রভাব তার আচরণে পরিলক্ষীত হয়। মানবের দৈহিক কোন ক্রিয়ার শক্তির মূল উৎস সহজাত এক একটি ক্রিয়াশীল গুণ বা বৈশিষ্ট। বলা যায় এক একটি গুণ বা বৈশিষ্ট তার সামগ্রীক রূপ, আচরণ ও কর্মের এক একটি একক হয়ে কাজ করে। তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে, প্রয়োজন সাপেক্ষে মানুষের কোন একটি গুণকে যথাযথভাবে উদ্দীপ্ত করা বা জাগিয়ে তোলা।

সহজাত ধর্মের বৈশিষ্টগুলির রাসায়নিক গঠন কাঠামো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আলোচনাকে সে দিকে নিয়ে যেতে চাই না। সেটি এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ও নয়। বিষয়টি বিজ্ঞানীদের গবেষনার বিষয় হতে পারে। হতে পারে মস্তিস্কের এক একটি অংশে এরা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যার সমন্বিত উপলব্ধিবোধ হৃদয়কে নাড়া দেয়। হৃদয়ের সে দোলন বা কম্পন দেহকে চালিত করে। দেহমধ্যস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য দায়ী এসব উপাদানকে আমরা বিবিধ বৈশিষ্টের নাম দিয়ে থাকি। এ নামগুলি দেহমধ্যস্ত ক্রিয়াশীল রাসায়নিক উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মায়া-মমতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃনা, ভালবাসা ... ইত্যাকার বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট বা গুণাগুণগুলি কর্মে ধনাত্মক ও ঋনাত্মক ফল প্রাপ্তির জন্য দায়ী। যা আবার বাইরের পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপ্ত হয় এবং দেহ-মন ও কাজকে ত্বারন্বিত অথবা অবদমিত করে।

মানুষের ভেতরে সহজাত ধর্মের বিবিধ গুণ ও বৈশিষ্টের উপস্থিতির কারনে মানুষ সম্ভাবনাময় এক শক্তিশালী প্রাণী। কিন্তু মানুষের অনেক সক্ষমতা প্রয়োজন অনুভূত না হওয়ার কারনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে দিয়ে কাজ করাতে হলে তার ভেতরের সহজাত সুপ্ত গুণ বা শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হয়। ফলে তার সুপ্ত বা ঘুমন্ত শক্তিকে দারুনভাবে

জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার এ কাজটি করে প্রভাবক।

● **লক্ষ্য অর্জনে মানুষ ও প্রভাবক :** নদীর ধারে খেজুর গাছের নিচে বসে আছি। হঠাৎ কোকিলের ডাক শুনতে পাই। দৃষ্টি সেদিকে ফিরে যায়। বাতাসে দুলছে ঝুমকো লতা ফুল। দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়। একটি প্রজাপতি অনেকক্ষন নিশ্চুপ বসে আছে পাতার ওপর। যেই না আরেকটি হলুদ প্রজাপতি পাশ দিয়ে উড়ে গেল অমনি তার পিছু নিল।

আমরা কিছুই করি না। করতে চাই না। করতে জানি না। সদা নির্বাক, নিশ্চল, নিশ্চুপ! প্রকৃতি ও পরিবেশ তার নানান উপকরন ব্যবহার করে আমাদের নাড়া দেয়। উজ্জীবিত করে। প্রলুব্ধ করে। ভাবনার উন্মেষ ঘটায়। তাই করি। অতঃপর কর্মে জড়িয়ে যাই। পথ চলি ..।

জিহ্বায় কাঁচামরিচ স্পর্শ করলে ঝাল অনুভূত হয়। চিনি, করলা, তেতুল এক একটির সংস্পর্শ পেলে ভেতর থেকে এক একটি স্বাদ জেগে ওঠে। পেঁয়াজ কাটা শুরু করতেই চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করে। জল পেঁয়াজ থেকে ঝরে না। চোখের পানি পেঁয়াজের ভেতর নয়, মানবের দেহের ভেতর। পেয়াজের প্রভাবে সে বেড়িয়ে আসে। এগুলি প্রভাবক।

মহামূল্যবান এ দেহের ভেতরে আছে নানান কিছু। ঘুমন্ত। সুরক্ষিত করে রাখা মূল্যবান সে সব সম্পদ ভেতর থেকে বেড় করে আনতে কিছু একটা প্রয়োজন। সেটাই প্রভাবক।

পলাশ শিমুলকে ভালবাসে। আবীর ঝুমুরকে। শিমুলের প্রেরণায় পলাশ ছুটে চলে। ঝুমুরের কারনে আবীর। শিমুল পলাশের ভেতরে প্রেরণা সৃষ্টি করে। শক্তি সঞ্চার করে। ঝুমুর আবীরের ভেতর। অথচ আশ্চর্য্য! অদম্য উদ্যামে ছুটে চলা এই পলাশ ঝুমুরের কারনে উদ্দীপ্ত নাও হতে পারে। ছুটে চলার গতি খুঁজে নাও পেতে পারে। তেমনি আবীর অনুপ্রাণীত কিংবা চলার শক্তি নাও পেতে পারে শিমুলের দ্বারা। অথচ উদ্যাম ও গতি কিন্তু উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। সঠিক প্রভাবকের অভাবে সমস্ত সক্ষমতা সুপ্ত। উপযুক্ত প্রভাবক পেলে সুপ্ত শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে।

নিজ সন্তানের প্রয়োজনে মানুষ ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে চলতে দ্বিধা বোধ করে না। সন্তানের জন্য তার সমস্ত কর্মক্ষমতা কাজ করে। অথচ আশ্চর্য্য! অপরের সন্তানের জন্য তেমনটি হয় না। অথচ মানুষের ভেতরে তার ছুটে চলার গতি সদা বিদ্যমান। কিন্তু উপযুক্ত প্রভাবক ভিন্ন সেটি জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। সন্তান পিতামাতার ছুটে চলার গতি সঞ্চারনে প্রভাবক হয়ে কাজ করে।

কর্ম সম্পাদনে উপযুক্ত প্রভাবক ব্যাবহার করা হলে কাজ হবেই। নিজের সন্তানের জন্য ছুটে চলার গতি প্রমাণ করে সকলের ভেতরে সর্বাবস্থায় উদ্যাম, শক্তি ও কর্মক্ষমতা বিদ্যমান। উপযুক্ত প্রভাবকের অভাবে সুপ্ততা প্রদর্শন করে।

ভয়ের গল্প শুনে ভেতরে ভয়টি জেগে ওঠে। উদ্দীপনামূলক গান শুনে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়। ভগবান, বুদ্ধ, গড এমনকি দেশ, পতাকা, ভাষা, একটি গান, একটি ভাষণ হতে পারে প্রেরণা সৃষ্টিকারী। যা ভেতরের সহজাত কিছু বৈশিষ্ট বা গুণকে উদ্দিপ্ত করার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখে।

প্রভাবক ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রকৃতির হতে পারে। প্রভাবকের ফলাফলও ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাবক দিয়ে ইতিবাচক আবার ইতিবাচক প্রভাবক দিয়ে নেতিবাচক বিষয়গুলিকেও জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

মানুষকে উত্তেজিত করার কূট-কৌশলও প্রভাবকের মধ্যে পরতে পারে। তবে তা নেতিবাচক প্রভাবকরূপে পরিচিত। ব্যাতিক্রমও আছে। কখনও কোন পাত্রে মন্দটি নিপতিত হলে তা ভালটিকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। আবার যেটিকে ইতিবাচক বা ধনাত্মক প্রভাবক মনে করা হয় সেটিও মন্দ ফলাফল দিতে পারে।

মনে করি, শিক্ষক ছাত্রকে অপমানের সুরে কথা বললেন। এটি হতে পারে তার কাজকে আরও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য উত্তেজিত করা। ভেতরের সামর্থ ও যোগ্যতাকে আরও নিখুঁত কিংবা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা। একই ঘটনা আবার আরেকজনকে হতাশ করতে পারে।

প্রভাবকের প্রয়োগ কে করছে, কিভাবে করছে, কার ওপর করা হচ্ছে কাঙ্খিত ফলাফল পেতে হলে সবকিছুকে বিবেচনায় নিয়ে তার প্রয়োগ আবশ্যক। স্থান কালও বিবেচনার দাবী রাখে।

সঠিক প্রভাবক সঠিক জনের ওপর সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে লক্ষ্য অর্জন হবেই। সঠিক প্রভাবক পারে সঠিক গুণ বা বৈশিষ্টটিকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলতে। মানবের অন্তহীন গুণকে জাগিয়ে তুলতে জগত জুড়ে রয়েছে অগনিত প্রভাবক ও কিছু তাঁর নিদর্শন। সব খুঁজে পাই না। প্রভাবক এ দেহের ভেতরে রয়েছে। প্রভাবক দেহের বাইরে রয়েছে। এমনকি প্রভাবক রয়েছে ধারণায়।

মানুষকে উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিতকরনে মহাবিশ্বে রয়েছে অগনিত প্রভাবক। নিচে প্রভাবক বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

- **প্রভাবক এবং শিক্ষা ও জ্ঞান :** প্রভাবক হিসেবে শিক্ষা ও জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ উন্নতির যে চরম শিখরে আজ উপনীত হয়েছে বলে বলা হয় তার পেছনে কাজ করেছে শিক্ষা ও জ্ঞান। শিক্ষা মানুষের ভেতর জ্ঞানের প্রবেশ ঘটায়। আবার লব্ধ জ্ঞান পুঞ্জিভূত হয়ে শিক্ষা আকারে ছড়িয়ে পরে। জ্ঞান লব্ধ শিক্ষাকে কাজে লাগাতে মানুষকে ভেতর থেকে তাড়িত বা অনুপ্রাণীত করে। শিক্ষাপ্রদত্ত জ্ঞানের অনুপ্রেরণার ফল মানব জাতির আজকের উন্নতি। আবার পর্যায়ের দিক বিবেচনায় এক পর্যায়ের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী পর্যায়ের জ্ঞান আহরনে মানবকে ভেতর থেকে তাড়িত করে। মানবের যে বৈশিষ্টটি এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে তা হলো অজানাকে জানার আগ্রহ।

শিক্ষা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে কোন একটি বিষয়ের গভীরে নিয়ে যায়। মানুষ বিষয়ের আদ্যোপান্ত যখন জানতে পারে তখন তার নিজের ভেতরেও চিন্তার স্ফুরন ঘটে। ভাবনার ফলস্বরূপ যখন কোন পথ খুঁজে পায় তখন সে নিজেও তার লক্ষ্য পুরনে অনুপ্রাণীত হয়ে ছুটতে থাকে। সে ভবিষ্যত দেখতে পায়। পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয়। নতুন পথের উন্মেষ ঘটে। সৃষ্টিশীলতার পেছনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যখন কোন গভীরের জ্ঞানে প্রবেশ করে তখন যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটি তাকে সাহসী করে তোলে এবং পরবর্তী ধাপে এগুতে তাড়িত করে। শিক্ষা প্রভাবক হয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে চলতে সহায়তা করে।

মানুষের ভেতরের ঘুমন্ত শক্তিগুলিকে জাগিয়ে দিয়ে লক্ষ্যে ধাবিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। তবে কোন প্রভাবকই নিরাকার সৃষ্টিকর্তার ধারণার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এটি সর্বোচচ ও সর্বশেষ মাত্রার, অন্তত বিশ্বাসীর কাছে।

● **প্রভাবক ও সৃষ্টিকর্তা :** যে কোন প্রভাবক একজনের ওপর প্রয়োগ করলে সেটি কাজ করবে না। এক্ষেত্রে যেমন প্রভাবককে বুঝতে হবে তেমনি বুঝতে হবে যার ওপর সেটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাকেও।

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ মানবের মাঝে সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত বা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সফল প্রভাবক হয়ে কাজ করে। তবে এই একই প্রভাবক সকলের ওপর সমভাবে কার্যকরী নয়।

কর্মের শুরুতে যিনি 'আল্লাহ'র নাম স্মরণ করেন তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী। অথচ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও 'ভগবান' নামটি তাকে প্রভাবিত করে না। 'আল্লাহ' নামটি যার ভেতরে উদ্দীপনা, প্রেরণা বা শক্তির সঞ্চার করে 'ভগবান' নামটি তার ভেতরে শক্তি সঞ্চারনে ব্যার্থ। সৃষ্টিকর্তা কিন্তু একজনই। কেবল একটি নামের পার্থক্য। অথচ মানবের সক্ষমতার সহজাত গুণগুলি ভেতরে সততই বিদ্যমান। অতএব বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তাজনিত প্রভাবকের পেছনে আরও কিছু বিষয় আছে যা প্রভাবক হিসেবে আল্লাহ ও ভগবানকে পৃথক করেছে।

প্রভাবক ভালবাসার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে ওঠাতে কাজ করে। ভালবাসা জাগ্রত হলে মানুষ ছুটে চলে। কোন কিছু বা কারও প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপিত না হলে ভালবাসা সৃষ্টি হয় না। প্রভাবকের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও ভালবাসা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কাজ করে।

সৃষ্টিকর্তার ধারণা প্রভাবক হয়ে কাজ করে। তবে সে ধারণায় বিশ্বাসী এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা জগ্রত না হলে সেটি প্রভাবক হয়ে কাজ করবে না। বিশ্বাস গুরুত্বপুর্ন। বিশ্বাস ভালবাসার জন্ম দেয়। আবার ভালবাসাও বিশ্বাসকে গড়ে তোলে।

আরোপিত ধর্মের বিবিধ বিধি-বিধান, নানান কর্মযজ্ঞ, মহামানবদের প্রতি সৃষ্টি করা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা ইত্যাদি সকল কর্মকান্ড মূলত সৃষ্টিকর্তাকে কেন্দ্র করে। এগুলি তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসাকে শক্তিশালী করারই কৌশল

বা প্রয়াস। যা মানবের ভেতরে একবার সৃষ্টি করা সম্ভব হলে পরবর্তীতে লক্ষ্য অর্জনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

- **বিশ্বাসীর ওপর আরোপিত ধর্ম বা কোন দর্শনের প্রভাব :** ওপরে উল্লেখ করেছি যে, সৃষ্টিকর্তাজনিত প্রভাবকের পেছনে আরও কিছু বিষয় আছে যা প্রভাবক হিসেবে আল্লাহ ও ভগবানকে পৃথক করেছে। আল্লাহ্, ভগবান, গড এমনিতর এক একটি শব্দের উচ্চারন কেবল একটি শব্দ বা নামের উচ্চারনই নয়। এর সঙ্গে সম্পর্কিত আছে পৃথক পৃথক কতগুলি জীবন দর্শন, রূপরেখা বা জীবন ব্যবস্থা। এসব দর্শন, জীবন ব্যবস্থা মানব জীবনের জন্য স্বপ্ন তৈরী করে, নানান চিত্রকল্প সহ জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। কিভাবে লক্ষ্য অর্জিত হবে তার পরিকল্পিত ছক ও রূপরেখাও উপস্থাপন করে। আল্লাহ, ভগবান সৃষ্টিকর্তার উচ্চারিত এমনিতর এক একটি নাম মূলত সম্পূর্ন একটি জীবন ব্যবস্থা বা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু বা প্রতীক হয়ে কাজ করে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বিশ্বাসীর মনোজগতে জীবন ও জগত সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্প তুলে ধরে। বিশ্বাসী যখন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে সহায়তা প্রার্থনা করে তখন তার ওপর চিত্রকল্প সম্বলিত ঐ দর্শন প্রভাব ফেলে। মানুষের ওপর দর্শনের এমনিতর প্রভাব ফেলা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নির্দিষ্ট একটি দর্শন সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকে এবং তার প্রদর্শিত পথের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।

বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার অর্থ হলো তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরিপূর্ণ দর্শনের নির্দেশনার প্রতি নিজেকে সমর্পন করা। ফলস্বরূপ বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসকৃত দর্শনের নির্দেশনা তার কর্মের ওপর প্রভাব ফেলে।

এ রহস্যের মূল মানুষের মস্তিস্কের গহীন কোনে লুকিয়ে থাকা কিছু ফাইল। যে ফাইলগুলি নানারূপ চিত্রকল্প সম্বলিত কিছু গল্পকে সেইভ করে রাখে। সেখানে করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনাও থাকে। সৃষ্টিকর্তার ভিন্ন ভিন্ন নামের স্মরণ এসব গল্পের এক একটি ফাইলকে উন্মোচন বা ওপেন করে। জেগে ওঠা ফাইলটি সাময়িক স্মৃতিতে এসে আশ্রয় নেয়। মস্তিস্ক তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি সেখান থেকে পাঠ করে এবং তার নির্দেশনা অনুসরণ করে। কেননা সে উক্ত ফাইলে সেইভ করে রেখে দেয়া রূপকল্পটি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত এবং তার মস্তিস্ক ও অন্তর তথা তার জ্ঞান সে

বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে পূর্ব থেকেই সেসব নির্দেশনার প্রতি সম্মতি দিয়ে রেখেছে। ফলে সে উক্ত রূপকল্প সম্বলিত দর্শনের নির্দেশনার অনুসরণ করে।

আল্লাহ নামের স্মরণে একজনের মস্তিস্কে যে ফাইলটি উন্মোচিত হয়, ভগবান নামের স্মরণে তার ভেতরে আদৌ কোন ফাইল ওপেন হয় না। অর্থাৎ ঐ ফাইলের তথ্য তার ভেতরে নেই। কিংবা অপর্যাপ্ত তথ্য আছে এবং সে বিষয়ে তার অসম্মতিও আছে। ফলে সে কোন নির্দেশনা পায় না বা গ্রহণ করে না। একইভাবে বিপরীতটি ঘটছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দর্শনের পরিপূর্ণ জ্ঞানটি মস্তিস্কে থাকতে হবে। দর্শন সম্পর্কে জানতে হবে। এমনকি সে বিষয়ে তার একটি সম্মতিও থাকতে হবে। এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তবেই প্রতীকী নাম বা আইকনের স্মরণে বা চপের ফলে উন্মোচিত দর্শনের ফাইলটি তার ওপর কাজ করবে বা প্রভাব ফেলতে পারবে। সব প্রভাবক তাই সব কিছুকে উজ্জীবিত করতে পারে না। তার জন্য একটি পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। যে প্রস্তুতির কারনে একটিমাত্র কমান্ডের সঙ্গে সঙ্গে দিক নির্দেশনা সম্বলিত যাবতীয় জ্ঞান তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যাবে। যা তার সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করবে। এর ফলে তার গৃহিত সিদ্ধান্তে দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষীত হবে।

মস্তিস্কে অংকিত গল্প- যেটির সঙ্গে মানুষ পরিচিত, যার দীক্ষায় জীবনাচরনে সে অভ্যস্ত, শিক্ষা ও পরবর্তীতে অভ্যস্ততার কারনে যেটি তার কাছে সহজ বোধ হয়, যেটির কারনে বহু মানুষের সঙ্গে সে সম্পর্কিত, যেটি দ্বারা সে প্রণোদিত বা যার অনুসরণের ফলাফল বিষয়ে সে নিশ্চিত কিংবা যেটিতে সে বিশ্বাস রাখে সে সেভাবে কাজ করে।

ধর্ম মানব জীবনকে দিক নির্দেশনা দেয়। চলার পথ বাৎলে দেয়। লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। মানুষের জন্য করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়। বস্তুত জীবন ও জগত সম্পর্কিত রূপরেখা বা চিত্রকল্প তুলে ধরে নানান দর্শন। আরোপিত ধর্ম বা দর্শনসমুহ জীবনের সামগ্রীক চিত্রকল্পের পাশাপাশি ব্যাক্তি মানুষের ভেতরের সহজাত গুণাগুণগুলিকে বিকশিত করনেও ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সুপ্ত শক্তির জাগরণে ভূমিকা রাখে। যা দর্শন প্রদত্ত চিত্রকল্পের সামগ্রীক রূপরেখার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

আরোপিত ধর্ম বা দর্শন সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভাবক, ধারক, বাহক। সৃষ্টিকর্তার স্মরণজনিত প্রভাব তাই মূলত দর্শনের প্রভাব। অর্থাৎ দর্শন প্রদর্শিত পথ বা নির্দেশনার প্রভাব, যা তাকে নির্দিষ্ট পথে চলতে সহায়তা করে।

বিশ্বাস শক্তিশালী হলে দর্শন মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাই কোন নির্দিষ্ট দর্শন বা ধর্ম যদি সত্যিকার অর্থে সঠিক পথ প্রদর্শন করে, তবে তা বিশ্বাসীকে সঠিক পথেই চালনা করে।

● **প্রভাবক ও বোধসমুহের জাগরণ :** মানুষের অনেক প্রকারের বোধ আছে। প্রভাবক মানুষের অনুভব, অনুভূতি ও বোধগুলিকে নাড়া দেয়। বোধে নাড়া পরলে মানুষ নড়েচড়ে বা জেগে ওঠে। অর্থাৎ বোধদয় ঘটে। বোধের উদয়ের ফলে চলার শক্তি পায়।

নানান রকমের বোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, অহংকারবোধ, লজ্জাবোধ, মর্যাদাবোধ ... ইত্যাদি। বোধগুলি দেহ নয় ধারণা। এ বোধগুলিকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের জন্ম। এগুলি মানুষের সহজাত ধর্মের অন্তর্গত বিষয়। সৃষ্টির শুরুতে বিদ্যমান এ বোধগুলি প্রস্ফুটিত, বিকশিত বা ধারালো হতে থাকে পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মিথস্ক্রিয়ার ফলে। প্রভাবক এই বোধগুলিকে ক্রিয়াশীল করার মাধ্যমে দেহকে নানানভাবে আলোড়িত করে। ফলে মানুষ সচল হয়।

প্রভাবক এক একটি বোধকে নাড়া দিয়ে সম্ভবত মস্তিস্কের সুনির্দিষ্ট স্থানগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। কিংবা বলা যেতে পারে যে প্রভাবক মস্তিস্কের নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে নাড়া দিয়ে এক একটি বোধকে জাগিয়ে তোলে। বোধগুলির জন্য সম্ভবত মস্তিস্কে সুনির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ রয়েছে। বোধে নাড়া পরলে হৃদয় আন্দোলিত হয়। হৃদয় আন্দোলিত হলে মানুষ নড়েচড়ে ওঠে। দেহ সচল হয়। একবার জাগিয়ে তোলা সম্ভব হলে মানুষকে দিয়ে অসাধ্য সাধন সম্ভব। মানুষকে নড়ে চড়ে ওঠাতে পারাটিই গুরুত্বপূর্ণ। এটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। যেমন কঠিন কাজ ছিল কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে তোলার বিষয়টি। যে দেখতে পায় ভেতরকে সে বাহিরেও দেখতে পায়।

প্রভাবকের কারনে ভেতরের কোন বোধে নাড়া পরলে মানুষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বোধগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মস্তিস্কে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। উত্তাপ হৃদয় তথা দেহকে সচল করার জ্বালানী হয়ে কাজ করে। বোধের উত্তেজনার কারনে কাজের উপযোগী প্রয়োজনীয় গুণাগুণ বা বৈশিষ্টগুলি মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে বা জাগিয়ে ওঠাতে হয়। সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেই উদ্যোগী বা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। গুণসমুহের মধ্যে এক এক প্রকারের কার্যক্ষমতা বা কর্মশক্তি সঞ্চিত থাকে। এ শক্তি

দেহকে কাঙ্খিত দিকে চালনা করে। কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ন কাজটি সম্পাদিত হয়। ফলস্বরূপ আমরা মানুষের বিভিন্ন রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট বা কার্যক্ষমতাকে ফুটে উঠতে দেখি। পরিশেষে এই গুণগুলির মধ্যেই মানুষের সর্বময় ক্ষমতা নিহিত। তাইতো সৃষ্টিকর্তাকেও আমরা তাঁর গুণ দিয়ে বিচার করি।

মানুষ যখন জেগে ওঠে সে স্থির থাকে না। সে তার সহজাত ধর্মের রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে। এ সময়ে তার সম্মুখে চলার পথের কোন রূপরেখা না থাকলে সে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিংবা তার উজ্জীবিত শক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে অপচয় হবে।

মানুষকে জাগিয়ে তোলার পূর্বে তাই কিছু প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। সে কারনে প্রয়োজন দিক নির্দেশনা। যা বোধের উজ্জ্বীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে চলার পথ দেখিয়ে দেবে। তাই কোন দর্শনের আদর্শে পূর্ব থেকে মানুষকে গড়ে তোলা সম্ভব হলে সে যখন জেগে ওঠে, তখন দর্শনের দেখানো পথ ধরে চলতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ একটি পথ খুঁজে পায় এবং একটি লক্ষ্যে পোঁছে।

মানুষের সম্মুখে জীবন সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার পাশাপাশি ব্যাক্তির ভেতরের মানসিক অবস্থাটিও গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন বা আরোপিত ধর্ম মানুষের জন্য ব্যাহ্যিক দিক থেকে চলার পথের একটি রূপরেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু রূপরেখা অনুযায়ী চলতে ভেতর থেকে উদ্দীপ্ত করে ক্রিয়াশীল বোধ। বোধকে নাড়া দেয় প্রভাবক। কোন আরোপিত ধর্ম বা দর্শনে বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা সফল প্রভাবক হয়ে কাজ করে। বিশ্বাসীর জন্য সৃষ্টিকর্তা সফল প্রভাবক হয়ে ওঠার পেছনে ধর্মীয় জীবন দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় দর্শনের পথ নির্দেশনার কারনে বিশ্বাসীর ওপর সৃষ্টিকর্তার স্মরণ তার কর্মে কি প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়টি নিচের আলোচনার মাধ্যমে কেবল অনুধাবন করার চেষ্টা করবো।

১. মানুষ কোন করণীয় নির্ধারণের পূর্বে কিছু ঘটনা থাকে। সে ঘটনা তাকে কর্মে লিপ্ত হতে উদ্দীপ্ত করে। পূর্বের ঘটনা প্রকৃতিতে দৈব বা আকস্মিকভাবে হতে পারে আবার কারও দ্বারা পরিকল্পিতভাবেও সৃষ্ট হতে পারে। ফলে প্রভাবকের প্রথম উপস্থিতি মূলত পূর্বের ঘটনার মধ্যে নিহিত। যা তাকে প্রথম উদ্দীপ্ত করে। যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাকে পরবর্তী কাজে নিয়োজিত হতে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম ঘটনাটিকে তবে কে উদ্দীপ্ত করে?

মানুষ আজ পৃথিবীতে নানান কাজে ব্যাস্ত। এর শুরু কোথায়? একটি ঘটনা বা গল্প দিয়ে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করি। মনে করি আদম ও হাওয়া নামক দু'জনের বসবাস ছিল স্বর্গে। শয়তান তাদের প্ররোচিত করলো একটি নিষিদ্ধ ফল খেতে। ফলে তাদের বংশধরেরা এখন পৃথিবীতে। শয়তান দ্বারা তারা প্ররোচিত বা প্রভাবিত হয়েছে। শয়তান তাদের কোন একটি বোধে নাড়া দিয়েছে। বঞ্চিতিবোধ। ফলে শয়তান হচ্ছে আপতদৃষ্টে প্রথম প্রভাবক। প্রশ্ন হচ্ছে শয়তানকে কে প্ররোচিত করেছে? এ চক্রের শুরু কোথায়? এ আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। কেবল বিষয়টিকে এখানে যেভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি সেটি বলার সুবিধার্থে এতটুকু আলোচনার অবতারনা করা হলো।

আলোচনায় ফিরে আসি। প্রথম ঘটনাটি প্রভাবক হয়ে মানুষের কোন বোধে নাড়া দেয়। বোধে নাড়া দিয়ে সে পরবর্তী কাজে মানুষকে ঠেলে দেয়। পরবর্তী কাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে মানুষ করণীয় বিষয়ে পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনামাফিক চলতে গিয়ে বিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। এ স্মরণ আবার তার বা বিশ্বাসীর পরবর্তী কাজের প্রভাবক হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক বা প্রয়োজনীয় বোধগুলিকে উদ্দীপ্তকরনে কাজ করে। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি কাজই এ চক্রে আবদ্ধ। অভ্যস্ততার কারনে কিংবা প্রয়োজনীয়তা বোধ না করার কারণে প্রতিটি বিষয়কে আমরা এভাবে বিশ্লেষন করে ভেবে দেখি না। আবার সবার জন্য এভাবে ভাববার প্রয়োজনও নেই। তাহলে জগত চলবে না। এগুলি ভাববে অনুসন্ধানি মন।

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ করণীয় নির্ধারণে পূর্বেই গৃহিত একটি দর্শনের নির্দেশনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। স্মরণ দর্শনের শিক্ষাকে সার সংক্ষেপ করে স্মৃতিতে নিয়ে আসে। অর্থাৎ দর্শনের আদেশ নিষেধ, করণীয় বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়গুলিকে। দর্শনের শিক্ষা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে মস্তিস্ক বিচার বিশ্লেষণ বা তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের কাজটি করে। সিদ্ধান্ত গ্রহনে জীবন সম্পর্কিত ব্যাক্তির গ্রহণকৃত দর্শন তার ওপর প্রভাব রাখে। দর্শনের শিক্ষা প্রভাব রাখতে পারে পূর্বস্থাপিত বিশ্বাসের কারনে। কেননা বিশ্বাসী দর্শনের সকল দিক নির্দেশনায় নিজেকে পূর্ব থেকেই সমর্পন করে রেখেছে।

করণীয় বিষয়ে দর্শনের অনুমোদন পেলে নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়টি তার ভেতরে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে। কেননা দর্শন বিশ্বাসীকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের শিক্ষায় গড়ে তোলে। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তাকে করণীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তার ভেতরে নতুন মাত্রার শক্তি সঞ্চার করে, স্বতস্ফুর্ততার সঙ্গে কাজে লিপ্ত হতে উদ্দীপ্ত করে, কর্মস্পৃহা বা কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিশ্বাসী জানে সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুনিশ্চিত কিছু ফলাফল আছে। ঠিক যেমন জাগতিক কর্মকান্ডে প্রতি বছর শেষে চাকুরীদাতা বা সাহায্যদাতার নির্দেশনা পালনের কিছু ভাল ফলাফল প্রাপ্তির আশা থাকে তেমন। এ প্রেরণা কর্মে সফল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পার্থিব জগতে যার আকর্ষনীয় সাহায্যদাতা নেই তার জন্য আছে সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রতকরনের মাধ্যমে বিশ্বাসীকে উদ্দীপ্ত করে। কর্মে উদ্দীপনা মানুষকে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। পাঠক, আলোচনাটি কেবলমাত্রই একটি উদাহরণ যা বিষয়টিকে যেভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছি যেন সেটি বুঝতে সহায়তা করে।

২. আদর্শগতভাবে আরোপিত ধর্ম বা দর্শন বিশ্বাসীকে ন্যায় পথে চলার শিক্ষায় গড়ে তোলে। ফলে সমগ্র দর্শনের প্রতীকরূপি সৃষ্টিকর্তার স্মরণ বিশ্বাসীর মাঝে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ন্যায়বোধের জাগরণ সৃষ্টি করে। ন্যায়বোধ সকল সময়ে সকল মানুষের মধ্যে ভেতর থেকে প্রচন্ড শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করে। এ শক্তি লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসকে বেগবান করে। ভেতরের এ গতি বিশ্বাসীকে সফলতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন বিষয়ে ন্যায়ের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ সাধারণ বা বঞ্চিত মানুষের অকুন্ঠ সমর্থন লাভেও সহায়তা করে। যা সফলতার পেছনে সহায়ক হয়ে কাজ করে।

৩. কর্মে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিশ্বাসী যখন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে, সে মূলত এ স্মরণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাঁকে সাক্ষী রেখে অন্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রেখে করা প্রতিজ্ঞা থেকে বিশ্বাসী কখনই বিচ্যূত হতে চায় না। এটি লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত না হওয়ার ক্ষেত্রে মনের জোরকে শক্তিশালী করে। বস্তুত এর মাধ্যমে বিশ্বাসী নিজেই নিজেকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত হতে দেয় না। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কাজে লেগে থাকে।

আন্তরীকভাবে করা প্রতিজ্ঞা মানুষকে তার লক্ষ্যে অবিচল রাখে। দৃঢ়তা দেয়। এটি ধৈর্য্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত। দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজে লেগে থাকাই মূলত কর্মে সফলতা এনে দেয়। বস্তুত মানুষ নিজেই নিজেকে সাহায্য করে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যশক্তি অর্জনের মাধ্যমে। সৃষ্টিকর্তা সরাসরি কোন সহায়তা করেন না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রাখার বিষয়টি আন্তরিকতাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে প্রেরণা হয়ে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তা কাজ করে প্রভাবক হয়ে। তবে এটি কাজ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর ওপর।

৪. বিশ্বাসী বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা তার সকল কর্মের সাক্ষী। সৃষ্টিকর্তা সবকিছু দেখেন, শুনেন এবং জানেন। একদিন তার কাছে মানুষকে ভাল-মন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি হতে হবে। এ ধারণার কারনে তার ভেতরে মানসিক ও আচরনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এমন বিশ্বাসের কারনে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। লক্ষ্যার্জন না হওয়া পর্যন্ত সর্বান্তকরনে আন্তরীক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ চেষ্টাই তাকে সাফল্যের দুয়ারে নিয়ে যায়। মূলত মানুষের নিজের কর্ম প্রচেষ্টাই তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কল্পনায় সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ভিন্ন বিশ্বাসী প্রচেষ্টার সে পর্যায়ে সহজে পৌঁছাতে পারে না। এখানেই সৃষ্টিকর্তার মহাত্ম!

৫. বিশ্বাসী বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা তার সকল কর্মের সাক্ষী। সৃষ্টিকর্তা সবকিছু দেখেন, শুনেন এবং জানেন। একদিন তার কাছে মানুষকে ভাল-মন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি হতে হবে। এমন বিশ্বাসের কারনে সে মন্দ বা কোন প্রকার অন্যায় কাজে নিজেকে জড়াতে পারে না। তার ভেতরে মানসিক ও আচরনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যায় ও মন্দ থেকে দুরে থাকতে পারার মানসিক সক্ষমতা বাস্তব জীবনে সফলতার জন্য সহায়ক ও পূর্বশর্তও বলা যেতে পারে। কল্পনায় সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি বিশ্বাসীকে সৎ ও সুপথে চলতে প্রেরণা দান করে। এখানেই সৃষ্টিকর্তার মহাত্ম!

৬. কাজে সফলতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হচ্ছে আন্তরীকতা। এটিই নিয়ত। নিয়ত হতে হবে সত্যনিষ্ঠ। দুর্বল নিয়ত বা দুর্বল প্রত্যাশার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে আকাংখায় ঘাটতি। আকাংখার ঘাটতি প্রচেষ্টার ঘাটতিকে নির্দেশ করে।

প্রচেষ্টায় ঘাটতি থাকলে কখনই সফল হওয়া সম্ভব নয়। কাজে সফলতা প্রাপ্তি ও আন্তরীকভাবে চাওয়ার মধ্যে যোগসূত্রটি প্রচেষ্টার মাধ্যম হয়ে ক্রিয়া করে।

বিশ্বাসী যখন কোন কিছু অর্জনের প্রত্যাশায় স্রষ্টাকে সত্যিকারভাবে অন্তর থেকে স্মরণ করে, সেটি মূলত তার আন্তরীক চাওয়াকে নির্দেশ করে। সে মূলত এর মাধ্যমে তার সমস্ত শক্তিকে সত্যিকারের নিয়তবদ্ধ কাজে কেন্দ্রিভূত করতে সচেষ্ট হয়। কর্মে আন্তরীকতার সঙ্গে সর্বশক্তির প্রয়োগই সফলতা এনে দেয়। কিন্তু বিশ্বাসীর মনোজগতে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি তাকে ভিন্ন মাত্রার প্রেরণা দান করে।

৭. সৃষ্টিকর্তা আদর্শ ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানের নির্দেশক। ত্রুটিহীন, বিচ্যুতিহীন। তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে বিশ্বাসী যখন তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে, এর মাধ্যমে সে মূলত নিজেকে তাঁর সান্নিধ্যে দেখতে চায় এবং দেখতে পায়। স্মরণকারী তার মনোজগতে নিজেকে উচ্চ আদর্শ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে দেখতে শিখে। এটি নিজেকে নিজে সন্মান করতে শেখায়। বিশ্বাসী নিজের মর্যাদাপূর্ণ এ অবস্থানকে শেষ অবধি ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে। ফলে নিজ জ্ঞানে সত্য ও সঠিক পথে কোন প্রকার পরাজয়কে বরণ করে নিতে চায় না। মানসিক দৃঢ়তা কাজ করে। এর অপর অর্থ হচ্ছে শেষ অবধি আন্তরীকতার সাথে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। বিশ্বাসীর মানসিক এ অবস্থা তাকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। বিশ্বাসীর কাছে সফলতা অর্জনের জন্য সৃষ্টিকর্তার স্মরণ তাই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. সৃষ্টিকর্তা চরম সত্য ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক। যে মানুষ সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখে তার অন্তর তাকে ঐ মাত্রায় দেখতে চায় এবং দেখতে পায়। ফলে নিজেকে উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রার দিকে পরিচালনা করার প্রেরণা পায়। লক্ষ্য যখন উচ্চে হয় মানুষ তখন নিজের সক্ষমতার পূর্ণ মাত্রার প্রয়োগ বা প্রচেষ্টার সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হতে পারে বা হতে সচেষ্ট হয়। এটি মানুষের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার সামর্থকে জাগ্রত করে। লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রয়োগই মানুষকে কাজে এগিয়ে নিয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তার ধারণা সকল বিষয়গুলিকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে ও রাখে।

৯. সৃষ্টিকর্তার স্মরণ বিশ্বাসীকে তাঁর নির্দেশিত পথের সীমার মধ্যে অবস্থান করার বিষয়ে দর্শনের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সীমার মধ্যে অবস্থান করার কারনে সে মন্দ বা ভূল কাজ করা থেকে বিরত থাকে। যা তার লক্ষ্যে পৌঁছুবার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলিকে দুর করার জন্য সহায়ক। উপরন্তু সে নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল থাকে। ফলে অপরের মিথ্যে অপবাদ বা বিরূপ সমালোচনাও তাকে বিচলিত করতে পারে না। অবিচল মানসিক অবস্থা মানুষকে দৃঢ়তা দেয়। দৃঢ়তার সাথে কর্মে লেগে থাকা সফলতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে কাজ করে। সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসীর জন্য ধারণাগত এক প্রেরণা হয়ে কাজ করে।

১০. সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পনের অন্য অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসকৃত আরোপিত ধর্ম বা দর্শনে নিজেকে সমর্পন করা। অন্যভাবে বলা যায়, জ্ঞানত নিজের বিশ্বাসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন। অর্থাৎ নিজ জ্ঞানে নিজের ওপরেই বিশ্বাস। যার অপর নাম আত্মবিশ্বাস।

সৃষ্টিকর্তা কে বা কোথায় আছেন, কি তাঁর রূপ কেউ এসব জানে না। তাঁকে যতই স্মরণ করা হোক না কেন তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে কোন সহায়তা প্রদান করেন না। মানুষকে তার নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়।

সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা বাস্তবে মানুষকে নিজের ওপরেই নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নির্ভরশীল হতে শেখায়। এটি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে। এ দুটি গুণ ছাড়া মানুষ সফলতার মুখ দেখবে না। সৃষ্টিকর্তার স্মরণের মাধ্যমে গুণগুলি কেবল কৌশলে জাগিয়ে তোলা হয়।

১১. অহংকার বা দম্ভপূর্ণ আচরণ সব সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ বিশ্বাসীকে নমনীয় হতে ও থাকতে সহায়তা করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীর দর্শন তাকে তার আচরণে নম্র হতে শিক্ষা দেয়, দম্ভ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। নম্র আচরণ কর্ম ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগীতা প্রাপ্তিকেও সহজ করে দেয়। এসব গুণ ও আচরণ সফলতার সহায়ক বা পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। যা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণের মাধ্যমে দর্শনের শিক্ষা দ্বারা ব্যাক্তি নিজেই নিজেকে সদা সচেতন ও সতর্ক করে রাখে।

১২. বিশ্বাসীর কাছে সৃষ্টিকর্তা অতি প্রিয়জন। অতি মর্যাদাসম্পন্ন। তাকে মানসপটে হাজির রেখে সে কখনই কোন কাজে হেরে যেতে চায় না। কেননা এতে সে সৃষ্টিকর্তারই পরাজয় দেখতে পায়। যা সত্যিকারের বিশ্বাসী কখনই হতে দেবে না। নিজেকে উৎসর্গ করে হলেও সে সৃষ্টিকর্তাকে সমুন্নত রাখবে। দর্শনের শিক্ষা তাকে সেভাবে গড়ে তোলে। পরাজয় বরণ করতে না চাওয়ার মানসিকতা বস্তুত বিশ্বাসীকে প্রচেষ্টার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে সাহায্য করে। যা তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। সৃষ্টিকর্তা কেবলই প্রভাবক। তবে যে বোঝে সে জানে যে সৃষ্টিকর্তাই বস্তুত সব করেন।

১৩. সৃষ্টিকর্তা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই মানুষকে সাহায্য প্রদান করেন। বিশ্বাসী বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও এ বিশ্বাসের কারনে তাঁর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করে। সে জানে সৃষ্টিকর্তা সাহায্য প্রদানে সক্ষম। তিনি চাইলেই সাহায্য প্রদান করবেন। এটি বিশ্বাসীর ভেতরে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে। বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও এটি হাল ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাসীর মর্যাদাবোধকে ভূ-লুন্ঠিত হতে দেয় না। উপরন্তু সমুন্নত রাখতে শেখায়। মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার বিষয়টি ভেতরে দৃঢ়তা এনে দেয়। সে নিজেই নিজেকে পরাজিত হতে দিতে চায় না। এটি আপ্রাণ প্রচেষ্টার নির্দেশক হয়ে কাজ করে, যা মানুষকে সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১৪. সৃষ্টিকর্তা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাসীর সঙ্গে রয়েছেন বা বিশ্বাসী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর সান্নিধ্যে আছে ভাবনাটি তাকে সাহসি করে তোলে। এটি অবুঝ এবং সন্দেহহীন বিশ্বাসীর অন্তরে প্রচন্ড সাহস সঞ্চার করে। জ্ঞানীর ভেতরেও সাহসের সঞ্চার করে, যদিও জ্ঞান ও যৌক্তিকতায় দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে মানুষকে এগিয়ে নিতে সাহস সহায়তা করে। বিপদে বিচলিত হওয়া থেকেও সাহস মানুষকে রক্ষা করে। শান্ত মস্তিস্কে কাজ করতে সহায়তা করে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সাহস ভূমিকা রাখে। সাহস বিশ্বাসীকে ভয় সংশ্লিষ্ট নানাবিধ মানসিক জঞ্জাল থেকে রক্ষা করে। যেসব জঞ্জাল কর্ম সম্পাদনকে সাধারণত পিছিয়ে দেয়। সাহস বাঁধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে ভূমিকা রাখে। নম্রতা ও যৌক্তিকতা সাহসের ভিত্তি হয়ে কাজ করে। যা অধিকাংশ জটিল

কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে সহায়তা করে। হৃদয়ের ভেতরে সাহস সঞ্চারনে সৃষ্টিকর্তার ধারণা সফল প্রভাবক হয়ে কাজ করে।

১৫. বিশ্বাসী বিশ্বাস করে সকল উপায় সৃষ্টিকর্তার অধীন। তিনিই পথ দেখান। তাঁর কাছে সব উপায় আছে। বিপদে কোন উপায় প্রাপ্তির বিষয়ে তাঁর সক্ষমতায় বিশ্বাস রাখা বিশ্বাসীকে সব পর্যায়ে উপায়ের সন্ধান করতে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। বস্তুত এ বিশ্বাসের কারনে বিশ্বাসী নিজেই নিজের উপায়ের সন্ধান করতে থাকে শেষ অবধি। হাল ছেড়ে দেয় না। কেননা সে বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা তাকে একটা উপায় প্রদর্শন করবেন। অবিরাম উপায়ের সন্ধানের প্রচেষ্টা পথের সন্ধান দেয়। ধৈর্য্য ও অব্যাহত প্রচেষ্টাই মানুষকে সফলতা এনে দেয়, সৃষ্টিকর্তা নয়। তবে যে বোঝে সে জানে যে সৃষ্টিকর্তাই সব করেন।

১৬. কর্মে সফল হতে প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন যোগ্যতা। যার নিয়ত সত্য সে লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। মূলত নিজ প্রচেষ্টা ও অর্জিত যোগ্যতা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। নিয়ত আন্তরীক হলেই মানুষ লক্ষ্যের পানে ধাবিত হতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। যোগ্য হয়ে উঠলেই মানুষ কাজে সফল হয়। নিয়তের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠায় সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসীর ওপর কাজ করে প্রভাবক হয়ে। যোগ্যতা সরাসরি কোন বোধ নয়। তবে মানবের সন্মানবোধ, মর্যাদাবোধ ইত্যাদি হয়ে যোগ্যতার বিষয়টি কাজ করে। এটি তার মর্যাদাবোধ রক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতি বলা চলে। অর্থাৎ একটি বোধ আরও কিছু কাজের সম্পাদন বা পূর্বশর্ত পুরনের বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবি করে তোলে।

১৭. সৃষ্টিকর্তার ধারণায় রয়েছে কতগুলি নাম। নামগুলি বস্তুত তাঁর গুণের প্রকাশ। গুণগুলি যাবতীয় শক্তি বা সক্ষমতার প্রতীকী নাম। সকল গুণের মূল উৎস সৃষ্টিকর্তা। যা প্রবাহিত হয়েছে প্রাণের মধ্য দিয়ে। তাই প্রাণীকূল নানান গুণে কিঞ্চিৎ পরিমানে গুণান্বিত। যা মানবেরও অন্তরস্ত সহজাত গুণের নামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

সৃষ্টিকর্তার কোন নাম বা গুণের আরাধনা বা স্মরণ মানুষের ভেতরে সুপ্ত সহজাত সেই একই গুণটিকে জাগ্রতকরনের একটি উপায় হয়ে কাজ করে। তাঁর কোন একটি নামের স্মরণ বস্তুত মানুষের অতি প্রত্যাশিত সেই গুণেরই স্মরণ। বস্তুত মানুষ

নিজে সে গুণে গুণান্বিত হতে চায়। গুণান্বিত হয়ে কিছু অর্জন করতে চায়, যা অর্জনে ঐ গুণটি অধিক মাত্রায় প্রয়োজন।

যার চাওয়া আন্তরীক সে চেষ্টা সাধনা করে। এ সাধনাই তাকে গুণে গুণান্বিত করে। মূলত নিজের ইচ্ছে শক্তিটাই এখানে বড় হয়ে কাজ করে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ তার ভেতরের গতিকে বৃদ্ধি করে। অর্জিত গুণ তাকে তার প্রার্থীত কর্মে সফল হতে সহায়তা করে। এগুলি ক্রিয়া করে সৃষ্টিকর্তায় সত্যিকার বিশ্বাসীর ভেতরে।

১৮. আরোপিত দর্শন বিশ্বাসীকে দর্শনের শিক্ষায় অবিচল থাকতে নির্দেশ করে। দর্শন তাকে মন্দ পরিহার করে চলার শিক্ষা দেয়। ফলে বিশ্বাসীর অন্তর মন্দ কাজের বিষয়ে যোগাযোগ পরিহার করে চলে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণের মাধ্যমে বিশ্বাসী নিজেকে মন্দ থেকে দুরে রাখার মানসিক শক্তি পায়। সৃষ্টিকর্তার ভয়ও মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা রাখে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ সহজাত ধর্মের ঋনাত্মক শক্তিগুলিকে অবদমনে সহায়তা করার মাধ্যমে সফলতা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

১৯. মানুষের নিজের বিচার ব্যবস্থা কখনও তাকে এই বলে জানান দিতে পারে যে, সে অপরাধী বা অন্যায়কারী। কিংবা নিজের অজান্তেও মানুষের কোন ভূল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। এমন ভাবনা মানুষের নিজের ভেতরে একটি অপরাধের বোধ গড়ে তুলতে পারে। ফলস্বরূপ অনুশোচনা করার ইচ্ছে হতে পারে। মনের এ অবস্থা থেকে জীবদ্দশায় মানুষের পরিত্রানের উপায় কি?

বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্তা ক্ষমা প্রদানের অধিকার রাখেন। এমন বিশ্বাসের কারনে সে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার মাধ্যমে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুত সে যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন এর মাধ্যমে নিজেই নিজের ভেতরে একটি বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে নেয়। নিজেই নিজের বিচার করে। এ বিচার ব্যাবস্থার মাধ্যমে সে নিজেই নিজেকে কিছুটা ছাড় দেয়। অর্থাৎ সে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে অতএব তার ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলে নিজেকে বুঝ দেয়। বিশ্বাসী অপেক্ষা করে পরবর্তী বা শেষ বিচারের জন্য। এর ফলে তার অন্তর কিছুটা অবকাশ পায়। অনেকটা জামিন পাওয়ার মত। নিজেই নিজের জামিনদার হয়। এর মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে হলেও তার যন্ত্রনার কিছুটা উপশম হয়। কেননা সে ভাল কাজের মাধ্যমে তার ত্রুটি দুর করতে চায়।

এ ব্যাবস্থা মানুষকে নতুনভাবে উদ্যমী হতে শিক্ষা দেয়। ভেতরে আশার সঞ্চার করে। এ উদ্যাম পরবর্তী কাজকে গতিশীল করতে ভূমিকা রাখে। মূলত যেখানেই সৃষ্টিকর্তার ভাবনা আসে, সেখানে সে নিজেই নিজের জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা দাড় করায় বা করাবার শক্তি পায়। বস্তুত সে কোন একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেকে নিজে বলিয়ান করে গড়ে তোলে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থা থেকে সকলেই উপকৃত হতে পারবে না। এ ব্যবস্থা থেকে উপকার পেতে হলে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত উপলব্ধিবোধের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। যে পর্যায়ে পোঁছালে কাউকেই সনদ প্রদান করে বলে দিতে হবে না যে, সে এ পর্যায়ে পোঁছেছে। এ পর্যায়ে পোঁছালে নিজের অন্তরই নিজেকে আত্মবিশ্বাসী বলে জানান দেবে বা স্বীকৃতি দেবে! এটি কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না।

২০. সৃষ্টিকর্তার স্মরণ বিপদে অসহায়ের ভরসা বা আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ স্মরণ বিপদগ্রস্তের অন্তরের অন্তস্থলে তাঁকে হাজির রাখে। এ উপস্থিতি শারীরিক নয় মানসিক। অন্তরে তাঁর সার্বক্ষনিক এ উপস্থিতি বিপদে, পরাজয়ে, অসহায়ত্বে, লজ্জায়, অপমানে, শংকায়, একাকিত্বে মহাশূন্যের মাঝে বিশ্বাসীকে যেন আশ্রয় প্রদান করে। বস্তুত বাস্তবে কেউই আশ্রয় দেয় না। এ আশ্রয় স্থল মনের অনেক গভীরে বিরাজ করে। বাহির থেকে দেখা যায় না। সৃষ্টিকর্তাকে মাধ্যম ধরে মানুষ নিজেই নিজেকে আশ্রয়ের প্রশান্তি দেয়। এটি এ কারনে সম্ভব হয় যে, সত্যিকারের বিশ্বাসী নিজের ভেতরে স্রষ্টার সান্নিধ্য অনুভব করে এবং তাতে একাকার হয়ে যায়। এটি তার ধ্যান-জ্ঞানে পরিনত হয়। যখন সত্যিকারভাবে মানুষ আশ্রয়ের প্রশান্তি পায়, তখন সৃষ্টিকর্তা ও নিজের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। নিবিড় ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। মানুষ নিজেই নিজেকে গুণে গুণান্বিত করে তোলে।

এ আশ্রয়ের অপর অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে পুনরায় হাল ধরতে উদ্বুদ্ধ করা। বিকল্প পথের সন্ধান করতেও এটি উদ্বুদ্ধ করে। অন্তরে শক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। হতাশা কিংবা পরাজয়ের পরেও মানুষকে পুনর্বার হাল ধরতে সক্ষম করে তোলে। চরম দুর্যোগের মাঝেও মানুষকে আশার আলো দেখায়। বিপদে আশ্রয় দেয়। সান্তনা দেয়। পথ দেখায়।

ধারণায় এ আশ্রয়স্থল সর্বোচচ ও সর্বশেষ মাত্রার। যার পরে এ জগতে দর্শনের দিক থেকেও ভরসার আর কোন স্থান নেই। অন্তত বিশ্বাসীর কাছে।

ব্যার্থ হলেও বিশ্বাসী জানে সৃষ্টিকর্তা তার সর্বশেষ আশ্রয়দাতা। আশ্রয়ের আধার। মহাশক্তি ও ক্ষমতার আধার। নিঃশেষেও সে তারই সঙ্গে মিলিত হবে। সেখানেও সে প্রশান্তি ও আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে। চরম বিপদেও একাকী বোধ করে না। সাহস উজ্জীবিত থাকে। অতঃপর নিঃশেষ হয়ে গেলেও জানে যে, এ নিঃশেষ সুনিশ্চিত। যা সকলের জন্যই অবধারিত। সুনিশ্চিত সে নিঃশেষটি তার ভালবাসার প্রত্যাশিত স্থানের দিকে ন্যায়ের পথে হয়েছে। নিঃশেষেও তৃপ্তি। বিশ্বাসীর জন্য সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও সান্নিধ্য সকল পরিস্থিতিতে চিরকালের জন্য শুধুই পরিতৃপ্তির।

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমুহ প্রশান্তি লাভ করে।" (আল-কোরআন ১৩:২৮)

ওপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কোন কাজে সফলতা প্রাপ্তির সঙ্গে মূলত সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর স্মরণের বিষয়টির সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। সৃষ্টিকর্তা সরাসরি এসে মানুষকে তার কাজে কোনরূপ সহায়তা করেন না। তবে সরাসরি সম্পর্ক আছে কর্ম প্রচেষ্টা, যোগ্যতা, দক্ষতা, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, মনবল, সাহস, উদ্যম, প্রেরণা ইত্যাকার প্রয়োজনীয় কিছু গুণাবলীর উপস্থিতির সাথে। অক্সিজেন উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড যেমন প্রভাবকের কাজ করে, সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা এখানে অনেকটাই তেমন। অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যাতিত অক্সিজেন উৎপাদন হবে না, যদিও তার কোন ক্রিয়া-বিক্রিয়া নেই।

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ মানুষকে তার গ্রহণকৃত দর্শন নির্দেশিত পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। যা বিশ্বাসীর ভেতরের প্রয়োজনীয় গুণাবলিকে বেগবান করে। কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ দর্শন নির্দেশিত শিক্ষার কারনে তার কোন না কোন বোধকে নাড়া দেয়। সে বোধ তার প্রয়োজনীয় সুপ্ত গুণগুলিকে জাগ্রত করে তোলে। ফলে মানুষ ছুটে চলার শক্তি অর্জন করে।

ওপরে যেসব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রেই সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসীর জন্য প্রভাবক হয়ে কাজ করে। প্রভাবক হয়ে সে কোন বোধকে তাড়িত

করে। দায়িত্ববোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ ইত্যাদি। যেমন- প্রভাবক সাহসকে উজ্জীবিত করে। সরাসরি সাহস কোন বোধ নয়। তবে সাহস দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বা কখনও ভালবাসা বা মমত্বের বোধের কারনে জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। সরাসরি এটি কোন বোধ নয়। তবে এটি ব্যাক্তির মর্যাদার বোধের সাথে সম্পর্কিত। এমনিভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ্যভাবে কোন না কোন বোধ মানুষকে উজ্জীবিত করতে পেছন থেকে কাজ করে চলেছে। যা তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং তার আচরণ ও কর্মে প্রভাব ফেলে। এজন্য অবশ্য আরোপিত দর্শন ও তার নির্দেশনায় পূর্বস্থাপিত ‘বিশ্বাস’ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কাজ করে। বিশ্বাসের কারনেই সৃষ্টিকর্তার স্মরণ বিশ্বাসীর সকল কর্মে কার্যকরি হয়ে ওঠে।

ওপরে আলোচিত উদাহরণগুলি সব বা শেষ নয়। সর্বক্ষেত্রেই এসব যুক্তি বা বিশ্লেষনগুলিই কাজ করে বা করবে বিষয়টি তেমন নয়। বিশ্বাসীর ওপর সৃষ্টিকর্তার স্মরণ কিভাবে কাজ করবে এটি খুব সহজেই বলে দেয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। এটি পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের বিশ্বাস ও ধরণের ওপরও নির্ভর করে। যেমন- যিনি স্মরণ করেন তিনি কি কারনে স্মরণ করছেন তার ওপরেও নির্ভর করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা স্মরণকারীর ওপর একভাবে কাজ করতে পারে। আবার ভ্রমণে বেড় হওয়ার সময় সেটি আরেকভাবে কাজ করতে পারে। একজন পরীক্ষার্থীর ভেতর সৃষ্টিকর্তার স্মরণের বিষয়টি আরেকভাবে কাজ করতে পারে। আবার যিনি স্মরণ করেন তার শিক্ষাটি কেমন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একজন ‘বিশ্বাসী গবেষক’ এবং একজন ‘বিশ্বাসী দিনমজুর’ এর মধ্যে বিষয়গুলি একইভাবে কাজ নাও করতে পারে। এমনকি মানসপটে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণাটিও দু’জনের দু’রকম হতে পারে। ফলে ওপরে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা কেবলমাত্র একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করার জন্য করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে যেভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছি, সে ধরণটিকে সহজবোধ্য করে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্যও এভাবে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে বলা যেতে পারে। তবে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও কর্মে সফলতা লাভের কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবনে এ আলোচনা সহায়ক হতে পারে বলে মনে করি। সে কারনেও বিষয়গুলিকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

স্মরণ

"In the name of Allah"। 'আল্লাহর নামে'। লেখাটি শুরু করেছিলাম এ বাক্যটি দিয়ে। এটি কেবলি একটি বাক্য যা মুখে উচ্চারিত হয়। আবার মুখে উচ্চারনেরও প্রয়োজন হয় না। কেবল স্মরণে নিয়ে এলেই যথেষ্ট।

সৃষ্টিকর্তার নামের উচ্চারন বা স্মরণ বিশ্বাসীর অন্তরে অনেক ক্রিয়া করে। স্মরণ ক্রিয়া করে বিধায় কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি এ স্মরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে।

যিনি বিশ্বাসী এ বাক্যটি উচ্চারন বা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে অনেক কর্মকান্ড শুরু হয়ে যায় মুহুর্তে। সে পরিপূর্ণ দর্শনের সমস্ত বিষয়গুলিকে মুহুর্তে সারমর্ম করে স্মৃতিতে নিয়ে আসে। কমান্ডগুলিকে অন্তরে গভীর মনযোগ ও চেতনার সঙ্গে ধারণ করে। মেনে চলার বিষয়টি নিজের ভেতরে নিজে নিশ্চিত করে। দুর্বল বিশ্বাসীর মধ্যে বিষয়গুলি তেমনভাবে কাজ নাও করতে পারে।

একটি শব্দ। কম্পিউটারে আঁকা আইকনিক বাটনগুলির মত। কপি বাটনে চাপ দিলে কপি হয়, সেইভ বাটনে চাপ দিলে সেইভ হয়। আমরা কেবল বাটন চাপি। বস্তুত ভেতরে অনেক ক্রিয়া আছে। দেখতে পাই না। কেউ সম্পন্ন করে।

কমান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে যত রকম পদ্ধতি আছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে 'স্মরণ'। কম্পিউটারে আমরা যেমন লিখিতভাবে কমান্ড প্রদান করি, শব্দ উচ্চারনের মাধ্যমে কমান্ড প্রদান করি, চোখের ইশারায় কমান্ড দিয়ে থাকি, চিত্রে বা আইকনে স্পর্শকরণের মাধ্যমে কমান্ড দেই, 'স্মরণ' তেমনি একটি কমান্ড। কমান্ড হিসেবে স্মরণকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। অথচ স্মরণ মস্তিস্কের ভেতরে কাজ করে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। কোন আইকনে চাপ সৃষ্টি করে। চেইন আকারে সে চাপ মস্তিস্ক থেকে হৃদয় হয়ে নানান স্থানে চাপ সৃষ্টি করনের মাধ্যমে উত্তেজনা, উত্তাপ বা শক্তি উৎপাদন করে। সে শক্তি পূর্ব অংকিত বা নির্দেশিত পথে মানুষকে চলতে সহায়তা করে।

আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর শব্দগুলি কেবলি কতগুলি শব্দই নয়। এগুলির উচ্চারন বা স্মরণে বিশ্বাসীর মস্তিস্ক থেকে হৃদয়ে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কম্পনই তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ দৃষ্টির অগোচরে অনেক তরঙ্গ ক্রিয়া করে। হৃদয়ের ভেতরেও তরঙ্গ ক্রিয়া করে। সে তরঙ্গ পরবর্তি ঘটনাগুলিকে ক্রিয়াশীল করে।

একজন মানুষকে মন্দ কথা বলা হলে সে নানান রকম প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। মাঝপথে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। অথচ মানবের ভেতরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে। বিষয়টি ঠিক তেমন।

বস্তুত যে নিয়ম, সূত্র বা সত্য এসব কাজ সম্পন্ন করে সেগুলি মানবের মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও বোধ বা উপলব্ধিটি হয় হৃদয় বা অন্তরে। ছোট্ট অথচ একটি অর্থবোধক শব্দের উচ্চারন বা স্মরণ তাই অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন।

প্রভাবক এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী

কর্মে সফলতা প্রাপ্তির জন্য কর্মের শুরুতে যারা সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। সকল মানুষ সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে কর্ম শুরু করে না। অবিশ্বাসী এবং নাস্তিকরাও কর্মে সফলতা অর্জন করে। তারা সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে না। তারা সফল হয় কিভাবে? সফলতা অর্জনের বিষয়টি যদি তাদের দ্বারাও সম্ভব হয়, তবে কর্মে সফল হওয়ার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করার কার্যকারণ সম্পর্কটি একমাত্র সত্য নয়। আরও সত্য আছে।

বিশ্বাসীর ওপর দর্শনের প্রভাব বিষয়ক ওপরের আলোচনায় দেখতে পাই যে, কোন কাজে সফলতা প্রাপ্তির সঙ্গে মূলত সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর স্মরণের বিষয়টির সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। সরাসরি সম্পর্ক আছে কর্ম প্রচেষ্টা, যোগ্যতা, দক্ষতা, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, মনবল, সাহস, উদ্যম, প্রেরণা ইত্যাকার প্রয়োজনীয় কিছু গুণাবলীর উপস্থিতির সঙ্গে। যা বোধের জাগরণের কারনে ভেতরে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করে। কর্মে গতির সঞ্চার করে। কাজে সাফল্য লাভের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। দেহে যেমন ভিটামিনের কারনে ঔষধের কার্যকারীতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, তেমনি আত্মার জন্যও রয়েছে কিছু ব্যবস্থা। যা মানবাত্মায় ভিটামিনের কার্যকারীতার ন্যায় কাজ করে। প্রভাবকের কারনে বিকশিত গুণাগুণ ও জাগ্রত উদ্দীপনাগুলি কর্ম সম্পাদনে মানুষকে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক প্রাণবন্ত করে তোলে। গবেষনা ছাড়াও বিষয়গুলি মানুষ নিজেকে দিয়েও বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

মানসিক শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলতে প্রভাবকের প্রয়োজন। কিন্তু একই প্রভাবক সকলের ওপর সমভাবে কার্যকরী নয়। যে প্রভাবক বিশ্বাসীর জন্য কার্যকর সে একই

প্রভাবক অবিশ্বাসীর ওপর কার্যকর নয়। প্রভাবক হিসেবে সৃষ্টিকর্তা সফল প্রভাবক। কিন্তু এটি কেবলমাত্র বিশ্বাসীর ওপর কাজ করে। অবিশ্বাসীর ওপর কাজ করে না। কেননা অবিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তার ধারণাতেই বিশ্বাস করে না। ফলে তার ক্ষেত্রে এ প্রভাবক উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ভেতরে কোন কার্যকরী সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপন করে না বা করতে পারে না। তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী তথা সকলের জন্যই কোন না কোন যথোপযুক্ত প্রভাবক তো অবশ্যই রয়েছে। যেমন প্রভাবক হিসেবে শিক্ষা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের ওপর কাজ করে।

যে কোন কাজ প্রকৃত অর্থে মানুষ নিজে সম্পাদন করে। বিশ্বাস নিয়ে হলেও নিজে করে, বিশ্বাসবিহীনভাবে হলেও নিজে করে। মানসিক শক্তি পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে মানবের ভেতরে কাজ করলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলকে কর্মে সফলতা এনে দিতে পারে। মানসিক শক্তি মানুষকে কাজে উদ্যমী ও উদ্যোগী করে তোলে। বস্তুত কোন অর্জনই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, অধ্যাবসায়, শ্রম ও জ্ঞান ইত্যাকার বিষয়গুলি ছাড়া সম্পন্ন হয় না। প্রয়োজন সাধনা ও যথাযথ কর্ম প্রচেষ্টা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কর্মে লেগে থাকা।

সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ না করেও কেউ যদি মানবীয় সর্বোচ্চ গুণে গুণান্বিত হয়ে কাজ করতে পারে তবে কাজে সফলকাম হবে। বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা প্রভাবক হয়ে কাজ করে সর্বোচ্চ গুণে গুণান্বিত হতে। অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সে একই কাজটি করে শিক্ষা ও জ্ঞান। অবিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ না করলেও তার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান তাকে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। যে সব যোগ্যতা, দক্ষতা ও মানসিক পরিবর্তন কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন তার সবই আসে শিক্ষা থেকে।

সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ না করলেও তিনি কাউকেই তার যথাযথ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন না। তিনি অবিচার করেন না। যোগ্যদেরকে তিনি তার প্রাপ্য প্রদান করেন। বস্তুত অবিশ্বাসীদের ওপর সৃষ্টিকর্তার কোন বিশেষ আক্রোশ নেই যদি না তারা তাদের অবিশ্বাসের কারনে কোন মন্দ কাজ করে। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি।

"... যেদিন তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তেমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস

স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ...” (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

প্রশ্ন জাগতেই পারে, তবে কি বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে জ্ঞান কাজ করে না? অবশ্যই করে। শিক্ষা ও জ্ঞান সর্বত্র কাজ করে। বিশ্বাসী বিশ্বাসী হয় তার নিজ জ্ঞানের কারনে। অবিশ্বাসী অবিশ্বাসী হয় তার নিজ জ্ঞানের কারনে। জ্ঞান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে শিক্ষা। কার ভেতরে শিক্ষাটি কেমন সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই একই দর্শনের ছায়াতলে থেকেও দু'জন দু'ভাবে চলতে পারে শিক্ষার পার্থক্যের কারনে।

লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতে প্রতিটি মানুষের ভেতরে একই রকমের উত্তাপ বা ক্রিয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই ক্রিয়াটি সম্পাদনে বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথ বা উপায় অবলম্বন করে। বিশ্বাসী এক পথে যা অর্জন করে, অবিশ্বাসী সেই একই বিষয়টি অর্জন করে ভিন্ন পথে। দু'জনের দু রকমের শিক্ষা।

প্রত্যেকেই তার নিজস্ব রিতিনীতি বা ধর্ম বা চলার পথ অনুযায়ী চলে। প্রত্যেকেই তার নিজ পথে চলার মাধ্যমে মঙ্গলজনক ফল এনে দিতে পারে। বিধাতাপ্রসূত প্রকৃতির নিদর্শন আমাদের সে শিক্ষাই দেয়।

দু'টি সমুদ্র পাশাপাশি অবস্থান করে। দুটির পানির স্বাদ ভিন্ন। একটি নোনা, একটি মিঠা। অথচ দুটি থেকে একই জিনিস উৎপন্ন হয়। একটি অপরটিকে উপচিয়ে বা ছাঁপিয়ে যায় না।

“দু'টি সমুদ্র এক রকম নয়- একটি স্বচ্ছ, মিঠা ও পান করার উপযোগী এবং অপরটি তিক্ত, নোনা। কিন্তু উভয়টি থেকেই তোমরা আহার উপযোগী তাজা মাংশ পেয়ে থাক এবং পরিধানে ব্যবহার্য্য গয়না আহরণ কর। ...” (আল-কোরআন ৩৫:১২)

“তিনি প্রবাহিত করেছেন দু'টি পানির ধারা (যারা) পরস্পর মিলিত হয়, তাদের উভয়ের মাঝে আছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না (সংঘর্ষ করে না)।” (আল-কোরআন ৫৫:১৯-২০)

প্রভাবক ও কেন্দ্রীয় টান

জীবন ও জগতের সকল ক্ষেত্রেই একটি কেন্দ্রীয় টান খুঁজে পাওয়া যায়। সব সন্তানেরা যেমন মায়ের টানে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ঠিক তেমন। এ টানের মাঝেই আছে উচ্ছাস, আছে প্রাণবন্ততা- এ টানেই জীবন!

"যখন ইব্রাহীম বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর (মৃতের ভেতরে প্রাণের সঞ্চার কর)? তিনি বললেন: তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম বলল: নিশ্চয়ই! তবে এটি এজন্য যেন আমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বললেন: চারটি পাখি নাও। সেগুলিকে নিজের বশীভূত করে নাও, তৎপর সেগুলির একেকটি অংশকে এক এক পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। অতঃপর সেগুলিকে ডাক। তারা তোমার নিকট দ্রুততার সঙ্গে চলে আসবে। জেনে রেখ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।" (আল-কোরআন ২:২৬০)

বিশ্বজগত সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের সকল কর্মকান্ডকে সত্য তার নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। নিয়মের এ বন্ধনই সকল কিছুকে আকর্ষন করে। প্রতিষ্ঠিত এ নিয়ম জাগতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। নিয়মের মধ্যে সব কিছু সুনির্দিষ্ট বা যথাযথ পরিমাপে বিদ্যমান।

"... তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়বস্তুই সুনির্দিষ্ট পরিমাপে পরিমাপিত।" (আল-কোরআন ১৩:৮)

সুনির্দিষ্ট পরিমাপ সূত্রের সকল উপাদানের যথার্থতা বা ন্যায্যতা নির্ধারণ করে দেয়। ন্যায্যতার কারনে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। প্রকৃতি নিজেই এর রক্ষাকর্তা বা বলা যায় স্বয়ং বিধাতা। যিনি সকল কিছুকে নিজ বৈশিষ্ট ও প্রকৃতি প্রদান করেন, অতঃপর সঠিক পথে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।

".. পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেন, অতঃপর সেটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।" (আল-কোরআন ২০:৫০)

কোন নিয়মের কারনে প্রকৃতির ভারসাম্যে ক্ষনিকের জন্য ক্ষানিক বিচ্যুতি হলেও বিধাতা নিজেই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত প্রকৃতি নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেয়। সে নিয়মেই সব সৃষ্ট। সত্যের প্রতি সব কিছুর আছে আকর্ষন। সকল নিয়ম বা সূত্রের মধ্যে ন্যায্যতার পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত আছে যা ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যথায় বিচ্যূতি বা অনাচারের কারনে জীবন ও জগত বিশৃংখল হয়ে যেত। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মের বিচ্যূতিই ধর্মচ্যূতি। ভারসাম্যের ভিত্তি ন্যায্যতা বা ন্যায়পরায়নতা। এর প্রতি সকল কিছুর আছে কেন্দ্রীয় টান। এমনভাবে সব সৃষ্ট যে, যেখানে সূত্র মধ্যস্থিত কোন উপাদানের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, সূত্র সে ঘাটতি তার নিজস্ব টান বা আকর্ষনের মধ্য দিয়ে পুরণ করে নেয়। ক্ষুদ্র মানবীয় জীবনে বিষয়গুলি সময়সাপেক্ষ প্রতীয়মান হয়। তাই কোন বিচ্যূতিতে মানুষ অধৈর্য্য হয়ে যায়।

"... মানুষ বরাবরই অস্থির প্রকৃতির।" (আল-কোরআন ১৭:১১)

একজন ন্যায়বান মানুষ যিনি ধনাত্মক শক্তির ধারক ও আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান একজন অন্যায়কারী যিনি ঋনাত্মক শক্তির ধারক, সকলের মধ্যেই ন্যায়ের বোধ বিদ্যমান। সৃষ্টির সকল কিছুই সত্য বা একটি নিয়মের মধ্যে চলমান। এ নিয়মই ভারসাম্যকে রক্ষা করে চলে। বিচ্যূত হলে নিজেই নিজেকে কোন উপায়ে সুধরে নিয়ে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। জগৎ পরিচালনার জটিল অংকের হিসেবের মধ্যেও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় না। নানান কারনে প্রতিনিয়ত জগতে এই যে মানুষের এত ঠেলাঠেলি-রেষারেষি, তা ন্যায় বা একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ারই অংশ। কেবল প্রকৃতি ও পরিবেশ নয়, সকল মানুষের সকল কর্মকান্ড সর্বদাই ন্যায়ের বোধকে সমুন্নত রেখে পরিচালিত। কেবল কিছু মানুষ ধৈর্য্যহারা হয়ে সাময়িক সময়ের জন্য ভূল আচরণ করে। তাতেই সমাজে বিচ্যূতি বা বিশৃংখলা প্রবেশ করে।

প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের বোধটিকে নিয়ে ভাবতে হয়। ন্যায়ের বোধ অবস্থান করে সকল চিন্তার কেন্দ্রে। ন্যায়বোধের প্রতি একটি কেন্দ্রীয় টান সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষীত হয়। প্রভাবক যখন ভেতরের শক্তিকে উজ্জীবিত করে, তখন কাজে জড়িয়ে যাবার পূর্বে এ বিষয়টির প্রতি সকলকে দৃষ্টি রেখে সেটি করতে হয়।

তবে কি প্রভাবক মন্দ বা অন্যায় বিষয়গুলিকে উজ্জীবিত করে না? অবশ্যই করে। তেমন প্রভাবকও আছে। তবে ক্ষনিক ও ক্ষানিক বিচ্যূতি সত্ত্বেও মানব জ্ঞান

পরিশেষে ন্যায়ের পথে ফিরে আসে। এটিই কেন্দ্রীয় টানের ফল বা পরিনতি। যা সত্যের উপস্থিতির কারনে কিছু সময় নিয়ে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। পরিশেষে পরিবেশ ও সামাজিক ভারসাম্যকে রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সৃষ্টির সঠিক পরিচালনায় এটিই সঠিক সূত্র বা সত্য বা ধর্ম। বিচ্যূতি সত্ত্বেও সকলকে পরিশেষে সমাধানের জন্য এ পথে ফিরে আসতেই হবে। দেরি করলে ভূলের মাশুলস্বরূপ সমাধানের পথ অযথা দীর্ঘায়িত হবে। কেননা ততক্ষণে আরও নতুন নতুন সমস্যা সংযোজিত হবে।

সত্যের প্রতি সব কিছুর রয়েছে কেন্দ্রীয় টান। সত্যই নিয়ম বা সূত্র। যার মাঝে প্রতিটি উপাদান থাকে যথাযথ পরিমাপে। না কম না বেশী। না ঘাটতি না অপচয়। এটিই নিয়মের উৎকর্ষ সাধন। প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। সঠিক সূত্রে চলার যথাযথ নিয়মের দিক নির্দেশনাই প্রতিটি বিষয় বা বস্তুর ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্ম। সত্যকে সমুন্নত রাখে পরিমাপের ন্যায্যতা বা ন্যায়পরায়তা। ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়তাই ভারসাম্যকে ধরে রাখে। জগতকে শান্ত, স্থীর ও শান্তিময় রাখে ন্যায়পরায়তা, যা ভারসাম্য সৃষ্টির মূল ভিত্তি। যেমন দাড়িপাল্লায় দু'দিকে সমতা/ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় না।

ন্যায়ের বিচ্যূতি ভারসাম্য নষ্ট বা অশান্তি ও অনাসৃষ্টির মূল কারন। কেননা ন্যায়ের বিচ্যূতি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত স্থিরতা, শান্ততা বা শান্তির সূত্রের কোথাও ঘাটতি ও কোথাও উদ্বৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সূত্রকে পরিবর্তন করে দেয়। অর্থাৎ তার জন্য প্রযোজ্য নিয়ম থেকে সে বিচ্যূত হয়ে যায়। এটিই ধর্মচ্যূতি। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, মানুষ যখন তার জন্য প্রযোজ্য নিয়ম থেকে দুরে সরে যায় তখন ধর্মচ্যূত হয়।

সঠিক, সরল ও শান্তির পথে চলায় মানুষের জন্যও কিছু নিয়ম-রিতি আছে। ধর্ম তা নির্দেশ করে। কোন বিশেষ নামের ধর্ম থেকে বিচ্যূতি প্রকৃত ধর্মচ্যূতি নয়। কিন্তু মানবের জন্য অপ্রযোজ্য কোন মন্দ বা ভূল কর্মে জড়িয়ে যাওয়া ধর্মচ্যূতি। কোন ধর্মই প্রতিষ্ঠিত ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না যদি সে ন্যায় পথের ধারক না হয়। সত্যিকার অর্থে নাম প্রধান ধর্মসমুহ এ ন্যায়ের ধারনায় উপনীত হওয়ার বার্তা দিয়েই মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। এমন কি অপরাপর দর্শনসমুহও।

স্বার্থান্বেষী ও কিছু অজ্ঞদের কবলে পড়ে ধর্ম রুগ্ন হতে চলেছে। এখানে স্বার্থান্বেষী ও অজ্ঞদের যতটা না অপরাধ, তার চেয়ে অধিক অপরাধ বোধসম্পন্ন মানুষদের নিরবতা পালন। তারা সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এটিও এক পরীক্ষা। সত্যিকারভাবে সত্য পথের ধারক-বাহকদের অন্তর কতটা দুর্বল এটি তার এক পরীক্ষা। আল্লাহর কারনে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের কারনে তারা পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে যাওয়ার ভয়েও ভীত। অথচ তারা জানে এখানে চিরদিন থাকবে না। এটি বিশ্বাসেরও চরম পর্যায়ের এক পরীক্ষা। যতই দাবী করা হোক না কেন, নিরবতা পালনকারী বোধসম্পন্ন মানুষদের বিশ্বাস বস্তুত আল্লাহ ও তার বার্তায় ভিষনভাবে দুর্বল। সত্যের সঠিক জ্ঞানের ঘাটতিরও পরিচায়ক বা নির্দেশক এ আচরণগুলি। এমনকি এ আচরণগুলি তাদের অন্তরের সংকীর্ণ লোভ বা বাসনাকেও প্রকাশ করে দেয়।

চেতনায় হোক কিংবা অবচেতনেই হোক, ন্যায়বোধের এ জ্ঞানটিই প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির নিয়মের প্রতি মানব মনের সমর্পনের নির্দেশক বা বলা যেতে পারে অন্তরে উপলব্ধ বিধাতার প্রতি আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মানবের অন্তরের উঁকি-ঝুঁকি। হতে পারে সেটি চেতনে বা অবচেতনে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে কিংবা নির্জ্ঞানে।

“.. নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট আনুগত্য প্রদর্শন (সমর্পন) করে ...।” (আল-কোরআন ৩:৮৩)

ন্যায়বোধের এ ধারনায় এসে সকলেই বিশ্বাসী বা বিধাতার প্রতি সমর্পিত। এখানে এসে সকলের জন্যই ধর্ম এক। ‘মানব ধর্ম’ অর্থাৎ ‘ইসলাম’ যার অর্থ মানবের জন্য বিধাতা প্রদত্ত সত্য ও সঠিক রিতিতে সমর্পন ও পরিণতিতে শান্তি! বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম হতে পারে। তাতে কোন সমস্যা নেই।

“... নিশ্চয়ই! তোমাদের ধর্ম (চলার পথ) এক ধর্ম (একই পথ) এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর।” (আল-কোরআন ২৩:৫২)

জগতের প্রতিটি আত্মা, যদি সেটি জড় অবস্থাতেও থাকে তথাপি চেতনে বা অবচেতনে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে তাঁর প্রতি সমর্পিত হতে বাধ্য,

যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এটি হয় এজন্য যে, সৃষ্টির যিনি উৎস তিনি সকল কিছুকে সে সূত্রে সৃষ্টি করেছেন, যার বাইরে যাবার ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়নি। যে নিজেকে চিনতে পারেনি সে তার জ্ঞানের অগোচরে হলেও তাঁর প্রতি সমর্পিত। যদিও বিষয়টিতে সে সচেতন নাও হতে পারে। এমনকি মুখে বা সম্মুখে অস্বীকারকারীও!

বস্তুত সকলে একই পথের পথিক। সকলে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। কিন্তু মানব মন একই আচরণ করা সত্ত্বেও অর্থাৎ ন্যায়ের পথে অবস্থান করতে চাওয়ার ইচ্ছে সত্ত্বেও, বাস্তবতা ও নানামুখী দর্শন বা নির্দেশনার ছায়াতলে অবস্থান করার কারনে অর্থাৎ নানামুখী দর্শনের নিজস্ব কিছু ভাষা ও সঙ্গার কারনে বিষয়গুলি কারও কাছে বোধগম্য হয়ে ধরা দেয়, কারও কাছে থেকে যায় অধরা।

ন্যায়ের পানে সকল মানুষের ঝুঁকে থাকার বিষয়টি এতটাই সত্যি যে, কাউকে দিয়ে একটি ভূল বা অন্যায় কাজ করাতে হলেও সে করণীয়টি যে ন্যায়সম্মত বিষয়টিকে তার সম্মুখে সেভাবে উপস্থাপন করতে হয়। আবার কাজটি করা অন্যায় হয়েছে বিষয়টিকে সেভাবে বোঝাতে সক্ষম হলে সে পথে শক্তি নাশ পায়। অন্যায়কে সঙ্গে করে মানুষ দীর্ঘ সময়ে টিকে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা নস্যাৎ হতে থাকে। এক পর্যায়ে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়ার মানসিক অবস্থাও সৃষ্টি হয়। সেটিও একটি ন্যায়সম্মত আচরণ। অর্থাৎ অন্যায়কারীর অন্তরও ন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে থাকে। সে যখন অন্যায় করে সেটিকে সে ন্যায় মনে করেই করে। কিংবা ন্যায়ের একটি যুক্তি দাড় করিয়ে নেয়।

সাময়িক সময়ের জন্য কিছু মানুষ বোধশূন্য হতে পারে। তবে সাধারণত জেনে বুঝে কেউ অন্যায় করতে চায় না। যারা জেনে বুঝে অন্যায় করে এদের নিয়েই মূলত সমাজে যত সমস্যা। অনেকে আবার করে অজ্ঞতার কারনে। সেটি মারাত্মক ত্রুটি নয়, যদিও ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

অন্যদিকে যারা নিজেরা ভাল রূপ ধারণ করে অপরকে দিয়ে অন্যায় কাজ করায়, তারা সেটি করায় জ্ঞানের কারনে। বাস্তবতার কারনে। ভূল বুঝিয়ে। অন্যায়কে ন্যায় বলে উপস্থাপন করার মাধ্যমে। ধূর্ত ও দুষ্টরা এ পথের আশ্রয় নিয়ে বোকা অথবা অসহায়দেরকে দিয়ে কিংবা কোন কূট চাল চেলে স্বার্থ সিদ্ধি করে। তারা স্বার্থ উদ্ধারে মানবের কেন্দ্রীয় টানের বিষয়টিকে অন্যের ওপর দিয়ে ব্যাবহার

করে। এ বৈশিষ্টটিই শয়তানের শয়তানী নামে পরিচিত বা অভিহিত। শয়তানের পৃথক কোন দৈহিক কাঠামো নেই। শয়তান নামটি মন্দ বৈশিষ্টের প্রতীক। যার মধ্যে শয়তানের গুণ বা বৈশিষ্ট প্রস্ফুটিত/পরিলক্ষীত হয়, সে-ই শয়তান। হোক সে মানব কিংবা কোন জিন অর্থাৎ 'কোন অদৃশ্য সৃষ্টি' বা এলিয়েন। তবে তাতে আপাত প্রতীয়মান শয়তান দোষের পর্যায়ভূক্ত হবে কি হবে না সেটি বিচার করবেন বিধাতা। কেননা শয়তান তার দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু ভূল বা অন্যায়কারীর নিজেরও কিছু দায়িত্ব আছে। এটিই পরীক্ষা। এটিও জগত সৃষ্টির একটি কারণ।

"আমি .. যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। ... এটি এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষান হৃদয়।" (আল-কোরআন ২২:৫২-৫৩)

"... তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ। ...।" (আল-কোরআন ১১:৭)

অন্যায়কারীদের জ্ঞান বস্তুত তাদেরকে দিয়ে বোকামি করায়। যারা সৃষ্টিকর্তাকে বোঝে না বা অন্য কথায় প্রকৃতির আচরণকে উপলব্ধি করে না, সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি তাদের উদাসীনতা বা অজ্ঞতার কারনে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। এটিই কর্মফল। এর মাধ্যমে যেমন ব্যাক্তিকে শিক্ষা দেয় তেমনি শিক্ষা দেয় সমগ্র মানব জাতিকেও। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে সে সত্য অনুধাবন করা যাবে। আবার ইতিহাসের শিক্ষা বলে যে, সব মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

ন্যায়ের প্রতি মানুষের রয়েছে এক অদৃশ্য টান। ন্যায় কাজ সম্পাদনে মানুষ ভেতর থেকে শক্তি পায়। বলা যায় এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি সঞ্চারিত হয়। ন্যায়বোধের সঙ্গে মানবের ভেতরে শক্তি সঞ্চারনের মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সাময়িক মোহ, স্বার্থ বা যে কোন কারনে বোধচ্যূত হলেও মানবকে পরিশেষে ন্যায়ের বোধে ফিরে আসতে হয়। অন্তত যখন মোহ কেটে যায়। সে কারনে নিরাপদ বোধ করলে অপরাধী অকপটে অপরাধ স্বীকার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। আবার অন্যরাও সেটিকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করে। যদিও পরিনতি সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়।

ন্যায়ের বোধ প্রভাবক হয়ে কাজ করে এবং এটি কেন্দ্রে অবস্থান করে। কেননা সকল ক্ষেত্রেই ন্যায়-অন্যায়বোধকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

বিশ্বাসী যখন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে এর মাধ্যমে তার মনোজগতে ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেননা তার শিক্ষা বা প্রস্তুতিটিই তেমন। আরোপিত সকল দর্শনেই সৃষ্টিকর্তার আদেশ ন্যায় ও সাম্যের কথা বলে। দর্শন ন্যায় পথে চলার শিক্ষা দেয়।

বিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তার স্মরণের মাধ্যমে কোন কাজের শুরুতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় ভাল বা ন্যায় থেকে বিচ্যুত না হওয়ার বিষয়ে স্রষ্টার নির্দেশনাকে মূহুর্তের জন্য হলেও স্মরণ করে। এর অপর অর্থ হলো একই সঙ্গে সে মন্দ থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে অন্তরকে প্রস্তুত করে বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কোন ভূল না করার বিষয়ে নিজেই নিজেকে পূর্ব থেকে সচেতন ও প্রস্তুত করে রাখে। ন্যায়বোধ শক্তি ও সাহস সঞ্চারনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণে এনেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না যদি মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যূত হয়। আবার সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণে না এনেও কাজে সফল হওয়া সম্ভব যদি মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকাটি গুরুত্বপূর্ণ। সত্য ও সঠিক পথে যে থাকে সে আপনা থেকেই স্রষ্টার পথে থাকে। স্রষ্টাও তার সঙ্গে থাকে।

“.. যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। ...।” (আল-কোরআন ৪৭:৩)

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা সত্বেও কেউ যদি একটি সূক্ষ ন্যায় বিবর্জিত কাজ/আচরণ করে, তবে তেমন আচরণকারীর কর্ম বা সমর্পন স্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। বস্তুত ন্যায় বর্জিত সৃষ্টিকর্তার ধারণা অকার্যকর। সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষ যায় ন্যায়ের প্রত্যাশায়। সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষ যায় ভূল বা অন্যায় বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রাপ্তির আশায়। বিপদে আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। অন্যায়কারীর বিপক্ষে দাড়াতে শক্তি সঞ্চারণের প্রত্যয় নিয়ে।

"... সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না। ...।" (আল-কোরআন ৫:৭৭)

সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সত্য ও ন্যায়ের ধারণার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সত্য ও ন্যায় ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত অর্থে কোন অস্তিত্ব নেই। ন্যায়ের উপস্থিতি ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা গ্রহণযোগ্যও নয়। ন্যায়টাই আসল। ন্যায় ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। অত্যাচারিত সৃষ্টিকর্তার স্মরণাপন্ন হয় ন্যায় প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। অন্য কেউ নয়। শংকায় সাহসের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে যেতে হয়। তবে সুখী-দুঃখী, ধনী-গরীব সকলকেই যেতে হয় হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের জন্য। মানবের মানসিক প্রশান্তির জন্য সর্বকালেই বিধাতার স্মরণ অতীব গুরুত্ববহনকারী একটি বিষয়। কিন্তু যিনি কৃষিকাজ করেন তিনি রকেট চালাবেন কিভাবে? সে প্রশান্তি সকলেই পাবে না।

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমুহ প্রশান্তি লাভ করে।" (আল-কোরআন ১৩:২৮)

ন্যায়পরায়নতার বোধটি এমন যে এটি কেবল বিশ্বাসীর ওপর নয়, এটি কাজ করে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকল মানুষের ওপর। সে অর্থেই সকল মানুষের ধর্ম এক এবং সৃষ্টিকর্তাও এক, যিনি সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক।

"... নিশ্চয়ই! তোমাদের ধর্ম (চলার পথ) এক ধর্ম (একই পথ) এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর।" (আল-কোরআন ২৩:৫২)

বিশ্বাসীর জন্য ন্যায়বোধের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার বিষয়টি সরাসরি অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে। তবে এটি সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে মূলত জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞান এমন একটি বিষয় যা সকলের জন্য প্রযোজ্য। বিশ্বাসী জ্ঞানের কারনে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে। সেখান থেকে ন্যায়বোধে। কিন্তু জ্ঞানের কারনে সংস্কৃতি কর্মী থেকে শুরু করে নাস্তিক পর্যন্ত সকল মানুষ ন্যায়বোধের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে, যার পেছনেই সৃষ্টিকর্তা প্রেরণা হয়ে থাকেন।

কম্পিউটার কাজ করে অনেক কিছুর সমন্বয়ে। এর কোন অংশ অগুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি অংশ না থাকলে সে সঠিকভাবে কাজ করবে না। তদুপরি মর্যাদা বা

গুরুত্বের দিক থেকে সিপিইউ গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি মানুষের হাত, পা, মাথা, পেট নানান অংশ থাকা সত্ত্বেও মাথাটি গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের অনেক বোধ আছে। প্রভাবক মানুষের অনুভব, অনুভূতি, বোধগুলিকে নাড়া দেয়। বোধে নাড়া পরলে মানুষ নড়েচড়ে বা জেগে ওঠে। চলার শক্তি পায়। নানান রকমের বোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, অহমবোধ, লজ্জাবোধ, মর্যাদাবোধ, ঈর্ষাবোধ ..। এদের কোনটিই অগুরুত্বপূর্ণ নয়। তথাপি বোধের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ন্যায়-অন্যায় বোধ। ন্যায়ের স্বপক্ষে চলতে গিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে। এ বোধ থেকে সহায়ক অপরাপর বোধগুলি জেগে ওঠে। মানবিক ও জাগতিক বিশাল ও জটিল অংকসমুহের কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রীকভাবে অন্তরের শক্তি জাগ্রত হয়।

বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়ের বোধকে সর্বদা জাগ্রত ও সমুন্নত রাখে। আর ন্যায়ের স্বপক্ষ শক্তি চিরকালের জন্যই সফল, তা সে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক যে নামেই পরিচিত হোক না কেন।

৭. বাস্তবতা

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও সাফল্য প্রাপ্তির কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে কেবল একটি সাধারন ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ধারণা মানুষকে তথা আগামী প্রজন্মকে কেবল অলৌকিক নয়, বিষয়গুলির সঙ্গে যে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কিছু সূত্র আছে বা থাকতে পারে- অন্তরকে সে ধারণায় উন্নীত হতে সহায়তা করবে বলে মনে করি। অন্যভাবে বলা যায় যে, সৃষ্টিতে সংঘটিত সকল ঘটনার পেছনে একটি সূত্র বা সত্য বিদ্যমান সেটি অনুধাবনে এ আলোচনা সহায়ক হতে পারে।

সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ও সাফল্য প্রাপ্তির কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে ওপরে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সেগুলি অনেকটাই আদর্শিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক কিংবা ভাবের কথার মত। ভাবের কথারও প্রয়োজন আছে। কেননা ভাবের কথা বিষয়ের ওপর একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা দিতে পারে। যে ধারণা চলার পথকে সহজ ও যথার্থ করে তুলতে ভূমিকা রাখে।

কোন বিষয়ে আদর্শিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক কিংবা ভাবের আলোচনার পরেও জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আরও একটি দিক রয়েছে। সেটি হলো বাস্তবতা। বাস্তবতা হলো চরম সত্য। অর্থাৎ যা ঘটে চলেছে। বাস্তবে যা ঘটে চলেছে সেটি চরম সত্যের পথ ধরেই ঘটে চলেছে। অর্থাৎ তত্ত্বের সকল ঘাটের ঘাত-প্রতিঘাতের পরই সেটি বর্তমান ও প্রকৃত সত্যরূপে বের হয়ে এসেছে বা প্রতিভাত হয়েছে। এমনকি প্রতিষ্ঠিত ভূল বা মন্দ কাজগুলিও। কেননা সেগুলিও চলার পথের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বা ঘাত-প্রতিঘাতের সর্বশেষ পরিণতি। ভূল বা মন্দের প্রতিষ্ঠাকেও এ দ্বন্দ্ব পরিশেষে সম্ভব করে তুলেছে বা বলা যায় সেসবকে সত্যে পরিণত করেছে বা তার সত্যে রূপান্তরিত হওয়াকে সম্ভব করে তুলেছে বা হতে দিয়েছে। আর এটিই হলো চলমান বা বিদ্যমান প্রক্রিয়ার ক্ষতি বা লোকসানের দিক, অর্থাৎ সিস্টেম লস। যে সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে কল্পনা, আবেগ, তত্ত্ব বা ভাবের কথা- এমনকি লুকোচুরির কোন অবকাশ নেই। সত্য সদা প্রস্ফুটিত। যা মানুষের দৃষ্টির সামনেই বিদ্যমান বা ঘটে চলেছে। বিদ্যমান প্রক্রিয়ার এ ভূলগুলি অর্থাৎ সিস্টেম লসকে বন্ধ করা বা কমিয়ে আনা বা সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখাই মানুষের কাজ।

ওপরে যেসব তাত্ত্বিক বা আদর্শিক কথা বলা হয়েছে বাস্তবে কোন দর্শনই কখনও হুবহু তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বা বলা যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর বড় কারন বাস্তবতা; যার পেছনে রয়েছে মানুষ।

চরম সত্য বা বাস্তবতার আলোকে তাই কিছু আলোচনা ভিন্ন এ লেখা অপূর্ণ থেকে যাবে। বর্তমান বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে নিচে তাই সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচনা সংযোজন করে এ লেখার সমাপ্তি টানতে চাই।

ন্যায় ও সত্যের বিচ্যূতি

সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে বিশ্বাসী কর্মে উদ্দীপ্ত হয়। এর পেছনে দর্শন কাজ করে। বিষয়গুলি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে দর্শনসমুহে নানান আদর্শের কথা বলা হলেও বাস্তবে বিচ্যূতিও পরিলক্ষীত হয়। জীবন ও জগত নিয়ে সমাজে নানান দর্শন বিদ্যমান। পুঁজিবাদ-সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র, বিশ্বাসীর দর্শন-অবিশ্বাসীর দর্শন, আস্তিক্যবাদ-নাস্তিক্যবাদ এমনি অনেক। একটি দর্শনের বিপরীতে রয়েছে আরও একটি দর্শন। সকলেই সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে।

সত্য ও ন্যায়ের বোধটি এক এক জনের কাছে এক এক রকম। তাই সকল দর্শনের ছায়াতলেই কিছু না কিছু মানুষের সমাগম ঘটে। এতে দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিপরীতমুখী শক্তিগুলি মুখোমুখী অবতীর্ন হয়।

সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে এত শক্তি বর্তমান থাকা সত্বেও সমাজে কি অন্যায় ও সত্যবিচ্যূত কর্মকান্ড ঘটছে না? কিভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে অন্যায় ও সত্য বিচ্যূত কর্মকান্ড?

অন্যায় বা সত্য বিচ্যূতিকে সম্ভব করে তোলে মূলত ‘জ্ঞান’! সূক্ষ জ্ঞানের মারপ্যাঁচ ব্যাতিত অন্যায় কর্ম সাধন কঠিন। জ্ঞান হচ্ছে পানির মত। পানি যেমন সব পাত্রের রং ধারণ করে। জ্ঞানও তেমন। সে সকল পক্ষের রং ধারণ করে। সে সকলের পক্ষে কথা বলে। আবার সকলের বিপক্ষেও কথা বলে। জ্ঞান ন্যায়ের কথা বলে। আবার সূক্ষ জ্ঞান ন্যায় বিচ্যূতিকে সম্ভব করে তোলে।

জ্ঞান কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরীকে সম্ভব করে তোলে। সূক্ষ জ্ঞানই আবার ভাইরাস উৎপন্ন করে। হ্যাকিংকে সম্ভব করে তোলে!

জ্ঞানের কারনে বিচারক বাদি-বিবাদী উভয় পক্ষে রায় প্রদানের কঠিন যুক্তি তুলে ধরতে সক্ষম। ভূক্তভোগীর অন্তরের আকুতি তাই পরম সত্যের সন্ধানে বিধাতা পর্যন্ত ফিরে যেতে বাধ্য।

"... বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য।" (আল-কোরআন ২:২১০)

জ্ঞানের কারনে মানুষ বিশ্বাসী। আবার এ জ্ঞানের কারনে মানুষ অবিশ্বাসী। জ্ঞান মানুষের চালক। জ্ঞান যেভাবে বোঝায় মানুষ সেভাবে বোঝে। জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব সময়ের জন্য। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই জ্ঞানকে ব্যবহার করে।

মূলত মানুষ একটি ফাঁকা বাক্সের মত। এর ভেতরে জ্ঞান নামে যা কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায় সে তাই হজম করে ফেলে। অতঃপর সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চলতে শুরু করে। সে অর্থে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক, সত্য-অসত্যের পক্ষ শক্তি কেউই কোন দোষে দোষী নয়। ফাঁকা বাক্সের ভেতরে কি প্রকারের জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে দোষের মূল কারন সেখানে।

জ্ঞান প্রবেশ করাবার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে 'শিক্ষা'। তাই জ্ঞানের চালক হচ্ছে শিক্ষা। হোক সেটি প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক। যার শিক্ষাটি যেমন তার জ্ঞান তাকে সেভাবে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একই দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও দর্শন প্রতিষ্ঠায় কেউ জীবন রক্ষা করে। কেউ জীবন নাশ করে।

জ্ঞান সব দিকে যুক্তি খুঁজে পায়। ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহনের গুরুভার তাই জ্ঞানের ধারকের। অর্থাৎ জ্ঞানীর। অন্যভাবে বলা যায় বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীর। কিংবা আস্তিক বা নাস্তিকের নিজের। জ্ঞান সব পথ বাৎলে দেয়। পথ অবলম্বনের দায়িত্ব জ্ঞানীর। প্রাপ্তব্য ফলাফলও তাই জ্ঞানীর নিজের।

"... প্রত্যেক মানুষের কর্মফলকে আমি তার নিজ কাঁধে স্থাপন করেছি ...।" (আল-কোরআন ১৭:১৩)

ন্যায়কারী-অন্যায়কারী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক সকলকে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে গড়ে তোলে শিক্ষা। জ্ঞানীর ভাল-মন্দের ফলাফলের দায়ভার তাই শিক্ষার। বলা যায় শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টিকারীদের।

জ্ঞানীকে গড়ে তোলে শিক্ষা। যে শিক্ষা জ্ঞানীকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে সে শিক্ষাই আবার জ্ঞানীর হাতে পরে দুমড়ে মুচড়ে যায়। পদদলিত হয়।

শিক্ষা যার কারনে পদদলিত হয় তিনি হলেন- 'স্বার্থ'। জ্ঞানী যখন স্বার্থের পেছনে ছুটে শিক্ষা তখন পদদলিত হয়।

এ লেখায় কখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কখনও দর্শন, কখনও প্রভাবক, কখনও জ্ঞানকে মানবের চালিকা শক্তি বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলি ছিল আদর্শিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক কিংবা ভাবের কথা। বাস্তবে মানুষের চালক হলো 'স্বার্থ'।

স্বার্থ উদ্ধারে সে-ই সফল হবে যার হাতে আছে 'অর্থ'। অর্থ তার হাতে যাবে যার হাতে আছে 'ক্ষমতা'। ক্ষমতা কার হাতে যাবে সেটি নির্ধারণ করে 'রাজনীতি'। রাজনীতি তার কাছে পরাস্ত যার আছে 'শক্তি'।

মূল কথাটি হচ্ছে- 'জোর যার মুল্লুক তার।' টিকে থাকতে হলে বৃহৎ শক্তির কাছে নত হতেই হবে। সেটি সইতে না পারলে নিজেকে বৃহৎ শক্তি হয়ে আবির্ভূত হতে হবে। পরাস্ত হলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

যখন একক বৃহৎশক্তি আবির্ভূত হয় এবং সমপরিমান বিরোধী শক্তি থাকে না, তখন সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়। স্বার্থের কারনে শক্তিমান অন্যায় বা সত্যচ্যুত কর্মকান্ড অনায়াসে সংঘটন করতে পারে। শক্তিমান অন্যায় বা সত্য বিচ্যুতিকে ন্যায় ও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়।

বাস্তবতা হচ্ছে, স্বার্থের কারনে জগতে অন্যায় ও অসত্য প্রবেশ করে। একক বৃহৎশক্তি আবির্ভূত হলে অসত্যের প্রবেশ সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে। পরিণাম সত্য বিচ্যুতি। সত্য ও অসত্য এ অবস্থায় মুখোমুখী অবস্থান নেয়। বস্তুত অবস্থান নিতে বাধ্য। কেননা একদল নিস্পেষিত হয়। তারা নতুন যৌক্তিকতা ও নতুন তত্ত্ব কিংবা নতুন দর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাতে অন্যায়ের কি? বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় নিপীড়িতকে তো শক্তি সঞ্চয় করতেই হবে! অন্যথায় এ সমস্যার ন্যায়সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ খুঁজে বেড় করতে হবে মানুষকেই। কাজটি সহজও নয়।

"... হে আমার প্রতিপালক! তুমি সত্য দ্বারা (সকল দ্বন্দ্ব) মিমাংসা করে দাও। ...।" (আল-কোরআন ২১:১১২)

মুখোমুখী সত্য-অসত্য

প্রতিষ্ঠিত সত্য তার ন্যায়সম্মত অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে থাকলে জীবন ও জগত ভারসাম্যহীন হতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে গেলে তাকে পুনঃস্থাপনে প্রকৃতি নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার পরিণাম ভোগ করতে হয় ন্যায় বিচ্যুতদের। এটিই পাপের বা কৃতকর্মের ফল।

"যখনই কোথাও ধর্মের অধঃপতন পরিক্ষীত হয়, ... এবং অধর্মের উত্থান ঘটে- তখনই ... ধার্মিকদের রক্ষার্থে এবং দুষ্টদের উৎপাটনে এবং ধর্মের বিধি বিধানের পুনঃপ্রবর্তনে, যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।" (গীতা ৪:৭-৮)

সত্য ও ন্যায়ের রূপ ধারণ করে আজকে যে প্রতিষ্ঠিত তাকে যখন শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়, তখন সেটি কোন নিয়মের লংঘন বা বিচ্যুতির ইঙ্গিত বহন করে। অন্যকথায় অসত্যের অনুপ্রবেশ ও ভারসাম্যহীনতাকে ইঙ্গিত করে।

প্রতিষ্ঠিত সত্যের মাঝে ভ্রান্তি প্রবেশ করলে প্রকৃতি বা বিধাতা প্রাথমিক অবস্থায় খুব ছোট একটি প্রতিপক্ষ দাড় করিয়ে দেন। সত্য ও অসত্য আপাত মুখোমুখী দাড়িয়ে যায়। স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা পদ্ধতির অংশ এগুলি।

ছোট প্রতিপক্ষ অবস্থান তৈরী করতে থাকে। একদিন বড় হয়। সত্য-অসত্যের এরূপ মুখোমুখী অবস্থানের কারনে মিথ্যে বা ভূলের রূপ উন্মোচিত হতে থাকে। প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এভাবে সত্যকে জেনে নেয়। ভূলের রূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হলে অসত্যকে উৎপাটন ও সত্য পুনঃস্থাপন সহজ হয়ে যায়।

অলৌকিকভাবে কোন কিছুই ঘটে না। সব সম্পন্ন হয় বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সময়টি মানুষের কাছে দীর্ঘ মনে হয়। মানব জীবন ছোট বলে এক জীবনে ধরা পড়ে না। যারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে চায় না তারা তাই অলৌকিকতা দেখতে পায়।

বিজ্ঞানীদের মানুষ সন্মানের চোখে দেখে। বস্তুত বৈজ্ঞানিক সকল কর্মকান্ডের মূল স্বয়ং বিধাতা বা প্রকৃতিও ভাবা যেতে পারে। যদিও দু'টি এক নয়। বিশ্ব জগত সমুহ পরিচালিত হয় সত্যের ভিত্তির ওপর। সমগ্র কর্মগুলি সুশৃংখল প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সৃষ্টি তেমন সত্যের ভিত্তির ওপর সৃষ্ট। বিধাতার সকল কমান্ড বা প্রোগ্রাম সেভাবে

রচিত। নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে কাজ শুরু করে। ভেতরে অনেক ক্রিয়া আছে সবাই দেখতে চায় না, তাই দেখে না।

বর্তমানে অধিষ্ঠিত সত্যের দাবীদার অবস্থান করে গ্রাফের উচ্চ শিখরে। বিলাসিতা ও নানাবিধ ভোগ এবং অহমবোধের কারনে এ সময়ে জ্ঞান সহজাত প্রবৃত্তির মন্দ দিকগুলিকে প্ররোচিত করে। ভূল পথে পা বাড়ালে পতন।

"যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছে করি, তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রেরণ করি; অতঃপর তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর আমার প্রেরিত বাক্যের/নির্দেশনার প্রয়োগ সম্পাদিত হতে থাকে (দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাকে ধ্বংস করি এক পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তুপে।" (আল-কোরআন ১৭:১৬)

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হলো কেন? সনাতন ধর্ম তো বিদ্যমান ছিল। তবে কি সনাতন ধর্ম সত্য ও সঠিক ছিল না? যারা জৈন কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক তারা কি এক কালে সনাতন দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না? ইহুদী ধর্ম তো বিদ্যমান ছিল তবে খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাব হলো কেন? ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আবির্ভাব হলো কেন? আজ যাদের নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয় তারা কি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান নয়?

যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত সত্য দর্শনের মাঝে যখন ত্রুটি প্রবেশ করেছে, তখন এভাবেই নতুন প্রতিপক্ষ দাড়িয়েছে। সত্য-অসত্য মুখোমুখী হয়েছে। ত্রুটি সংশোধিত হয়ে নতুন রূপে সত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পক্ষ-বিপক্ষকে মুখোমুখী দাড় করিয়ে বিধাতা সত্যকে প্রকাশ করেন, অতঃপর প্রকাশিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া পরীক্ষার অংশ। এর মধ্য দিয়ে সত্যকে বেড় করে আনা হয়।

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? ... এভাবেই আল্লাহ জানেন কে সত্যনিষ্ঠ এবং মিথ্যেরূপ ধারনকারীদেরও (তিনি) জানেন।" (আল-কোরআন ২৯:২-৩)

যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা তিনি তার সৃষ্টির কোন এক শর্তে সত্য ও অসত্যকে মুখোমুখী দাড় করান। এখানেও সূত্র আছে। আছে নিয়ম। এটি কোন সত্য বিচ্যুতি বা নিয়ম ভংগের ফল বা অবধারিত পরিণাম। প্রকৃতি বা স্রষ্টা বিষয়টিকে এভাবে সম্ভব করে দিয়েছেন।

স্রষ্টা যে বিষয়টিকে সম্ভব করে দিয়েছেন তাকে অবান্তর বা মন্দ ভাববার অবকাশ নেই। সৃষ্টি পরিচালনায় তিনি যা সম্ভব করে দিয়েছেন তা বিচ্যূত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ও কল্যানকর। এটি এ্যাডজাষ্টমেন্টের পথকে সুগম করে তোলে। সত্যের পুনঃস্থাপন সহজ ও সম্ভব হয়।

সত্য-অসত্য নির্ধারণে রাজনীতি

সত্যের ধারকরূপে কোন দর্শন বা কোন তত্ত্বই কোন কালে প্রতিষ্ঠা পাবে না যদি না মানুষ তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। কিন্তু যখনই একদল মানুষ কোন কিছু প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে তখনই আপনা থেকে একটি বিরোধী পক্ষ দাড়িয়ে যায়।

বিরোধী পক্ষ ভিন্ন মত ও পথ প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়। ফলে সত্য ও অসত্য বা দুটি সত্য বা যার যার দর্শন প্রতিষ্ঠায় দু-পক্ষের মধ্যে রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে দর্শন দিয়ে শুরু হয় অতঃপর সেটি নানান স্বার্থে গিয়ে গড়ায়। কিংবা স্বার্থ দিয়ে শুরু হয় নানাবিধ দর্শনের কাঁধে ভর করে।

রাজনীতির কাছে এসে সত্য, তত্ত্ব, দর্শন সব কিছু নত হয়ে যায়। যদি কোন কিছু রাজনীতির খেলায় পড়ে যায় তো তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন তার হাতে। আর এ জায়গাটি হচ্ছে চরম বাস্তবতার স্থান। এটিই একমাত্র বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কেননা যত তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে সেটি মানুষের জন্য। আর রাজনৈতিক খেলার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেই মানুষ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা কিংবা উৎপাটন করতে।

ধারণাগতভাবে রাজনীতি কোন পেশা নয়। সৃষ্টি পরিচালনার এক অবশ্যম্ভাবী ও অনস্বীকার্য শর্ত হচ্ছে রাজনীতি। একটি কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে যা আপনা থেকে দাড়িয়ে যায়। এটিকে এড়ানো সম্ভব নয়। সচেতন যে কোন মানুষ যে কোন ক্ষেত্রে এতে জড়িয়ে পড়তে পারে। তার জন্য রাজনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির

কর্মকান্ড পরিচালনার শর্তই মানুষকে এ পথে টেনে আনে। সেটি ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক কিংবা বৃহৎ পরিসরেই হোক।

কেবল কল্পনায় নয় বাস্তবেও কোন কিছুর বাস্তবায়নে রাজনীতি হচ্ছে শক্তির মূল উৎস বা চালক। যে প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অনিবার্য পরিনতি হচ্ছে- 'সংঘর্ষ'। আলোচনাও হতে পারে। তবে তার জন্য মানুষের বোধ আরও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে।

রাজনীতিতে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ হয় নতুন ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বা পুরোনো ও মিথ্যেকে উৎপাটনের জন্য। সংঘর্ষ শক্তি উৎপাদন করে। সে শক্তি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। সত্য সবকিছুকে যথাযথ নিয়মে চালনা করে। ঠিক যেমন ইঞ্জিনে উৎপাদিত সাংঘর্ষিক শক্তি পিষ্টনকে চালনা করে। অতঃপর পিষ্টনের সঙ্গে সংযুক্ত সকল কিছু তার সুনির্ধারিত নিয়মে চালিত হয় বিষয়টি তেমন।

রাজনীতির মূল কাজ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও সমুন্নত রাখা। এটি কোন আদর্শিক বক্তব্য নয়। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত প্রক্রিয়াটি এমন যে রাজনীতির খেলায় সত্যকে আপনা থেকে বেড় হয়ে আসতেই হবে। যতক্ষন সেটি হবে না ততক্ষন খেলা চলতেই থাকবে।

রাজনীতিতে মানুষ দারুনভাবে সক্রিয় থাকে। বিতর্কিত বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। যেটিকে দু'পক্ষের বিষোদগার ভাবা হয় সেটি প্রকৃত অর্থে বিষোদগার নয়। সভ্যতার ঘাটতির কারনে বিষয়টি বিষোদগারের মত মনে হয়। কেবল কিছু শব্দ ও মুখচ্ছবির বিকৃত রূপ পরিহার করা সম্ভব হলে একই বক্তব্য সভ্য হয়ে যাবে।

রাজনীতিতে বিতর্ক বা পারস্পরিক বিষোদগারের ছলে মূলত সত্যকে টেনে বেড় করে আনা হয়। মানুষের সামনে গোপন বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে দেয়া হয়। এ খেলার উপস্থিতি ব্যাতিত সাধারণ মানুষ উপর মহলের অন্দরের অনেক সত্য জানতে সক্ষম হতো না। সে কারনে এটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কেননা রাজনীতি সত্যকে উদঘাটন করে; মানুষের সামনে তা প্রকাশ করে দেয়। খুঁজে পাওয়া সত্যই মানুষকে সঠিক পথ বাৎলে দেয়।

".. যারা সত্য নিয়ে আগমন করে এবং সত্যকে সত্য বলে জানে/বিশ্বাস করে তারাই দায়িত্বশীল।" (আল-কোরআন ৩৯:৩৩)

সত্য ও ন্যায়ের প্রতি মানবের কেন্দ্রীয় টানের কারনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মানুষ এখানে দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে প্রচন্ড সক্রিয় থাকে। যতক্ষন সত্য স্পষ্টরূপে ধরা দেবে না রাজনীতির খেলা ততক্ষন চলতেই থাকবে। সত্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলেই কেবল এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিতারণে প্রয়োজনে শক্তির প্রয়োগে উদ্যেগী হয়। এ সময়টিতে উদ্যোগী হয় কেননা এ সময়ে অন্যায়ের বিপক্ষে সত্য ও ন্যায় প্রচন্ড শক্তি অর্জন করে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমর্থন পায়। প্রক্রিয়াটি এমন-

একদল ছলে-বলে-কৌশলে গোপনে কোন একটি স্বার্থ বা সুবিধা লুটে নিতে চায়। কিন্তু বঞ্চিত দল গোপন সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। মূলত বঞ্চিত পক্ষ সে সুবিধাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তারাও সে সুবিধাটির গোপন দাবীদার। কিন্তু বঞ্চিত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে গোপন সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। সত্য প্রকাশের স্বার্থে সব সময় সত্য প্রকাশ করে না। প্রক্রিয়ার প্যাঁচে পরে হলেও সত্য প্রকাশ করে দিতে হয়। আর এটিই স্রষ্টা বলি কিংবা প্রকৃতি বলি তার কারুকাজ। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে তিনি ফেলে দিয়েছেন। মানুষ নিজে প্রক্রিয়ার মধ্যে পরতে না চাইলেও সমাজের একটি সচেতন অংশ হিসেবে পরে যেতে হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ন্যায়ের আড়ালে প্রত্যেকে আবার অতি সন্তর্পন ও সযতনে নিজ নিজ স্বার্থকে লালন-পালন করে। স্বার্থ উদ্ধারে সূক্ষ সূক্ষ জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এতে রাজনীতিতে নোংরামির প্রবেশ ঘটে। তবে এটিও ঠিক যে এই সূক্ষ জ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগায় বিধায় রাজনৈতিক পরিবেশ আপাত শান্ত থাকে। এটিই এ্যাডজাষ্টমেন্ট। নয়তো প্রতিনিয়ত রাজনীতি হতো সত্য ও ন্যায়ের পথে কিংবা স্বার্থের কারনে অনড় ও নিয়ত সাংঘর্ষিক। সেক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে চলে আসতো সেই একই তত্ত্ব- 'জোর যার মুল্লুক তার।' সভ্যতা ও শান্তি বলে জগতে কিছু থাকতো না।

সভ্যতা ও শান্তি টিকে আছে দুটি কারনে। শক্তির কাছে মস্তক পরিপূর্ণভাবে অবনতকরণের কারনে। নয়তো কমপক্ষে রাজনীতির এই এ্যাডজাষ্টমেন্টকে এক পক্ষ মেনে নেয়ার করনে। প্রকৃতপক্ষে মেনে নেয়া নয়, মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার কারনে। মূলত 'জোর যার মুল্লুক তার' এ তত্ত্বটিই সত্য।

সত্যিকারের নির্মম খেলায় পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু রাজনীতি তাদের কিছুটা সন্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়। খেলায়

জড়িতদের মধ্যে পরাজিত পক্ষ হার স্বীকার করে নেয়। নিতে বাধ্য হয়। ফলে আপাত শান্তি বিরাজ করে। সাধারণ মানুষের বৃহৎ অংশ কথিত মুক্ত আলোচনার নামে যে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে, কিংবা স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রদর্শন করে, তা তাদের পক্ষ হয়ে রাজনীতির কোন এক পক্ষ পরাজয় স্বীকার করে নেয় বিধায় সে সুবিধা ভোগ করতে পারে। নয়তো প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত শক্তির মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হতো। জয়ী পক্ষ কখনই তার সরাসরি বিরোধীতাকারীকে সহ্য করে নিতে প্রস্তুত নয়। কেননা শক্তি ও ক্ষমতা তার হাতের মুঠোয়। সকলের বেঁচে থাকা কেবলি তার মহানুভবতা! শক্তিমান সে মহানুভবতা কখনও প্রদর্শন না করলেই বয়ে যাবে রক্তের বন্যা।

রাজনীতি মানুষের সম্মিলিত শক্তি ধারণ করে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করে। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যত কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন তার সবই তার ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকে। যা আসে মানুষের সম্মিলিত সম্মতি থেকে। কেবল জনগন নয়, প্রকৃতি বা অন্য অর্থে সৃষ্টিকর্তা তাকে সে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেন। কিছু সময়ের জন্য। এটিও একটি পরীক্ষা।

প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে এখানে টানা হলো কেন? প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্তাকে টানা হলো এ কারনে যে, রাজনীতিতে কে নেতৃত্ব দেবে সেটি নির্ধারিত হয় পক্ষসমুহের পারস্পরিক চাপ দ্বারা। যা কারও একক নিয়ন্ত্রনে নয়। বিষয়টি সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশের ফল। সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের ওপর জীবন, জগত, সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি, দর্শন, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্য নানান কিছু প্রভাব ফেলে। যার হিসেব মেলানো কঠিন। যার সন্ধান কষতে গেলে কোন অদৃশ্য শক্তি বা অন্য কথায় বিষয়টি স্রষ্টা পর্যন্ত গড়ায়।

রাজনীতি যখন তার মূল কাজ থেকে সরে আসে অর্থাৎ কলুষিত হয়ে যায় বা সত্য বিচ্যূত হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের পেছনে ধাবিত হয়, প্রকৃতি আপনা থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অলৌকিকভাবে নয়। মানুষকে কাজে লাগিয়েই প্রকৃতি সব ঠিক করে নেয়। পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, জগত সে নিয়মের মধ্যে সৃষ্ট। অন্যায় আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দাড়িয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত রাজা বা দর্শনের পতন ঘটে। তেমন

স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সকল প্রোগ্রাম, সূত্র, কমান্ড বিধাতা কর্তৃক রচিত। সূত্রই সত্য। এগুলি সম্মিলিতভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এ জগত সত্য দিয়ে সৃষ্টি। সত্যের বাইরে যাবার তার উপায় নেই। সত্যের পানে সে ছুটে যাবেই। ঠিক যেমন ক্ষুদ্র একটি পানির ফোটা বড় পানির ফোটার দিকে মিলিত হতে তীব্র গতিতে ধাবিত হয়, তেমন। ব্যাত্যয় ঘটলেও সত্য প্রতিষ্ঠা পাবেই। আবার ব্যাত্যয়ও ঘটে কোন এক সত্য বা সূত্রের কারনে। তবে সবাই সব সূত্র পর্যালোচনা করে না। যিনি সেটি বুঝতে সক্ষম হন তিনি কোন লোভের কারনেই সত্য বিচ্যুত হতে চান না। তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। পরিণাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল। তথাপি সত্যের পথে নিজেকে ধরে রাখা কঠিন।

রাজনীতিতে আবির্ভূত দর্শনের অনুসারিগন প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পক্ষ শক্তি মনে করে। কেউ কারও কাছে নত হতে চায় না বা হতে পারে না। এমতাস্থায় কে প্রকৃত অর্থেই সত্য পথে পরিচালিত সে বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে দেখা দেয়। পক্ষগুলি মুখোমুখী অবতীর্ণ হয় এবং সেটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সত্যের নাগাল পাওয়া হবে সুদুর পরাহত। পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে। এমনই আল্লাহর পরিচালন প্রক্রিয়া।

“... যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। ...।” (আল-কোরআন ২:২৫১)

রাজনীতির মুখোমুখী পরিস্থিতি তখনই সম্ভব হয় যখন দু’পক্ষ রাজনীতিতে সম-পর্যায়ের চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সত্য ও অসত্যকে দুটি সত্য বলা যেতে পারে। কেননা কে সত্য পথে অবস্থান করছে সে বিষয়টি অনিশ্চিত। দুটি পক্ষেরই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে অসত্য প্রতীয়মান হলেও প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক, ন্যায় বা সত্যের পক্ষ শক্তি মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের বোধটি সকলের মাঝে কাজ করে। উপরন্তু নিজের স্বার্থের পক্ষে সকলেরই আছে কঠিন যুক্তি। ফলে চরম সত্য থেকে যায় অধরা। আমরা যে সত্য প্রত্যক্ষ করি তা ‘আপেক্ষিক সত্য’।

বাস্তবে সত্য-অসত্য নির্ধারণ হয় মুখোমুখী পক্ষ সমুহের জয়-পরাজয় দ্বারা। সকলেই ন্যায় ও সত্য পথের দাবীদার। কে সত্য নিশ্চিতভাবে কেউ জানেনা। অ-উন্নত সমাজে সাংঘর্ষিক রাজনীতির জয়-পরাজয় কিংবা উন্নত সমাজে সংখ্যাধিক্যের

মতামত অর্থাৎ গনতান্ত্রিক পদ্ধতি আপাত সত্য-অসত্য নির্ধারণ করে। অর্থাৎ বিজয়ী পক্ষ সত্যরূপে আবির্ভূত হয়। বিজয়ী পক্ষ সত্যরূপে আবির্ভূত হয় সময়ের প্রেক্ষিতে। সময়ের প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, কেননা প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও নির্ণয় করা কঠিন। শক্তির খেলায় পরাজিত পক্ষও নিজেদের ন্যায়ের পক্ষ মনে করে যেতে পারে। কিংবা বলা যায় পরাজিত পক্ষও সত্যিকার অর্থে সত্যকে ধারণ করে থাকতে পারে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই পরম সত্য নয়, আপাত সত্য বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরই অনেকটা নির্ভর করে। যে কোন প্রকারেই হোক, মূলত সমসাময়িক সময়ে সংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের দিকে সত্য আপাত ঝুঁকে থাকে। সময়ের প্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তনে বিপরীত শক্তিও কখনও সত্যরূপে আবির্ভূত হতে পারে।

যেহেতু কোন পক্ষ জয়ী হবে সে বিষয়টি অনিশ্চিত, ফলে সত্যের পক্ষ শক্তিকে পূর্ব থেকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টিও থেকে যায় অনিশ্চিত। বিভক্ত সমাজে এক একটি পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে অবস্থান নেয়। চুম্বকের মত। সব দিকেই জ্ঞান ও বোধ সম্পন্ন মানুষের উপস্থিতি থাকে।

মুখোমুখী অবতীর্ন সত্য ও অসত্য একে অন্যকে উৎপাটন করতে চায়। বাস্তবে যা কোনদিন সম্ভব নয়। কোন পক্ষ উৎপাটিত হলে নতুনরূপে নতুন নামে আরেকটি বিরোধী পক্ষ দাড়িয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে না। রূপ পরিবর্তন করে টিকে থাকবে। যথাসময়ের অপেক্ষা করবে। আপাত প্রতীয়মান সত্য ভূল করলে পতন ঘটবে। এগুলি সৃষ্টির শর্ত। স্বয়ং বিধাতা প্রসূত। এভাবেই তিনি সত্য ও ন্যায়কে সকলের হাত দিয়েই প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তিনি চাইলে এমনটি নাও করতে পারতেন। বিধাতা নিজেই সেটি করেননি।

"... যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তিনি মানুষকে একই জাতিসত্বায় পরিণত করতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর মার্জনার অন্তর্ভূক্ত করেন। ...।" (আল-কোরআন ৪২:৮)

তিনি এককে অপরের জন্য করেছেন পরীক্ষাস্বরূপ। এ পরীক্ষা একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি সত্যকে সমুন্নত রাখেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে যারা প্রকৃতই জগৎ পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বা

ভেতরের বিষয়গুলি জানেন বা বোঝেন, কেবল তারাই বিষয়টির গুরুত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব বা অনুধাবন করতে সক্ষম।

"সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি ... এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরন, তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৩-৩৫)

অতএব সত্যকে সমুন্নত রাখাই রাজনীতি তথা মানব জীবনের মূল কাজ। অপরাপর সকল কাজ এর সহযোগী।

যদি কোনদিন এক পক্ষ দ্বারা অপর পক্ষকে পরিপূর্ণরূপে উৎপাটন করা সম্ভব হয়, বিধাতা বা প্রকৃতির অনুমোদন ব্যাতিত যা আদৌ সম্ভব কিনা জানা নেই, তবে জগৎ সেদিন নিশ্চল-নিশ্চুপ হয়ে যাবে। অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা শক্তির যে কোন এককগুলির চরিত্র সেদিন নতুনভাবে লিখিত হতে হবে।

রাজনীতি বা সত্য-অসত্য নির্ধারণে শক্তির উৎস

সত্য-অসত্যরূপে দু'টি পক্ষ যখন মুখোমুখি দাড়ায়, জয়-পরাজয় নির্ভর করে পক্ষসমুহের ধারণকৃত শক্তির ওপর। শক্তি কেবল অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। ঠিক যেমন জয়-পরাজয় বিষয়টি স্বল্প মেয়াদী নয়। অস্ত্রের শক্তি সাময়িক। দীর্ঘ মেয়াদী শক্তি নির্ভর করে মূলত মানসিক ও ধারণাগত শক্তির ওপর।

মানসিক শক্তি নির্ভর করে ন্যায়বোধ ও সঠিক পথে অবস্থান করতে পারার ওপর। অধিকাংশ মানুষ যখন ন্যায়ের স্বপক্ষে অবস্থান নেয় শক্তি তখন তুঙ্গে অবস্থান করে। সকল পক্ষই তাই নিজ দলে সমর্থক সৃষ্টি করার নানান কলাকৌশল অবলম্বন করে। নিজের ন্যায়সম্মত অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে।

সত্য-অসত্যরূপে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী যখন মুখোমুখী দাড়ায়, জয়ী হওয়ার প্রত্যাশায় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী লড়াইয়ের ময়দানে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। তারা তাঁকে স্মরণ করে মূলত দলীয় শক্তি উজ্জীবনে। কেননা এ স্মরণ বিশ্বাসীর

অন্তরে সাহস ও দৃঢ়তা প্রদান করে। এটি সম্ভব হয় তার বাছাইকৃত ধারণায় পূর্ব স্থাপিত বিশ্বাসের কারনে। বিষয়গুলি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ না করলেও ন্যায়-অন্যায়ের বোধ বা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে দৃঢ়তা অর্জন করে। যে বোধের অন্তর্নিহীতে অবস্থান রয়েছে মূলত বিধাতা প্রদত্ত সত্য বা সূত্রের জ্ঞান। সেটি পক্ষসমুহ মুখে স্বীকার করুক কিংবা না করুক। মূলত উভয়েই নিজ নিজ ছকে বিধাতা প্রদত্ত জ্ঞানকেই কাজে লাগায় এবং তাঁর ইচ্ছেকেই প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়, তা সে বুঝে করুক কিংবা না বুঝে করুক। কেননা তিনিই সত্য এবং তিনি সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করবেন, যাকে ইচ্ছে তাকে ব্যাবহার করে। তাঁকে কারও কাছেই জবাবদিহি করতে হবে না।

“তিনি (আল্লাহ) যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা (মানুষ) জিজ্ঞাসিত হবে।” (আল-কোরআন ২১:২৩)

অন্তরে নিহিত শক্তি ও ন্যায়বোধের মধ্যে সূক্ষ অথচ কঠিন সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন কেন্দ্রীয় টানের ফল। সকল কর্মকান্ড সত্যের দিকে ধাবমান। লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত ধারাবাহিক জীবন ও কর্মকান্ড এভাবে চলতেই থাকে।

ময়দানে মুখোমুখী দাড়িয়ে বিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তৃপ্ত হওয়ার কোন কারন নেই। কেননা সৃষ্টিকর্তা কোন পক্ষকে কথা দেননি তার পক্ষাবলম্বন করার। তাঁর সেটি প্রয়োজনও নেই।

ছল ছল চোখ কিংবা কাঁদো কাঁদো গলায় আবেগ সৃষ্টি করে পৃথিবীর কোটি মানুষকে দলে যুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে নয়। সৃষ্টিকর্তা যেমন দয়াময়, ঠিক তেমনই রুদ্র ও কঠিন। বস্তুত তিনিই সত্য। সত্য বড় নির্মম, বড় কঠিন। সত্য সূত্রের বাইরে যেতে পারে না। যেমন কম্পিউটারকে ভেঙ্গে ফেললেও সে তার নির্দেশের বাইরে যাবে না বা যেতে পারবে না। আর যদি যেতেও হয় তো আরেকটি সূত্রকে স্থাপন করে নিতে হয়। যার সম্ভাব্যতা কেবল সৃষ্টিকর্তা বা বিধাতাই অনুমোদন করতে পারেন। অর্থাৎ যদি তিনি সে জ্ঞান কাউকে প্রদান করেন।

সত্য তখনই নম্র, নরম ও নমনীয় যখন সবকিছু সূত্র মেনে চলে। অর্থাৎ সঠিক পথে চলে। সূত্রের বাইরে গেলে তা প্রচন্ড কঠিন। ঠিক যেমন সত্য ও সঠিক পদ্ধতির সংস্পর্শে বরফ গলে গলে পড়ে অথচ ভূল পদ্ধতির প্রয়োগে তাকে হাতুরি দিয়েও ভাঙ্গা সম্ভব হয় না।

চোখের পানি, লেবাস, আবেগ কিংবা মিথ্যে আচরণ দিয়ে তাঁকে টলানো সম্ভব নয়। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে উপকার পেতে হলে সত্য ও সঠিক পথে অবস্থান করে সেটি প্রত্যাশা করতে হবে। ভূল পথে থেকে তাকে ডেকেও কোন লাভ নেই। লাভ হতে পারে তবে সেটি সাময়িক। সেটি হবে মিথ্যে আবেগ দ্বারা সৃষ্ট। যা সত্য নয়। মিথ্যে আবেগও কিছু সময়ের জন্য কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু সেটি হয় তার নিজেকেই চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য। তবে সেটি পরম সত্যের প্রতিষ্ঠাকে ক্ষাণিকটা প্রলম্বিত করে। তবুও সেটি ভাল, কেননা এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে সত্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়।

মিথ্যে আবেগ পরম সত্যের প্রতিষ্ঠাকে প্রলম্বিত করে। ফলে এর দায় মিথ্যে আবেগ সৃষ্টিকারীদের ওপর বর্তায়। যারা সত্যকে আবেগের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখে। তবে এটি সম্ভব হয় ততক্ষন, যতক্ষন শিক্ষা বা সত্যের জ্ঞান থাকে পশ্চাতপদ। এর আড়ালে আবার কিছু মানুষ সুবিধাও লুটে নেয়। তাই মিথ্যে আবেগ সৃষ্টির পরিবর্তে সত্যকে প্রকাশিত হতে দেয়াই উত্তম পথ।

সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি কোন চেহারার পক্ষে নয়, কোন লেবাসের পক্ষে নয়, কোন প্রতীক বা নামের পক্ষে নয়, সাময়িক সময় ব্যাতিত কোন আবেগের পক্ষে নয়, লোক দেখানো কোন কর্মের পক্ষে নয়- তিনি বিরাজ করেন সত্য ও ন্যায়ের মাঝে।

যে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকে সে সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, প্রকৃতি, সূত্র, সত্য বা সম্মিলিত মানবের নিরব ইচ্ছের পক্ষে থাকে। বিধাতা আপনা থেকে তার মাঝে বিরাজ করেন। বস্তুত এরাই বিধাতার নির্দেশনার প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী।

“.. যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। ...।” (আল-কোরআন ৪৭:৩)

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক এগুলি মানব প্রদত্ত কতগুলি প্রতীকী নাম। এসব নামের মাঝে তাঁর উপস্থিতি নেই। তিনি থাকেন কর্ম ও আচরণে, যখন কর্ম ও আচরণ থাকে সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে। তাই ওপরের কথাটিকে এভাবেও উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, যে সত্যের পক্ষে অবস্থান করে সেই বিশ্বাসী। সত্যের পক্ষে থাকাটিই মূল কাজ। সে পথে মানবকে ধরে রাখাই ধর্মের কাজ। পালিত ধর্মীয় নিয়ম-রিতি-নীতির গুরুত্ব আছে, তবে যদি তা সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলে তবে

তার প্রয়োজন নেই। সে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত। কেননা সকল নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, রিতি-নীতি পরিপালনের একটি লক্ষ্য আছে। সেটি হলো মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে/নিজেদেরকে রক্ষা করে চলা। এটিই তাকওয়া অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ পারফেকশন (Perfection) বা বিচ্যূতিবিহীন যা সঠিক ও সত্য। এ পথে চলার পরিণাম শুভ। স্বর্গীয় সূখ প্রাপ্তি। সেটি যেমন সত্য ও সূত্রের কারণে, তেমনি পবিত্র গ্রন্থসমুহে বিধাতা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কারণেও। ন্যায় বিচ্যূত হয়ে কখনই সেটি অর্জন সম্ভব নয়।

"... তোমরা সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিও না ...।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

"সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি, যেখানে তারা আরোহন করত এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালংক যেখানে তারা বিশ্রাম নিত এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ, তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৩-৩৫)

"স্বল্প জ্ঞানের লোকেরা বেদ/গ্রন্থের অলঙ্কৃত শব্দগুলির প্রতিই অধীকমাত্রায় সংযুক্ত/মনোযোগী হয়ে থাকে (সত্যের জ্ঞানের প্রতি নয়) ...।" (গীতা ২:৪২-৪৩)

ভূল বোঝার অবকাশ নেই। ধর্ম বলতে এখানে ধর্মীয় বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান, রিতি-নীতি সমুহকে বোঝান হয়েছে। বস্তুত সত্যের পথই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম।

বিশ্বাসী নাম ধারন করা সত্বেও জ্ঞান ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভূলের কারনে একজন প্রকৃতঅর্থে বা অন্তরে বিধাতার সান্নিধ্য থেকে দুরে থাকতে পারে। অথচ সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী নামটি অর্জন করতে হলে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতেই হবে। কেউ আবার অবিশ্বাসী নামে পরিচিত হওয়া সত্বেও অন্তরে ও কর্মে বিধাতা প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে চলতে পারে। ফলে বিধাতার বিচার ব্যবস্থা সূক্ষ। চোখের দেখাই সব নয়। তাই কেউ বলার বা দাবী করার ক্ষমতা রাখে না যে, তার ভবিষ্যৎ পরিণাম কি। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে অবগত।

"... তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ এর জন্য তোমাদের হিসেবের মুখোমুখী করবেন। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২:২৮৪)

ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিতে ব্যার্থ হলে মানবের ভেতরের শক্তি উজ্জীবিত হয় না। তেমন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার স্মরণও সফলতার পেছনে কাজ করে না। এগুলি অদৃশ্য কোন কেন্দ্রীয় টানের ফল। যা অন্তরে অনুভব করা সম্ভব।

ব্যাক্তি নিজে যখন নিজের ন্যায় বিচ্যুত কর্মকান্ড বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকে, তখন একটি পক্ষে বা দলে অবস্থান করা সত্বেও সেটি তার অন্তরের শক্তিকে দুর্বল করে। নিভৃতে নিজেদের কর্মকান্ডের ভূল বুঝতে সক্ষম হলে, ভূলের অনুসারি প্রতিটি ব্যাক্তির বিনাশিত শক্তি সমষ্ঠির শক্তিকে নাশ করে। যদিও ভূলের অনুসারিরা বাইরে শক্তিশালী রূপ প্রদর্শন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। সেটি করে বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণকারী বিশ্বাসীর অন্তরস্ত শক্তি সত্যের কেন্দ্রীয় টানের সূত্রের বিপরীতে চলে। ফলে টিকে থাকতে পারে না। বিষয়টির মধ্যে কোন অলৌকিকতা নেই। এটিও সূত্র মেনে কাজ করে। কেন্দ্রীয় টানের বা টানের বিপরীত সূত্র।

রাজনীতিতে সত্য-অসত্য নির্ধারণে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে তাই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কারনেই সত্য-অসত্যরূপে মুখোমুখী অবতীর্ণ পক্ষ সমুহের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তারা যেমন পরাজিত হতে পারে, আবার যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে না তারাও জয়ী হতে পারে।

কোন একটি বিতর্কিত বিষয়ে ন্যায়ের পক্ষে কে অবস্থান করছে সে বিষয়টি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক এ জাতীয় নামের ওপর নির্ভর করে না। জয়-পরাজয় বিষয়টি অবশ্যই ন্যায়ের স্বপক্ষে অবস্থান করার ওপর নির্ভর করে। আর সৃষ্টিকর্তা ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করেন। মূলত সৃষ্টিকর্তাই ন্যায় ও সত্য।

"... আল্লাহ! তিনিই সত্য ..." (আল-কোরআন ২২:৬)

"... আমার চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য নেই ..." (গীতা ৭:৭)

বিবাদমান পক্ষসমুহের মধ্যে যারা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করে ও সমুন্নত রাখে মূলত তারাই সৃষ্টিকর্তার পক্ষ শক্তি। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তারাই তাঁর নির্দেশ পালনকারী, তা সে যে নামেই পরিচিত হোক। বাস্তবে সৃষ্টিকর্তার সত্য ও ন্যায়ের রূপটি ফুটে ওঠে সময়ের প্রেক্ষিতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কোন একটি পক্ষাবলম্বনের মধ্য দিয়ে। মূলত অধিক সংখ্যক মানুষের সম্মতিই আপাত শক্তির উৎস; তবে সব সময় নয়। সত্য ও ন্যায় পথে অবস্থানই শক্তির মূল উৎস।

অসত্যের জয়

রাজনীতির জয়-পরাজয় দ্বারা সত্য-অসত্য নির্ধারিত হয় সময়ের প্রেক্ষিতে। সত্যিকারের বা দীর্ঘমেয়াদে জয়-পরাজয় নির্ভর করে ন্যায়ের স্বপক্ষে অবস্থান করার ওপর। তাই নিজেদের সত্যরূপে প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির পক্ষসমুহ শক্তি সঞ্চারের চেষ্টায় নানারূপ কূট-কৌশল অবলম্বন করে। সত্য ও অসত্যকে যখন মুখোমুখী হতে হয় তখন কূট-কৌশল অবলম্বনের কারনে অসত্যেরও জয় হতে পারে। সে কারনে ওপরে আপাত সত্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অধিকাংশ মানুষ যখন ভূল সিদ্ধান্ত নেয় তখন অসত্যেরও জয় হয়। এর পেছনে কাজ করে রাজনীতির কূট-কৌশল, যা মানুষকে ভূল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে। অধিকাংশ মানুষ ভূল সিদ্ধান্ত নিলে প্রকৃত সত্য পরাজিত হয়। তথাপি সেখানেও ন্যায়বোধ কাজ করে!

যখন অন্যায় ও অসত্যের জয় হয়, তখন সাধারণ মানুষ যারা অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে, তারা সে পথটিকে সঠিক ও ন্যায় বলে মনে করে। ফলে যতক্ষন সঠিকতা বা ন্যায়ের জ্ঞান ভূলের ওপর ভিত্তি করে বজায় থাকে, ততক্ষন ভূল পথেই সদস্যদের শক্তি তুঙ্গে থাকে। ফলে অসত্যও জয়ী হতে পারে। এটি ঘটে কূট-কৌশল অবলম্বনের কারনে।

মানুষ যখন ভূল বুঝতে পারে, তখন সমষ্টির মধ্যে এক একটি এককের বা সদস্যের মানসিক শক্তি নাশ হতে থাকে। এক সময় সমষ্ঠিই দুর্বল হয়ে যায়। অসত্যের জয় তাই সাময়িক। অসত্য ততক্ষন জয়ী হয়ে থাকে যতক্ষন মানুষ সত্য অনুধাবনে ব্যার্থ হয়। অন্য কথায় যতক্ষন কূট-কৌশল অবলম্বনকারীরা অধিক

সংখ্যক মানুষকে ভূল বোঝাতে সক্ষম হয়। ঠিক যেমন চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে কিছুদিনের জন্য নিম্নমানের দ্রব্যও ব্যবসা করে নেয়।

ব্যাক্তি এবং ব্যাক্তি থেকে সমষ্ঠির মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধটি সর্ব সময়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অসত্যকেও মানুষ যখন সত্য জানে তখন সেখানেই সে শক্তি খুঁজে পায়।

চোর কিংবা ডাকাত হয়ে মানুষ জন্ম নেয় না। অথচ চোর কিংবা ডাকাত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সে একটি ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তির সন্ধান করে। সে তার অভাব তার দুর্দশার জন্য সমাজ বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে অন্যায়কে দেখতে পায়। অন্যায়কারীদের প্রতি বিধাতা প্রদত্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ দেখতে পায়। এতকিছু অনুধাবনের পরে সে মন্দ পথে নামে। সে তখন তার অন্যায়কে ন্যায়ে পরিনত করে নেয়। কর্মে শক্তি পায়। সফল হতে পারে। এক সময় পেশাদারিত্ব অর্জন করে।

অসত্যের জয় কিছু বার্তা বহন করে। যেমন প্রথম বার্তাটি হল, মানুষ এমন এক সৃষ্টি যার ভেতরে কোন একটি বিষয় ন্যায় বা সঠিক বলে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হলে তাকে দিয়ে সহজে ভূল কাজও করিয়ে নেয়া সম্ভব।

ভূলটি যেন ন্যায় বলে প্রতিয়মান না হয় সে জন্য সমাজে মানুষের কিছু করণীয় আছে। মানুষ যখন নিরবিচিছন্নভাবে তার করণীয় কাজ থেকে দুরে সরে আসে তখন অন্যায় ও অসত্যের জয় হয়। অসত্যের জয় সত্য পথ থেকে মানুষের দুরত্বকে নির্দেশ করে।

অসত্যকে চিহ্নিতকরন ও স্পষ্টকরনে অসত্যের জয় সাময়িক সময়ের জন্য প্রয়োজনও বটে। নইলে অসত্য সত্যের ভেতরে চুপটি করে বসে থেকে অনেক বড় ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হতে পারে। অসত্যের জয় অসত্যকে বড় পরিসরে স্পষ্টকরন বা চিহ্নিতকরনে ভূমিকা রাখে।

মানুষকে জাগ্রতকরনের প্রয়োজনে দুর্যোগ বা অসত্যের জয় কখনও কখনও প্রয়োজন। এটি মানুষকে সচেতন করে তোলে। কখন হাল ধরতে হবে তার নির্দেশক হয়ে কাজ করে। সৃষ্টির পরিচালনায় অসত্যের সাময়িক জয় একটি অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজনীয় অংশরূপে প্রতীয়মান হয়। মানুষ যদি সঠিক পথের রজ্জু

সর্বদা ধরে রাখতে সক্ষম হতো তবে অসত্যের জয় হতো না। এ উপলব্ধিবোধের জন্যও অসত্যের জয়ের প্রয়োজন আছে।

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (সত্য ও ন্যায়কে) সুদৃঢ় হস্তে ধারন কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ..." (আল-কোরআন ৩:১০৩)

উদ্ধৃতিটি কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। এটি কোন নির্দিষ্ট দলের জন্য প্রযোজ্য বক্তব্যও নয়। এটি ধর্মান্ধতার স্বপক্ষের কোন বক্তব্য নয়। এটি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা। যা অন্যায়ের বিপক্ষে সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে মানুষকে উজ্জীবিত করে। এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' শব্দটি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। উদ্ধৃত শব্দটিকে ভূলভাবে অনুধাবন করার কোন সুযোগ নেই। অবশ্যই সকলকে শব্দটির সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে হবে।

অসত্যের জয় আরও যে বিষয়টিকে বুঝতে সহায়তা করে তা হলো- যারা সত্য পথের ধারক ও বাহকের দাবীদার বলে পরিচিত, সমসাময়িক সময়ে তারা তাদের অজান্তে হলেও কোথাও ভূল করে চলেছে। অসত্যের জয় তাই সত্য পথের দাবীদারদের কোন না কোন দুর্বলতাকেও নির্দেশ করে। এটি নিজেদের ত্রুটি বিচ্যূতি অনুসন্ধান করে শুধরে নেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের তাগিদ প্রদান করে। এ সময়ে নিশ্চুপ বসে থাকার অবকাশ নেই। তবে ধ্বংস অনিবার্য।

ধ্বংস কেবল ধ্বংসই নয়। ধ্বংস মানে নতুন সৃষ্টির সূচনা। সঙ্গে বর্তমান পরিচালন পদ্ধতির উন্নততর পরিবর্তন। অসত্যের জয় এ্যাডজাষ্টমেন্ট প্রক্রিয়ার একটি অংশ। যা সত্যের পুনঃস্থাপনকে সম্ভব করে তোলে। অধিকাংশ মানুষ ন্যায়ের সমর্থন বা স্বপক্ষে না দাড়াবার শাস্তি বা পরিণাম অসত্যের জয় ও তার পরবর্তী ফলাফল।

মানবের জন্য আশার বার্তাটি হলো বিধাতা কোন পক্ষকে চিরতরে অপসারন করেন না। প্রতিটি অন্তর, জগতের প্রতিটি উপাদান চেতনে বা অবচেতনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর মুখাপেক্ষি বা তাঁর প্রতি সমর্পিত। বাইরে প্রকাশের রূপটি কেবল ভিন্ন। কোন পক্ষকে দুরে সরিয়ে দেয়া তার কাজ বা লক্ষ্য নয়। কোন পক্ষের সঙ্গে তাঁর ব্যাক্তিগত মিত্রতা বা শত্রুতা নেই। তিনি কোন পক্ষ বিশেষের নন। তিনি সকলের। সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। সব কিছুই তাঁর অতি প্রিয়। তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন। যথাসময়ে সকলেই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়

আবার অপ্রয়োজনীয়ও বটে। তিনি জানেন ভূল অংকের কারনে আজ যাকে দুরে চলে যেতে হয়েছে, পরবর্তী টার্নে সে-ই আবার সত্যকে ধারণ করে আবির্ভূত হবে। আজ যে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত সেও বিচ্যুত হবে।

“.. হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, যিনি সকল পাপ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আল-কোরআন ৩৯:৫৩)

ক্ষমার মধ্য দিয়ে সকলকেই তিনি কাছে টেনে নেন, যদি কেউ ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। জীবন সকল পক্ষের জন্যই এক পরীক্ষার আগার। আজকের বিতারিত কর্ম ও আচরণে সভ্য হলে সেখানেও মধু সঞ্চিত হতে থাকে। সঞ্চিত মধু একদিন ফলদায়ক হয়ে ওঠে। যেমন মাটির নিচের পঁচনশীল পদার্থগুলি একদিন মূল্যবান হয়।

তিনি এককে দিয়ে অপরকে প্রতিহত করেন। প্রতিহত করেন সমসাময়িক সময়ে ভূল পথগামীদের। এভাবে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখেন। সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন সময়ের প্রেক্ষিতে। নিখুঁত তাঁর পরিচালন পদ্ধতি!

“... যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি (বিশ্বাসীদের ছাড়াই) তাদের (অবিশ্বাসীদের) শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। ...” (আল-কোরআন ৪৭:৪)

রাজনীতি ও ধর্ম

ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বলে বাস্তবে সত্য-অসত্য নির্ধারণ হয় সাংঘর্ষিক রাজনীতির জয়-পরাজয় দ্বারা। বিবদমান পক্ষগুলি প্রত্যেকেই নিজেদের সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ শক্তি মনে করে। সত্য-অসত্য তাই সময়ের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। পরম সত্য থেকে যায় অধরা।

রাজনীতির খেলার সাংঘর্ষিক পর্যায়ে এসে দর্শন কিংবা আদর্শ কেবলমাত্র দর্শন কিংবা আদর্শের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। মুখোমুখী দলগুলি অবতীর্ন হয় বাঁচা-মরার লড়াইয়ে। সত্যরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় পক্ষসমূহ শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। শক্তি সঞ্চয় করতে গিয়ে নানান কূট-কৌশল ও সূক্ষ ছলনারও আশ্রয়

নেয়। ফলে নীতি-নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যা আদর্শ বা ধর্মচ্যুত আচরণ।

জয়ী হওয়ার প্রত্যাশায় যেখানে নৈতিক স্খলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় সেখানে সৃষ্টিকর্তার নাম ব্যবহার না করা শ্রেয়। কেননা সৃষ্টিকর্তার ধারণা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। অথচ বিবদমান পক্ষসমুহের মধ্যে কে সত্যের পথে অবস্থান গ্রহণকারী সে বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠা করা যায় না পক্ষসমুহের শক্ত অবস্থানের কারনে। কেননা নামের মাঝে সত্য বর্তমান নয়। সকলেই নিজেদের সত্যের পক্ষ শক্তিরূপে পরিচয় দেয়। বস্তুত সে সম্ভাবনা উড়িয়েও দেয়া যায় না। ফলে দলীয় নাম যতই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য প্রকাশ করুক না কেন, ন্যায়ের পথে অবস্থান গ্রহনে ব্যার্থ হলে পরাজয় বরণ করতে হতে পারে। এই জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সৃষ্টিকর্তার মহৎ ধারণাটি কোন এক পক্ষের পরাজয়ের কারনে অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যা ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহত করে। কেননা কেবল একটি দলই ধর্মপ্রাণ সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না বা করতে পারে না। তাছাড়া ব্যাক্তিক পর্যায়েও এসব বিষয়ে নানান জনের নানান মতামত থাকে।

সৃষ্টিকর্তার ধারণা সর্বসময়ে সর্বত্র সবার মাঝে বর্তমান। সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষের সঙ্গে অবস্থান করেন। সকল পক্ষের সঙ্গে অবস্থান করেন। তিনি জাগতিক দলীয় রাজনীতির কোন পক্ষ নন। তিনি মূলত ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করেন। যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে তারাই সৃষ্টিকর্তার পথে। যখন দলীয় স্বার্থ মূখ্য বিষয় হয়ে দেখা দেয় তখন সৃষ্টিকর্তার নামের ব্যবহার অবশ্য পরিহার্য্য। কেননা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ শক্তিরূপে পরিচয়দানকারী পক্ষের পরাজয়ের কারনে সৃষ্টিকর্তার মহৎ ধারণাটি অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাতে যারা দলভূক্ত না হয়েও সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসেন তাদের অন্তর ব্যাথিত হয়। তবে সকল পক্ষ সৃষ্টিকর্তার নামে সত্য ও ন্যায়ের দাবীদার হয়ে মাঠে অবতীর্ন হলে বিষয়টির একটি সমাধান হতে পারে। সেজন্য অবশ্য সৃষ্টিকর্তার ধারণাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু-

“তারা (মানুষ) আল্লাহকে তাঁর যথাযথ পরিমাপে পরিমাপিত/অনুধাবন করতে পারেনি। ...” (আল-কোরআন ২২:৭৪)

ধর্ম: সমালোচক, সমালোচনা ও বাস্তবতা

ধর্মীয় বিষয়গুলি তো বটেই এমনকি স্বয়ং বিধাতাকেও সকল মানুষ একই রকমভাবে উপলব্ধি করে না বা করতে পারে না। এর মাঝে যেমন আছে যথাযথ জ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণ, আবার আছে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারও। সমালোচকদের সমালোচনা তাই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরনে সহায়ক। একে মন্দ ভাববার কারন নেই। তবে অতি কঠোর সমালোচনার মধ্যে কিছু আছে জমানো ক্ষোভ। সেটিকেও অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে।

বিশ্বাসী হয়ে কেউ জন্ম নেয়নি। অবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিক হয়েও কেউ জন্ম নেয়নি বা নিতে চায়নি। আবার নিলেও বা সমস্যা কি যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে? কেননা বিধাতা তো ন্যায় ও সত্যের মাঝে বিরাজ করেন। মানুষের প্রতি তাঁর নির্দেশনাও সেটি। যে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে- স্বীকার করুক বা না করুক, চেতনে বা অবচেতনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে বিশ্বাসের পথেই থাকে। কেবল ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতাগুলির রূপ ভিন্ন হতে পারে।

সমাজে সুবিধাজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত অথচ সত্য পথের দাবীদার, যারা সত্যের বাণীর প্রচারক অথচ যাদের আচরণ সত্য থেকে বিন্দু বিন্দু পরিমানে হলেও বিচ্যুত হতে চলেছে, কিংবা ভূল যাদের গ্রাস করতে চলেছে এবং জ্ঞানের প্রসারনের স্বীকৃতি যখন রুদ্ধ হতে চলেছে এবং যারা প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়মের সুযোগ নিয়ে চলেছে- প্রকৃতি পরিচালনার স্বাভাবিক/স্বয়ংক্রিয় নিয়মেই তারা নতুন নামে আবির্ভূত কোন নতুন প্রতিপক্ষের মুখোমুখী হতে বাধ্য। কারন এগুলি মানুষ করে না। অথচ মানুষই করে প্রকৃতি বা বিধাতার ইশারায়।

বিধাতা কিংবা প্রকৃতি যাই বলি না কেন সব কিছু তিনি করেন ভারসাম্য বা সৃষ্টিকে রক্ষার্থে বা অন্য কথায় যথাযথ পরিচালনার স্বার্থে। প্রকৃতি তার পরিচালন ব্যবস্থায় যখন সূত্র বা সত্য থেকে কোন বিচ্যূতি দেখতে পায়, তখন একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হলে আপনা থেকে ভারসাম্য রক্ষার্থে বা সূত্র বা সত্যের পুনঃস্থাপনে ব্যাবস্থা গ্রহণ করে।

প্রকৃতি ধারণার বাইরে প্রকান্ড ও বিশাল। ভীষন রুদ্র ও অপ্রতিরোধ্য। সৃষ্টিকে রক্ষার্থে সে তার সূত্রের সংরক্ষন, সত্য পুনঃস্থাপন কিংবা নতুন সূত্র স্থাপন করবেই। মিথ্যে ধ্বংস হতে বাধ্য। মিথ্যে বা ভূল ধ্বংস হবেই।

"... মিথ্যে (তার প্রকৃতি অনুসারেই) বিলুপ্ত হতে বাধ্য।" (আল-কোরআন ১৭:৮১)

এগুলি মানুষ করে না। অথচ মানুষই করে। সে করে তার কল্পনা ও ধারণা করার ক্ষমতার বাইরে প্রকান্ড যে প্রকৃতি, সে প্রকৃতি যে পথে চলে যা সে নিজেও দেখতে বা অনুভব করতে পারে না, সে সত্যের পথে ভাসতে ভাসতে। সে করে- প্রকান্ড প্রক্রিয়ার এক অতি অতি ক্ষুদ্র অংশ বা উপাদান হয়ে। যে উপাদানগুলি কোন একটি বিষয় বা বস্তুর প্রতি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আচরণ প্রদর্শন করে।

"নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সে কি মনে করে যে, তার ওপর করও কোন ক্ষমতা নেই? " (আল-কোরআন ৯০:৪-৫)

মানুষ কি মনে করে তার ওপরে কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছে! আর তাই বিপরীতে চলার তার কোন ক্ষমতাই নেই। এক অর্থে তার চালক তার 'বিধাতা'। কথাটির মর্ম সঠিক জ্ঞানে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কেউ যদি 'বিধাতা' শব্দটিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ না করে তবে শব্দটি হতে পারে 'প্রকৃতি'।

"... তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলি নাম নিয়ে বিবাদ করতে চাও যা তোমরা নিজেরা সাব্যস্ত করেছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা; ..." (আল-কোরআন ৭:৭১)

"এগুলি তো তোমাদের দেয়া ফেরেশতা/দেবতাদের কতগুলি নাম বৈ আর কিছু নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা দিয়েছ; ..." (আল-কোরআন ৫৩:২৩)

সত্যি বলতে বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে বিধাতা বা প্রকৃতি বা অপর কোন নাম বা শব্দ নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। কোন নাম বা কোন সঙ্গা দ্বারা বিধাতাকে একটি গন্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলা মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য ওপরের উদ্ধৃতি দু'টি তুলে ধরা হলো।

সৃষ্টির পরিচালনারই একটি অংশ হিসেবে প্রতিপক্ষ হয়ে সত্য-অসত্য যখন মুখোমুখী দাড়িয়েছে তখনই জৈন, বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত সত্যের এ সময় নিজেদের শুধরে নেয়ার সময়। নয়তো নতুনকে আলিঙ্গন

করার সময়। বিরোধের উত্থান নিজেদের ভূল বা বিচ্যূতির কারন কিংবা মানুষের অন্তরের কথাটি পড়তে না পারার কারন, কিংবা জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সত্যকে অনুধাবন করে এগুতে না পারার কারন বিষয়টিকে সেভাবে বুঝতে ও স্বীকার করে নিতে হবে। যে করবে না সে আবারও ভূল করবে। কিংবা প্রকারান্তরে নতুনের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করবে।

যারা বর্তমানে আরোপিত ধর্মসমুহের নানাবিধ সমালোচনা করে, তাদের অপছন্দনীয় অনেক কর্মকান্ডের পরেও অন্তত এ কাজটুকু প্রশংসনীয় যে, সাহস নিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত আরোপিত ধর্মসমুহের মধ্যে যে সব বিচ্যূতি প্রবেশ করেছে সে সব বাস্তব বিবর্জিত, বিরক্তিকর, অযৌক্তিক কিছু বক্তব্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। তারা কু-সংস্কারের বিপক্ষেও কথা বলে যাচ্ছে। যা সাধারন বা জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন অনেক মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তারা যে কেবল খারাপ করছে তা নয়। তারা বাস্তব বিবর্জিত ও অলীক সব কর্মকান্ড থেকে বাস্তব ও সত্যের পথে ফিরে আসতেও মানুষকে উৎসাহিত করছে।

বর্তমান বাস্তবতায় আরোপিত ধর্মসমুহের সমালোচকদের কর্মকান্ড যতটা না ক্রিয়া তার চেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া। সমালোচকদের অনেকেই বিভিন্ন ধর্ম থেকে এসেছে। ধর্ম তাদের ধরে রাখতে পারেনি। কিংবা নিজেদের প্রয়োজনীয় সংশোধন না করে নানাবিধ ভূল আচরণ দিয়ে তাদের বিতারণ করেছে। নয়তো তারা নিজেরাই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

বিধাতাকে কেউ কখনও ছেড়ে যায় না। যেতে চায় না। যেতে পারে না। অনিচ্ছায় বা অবচেতনে হলেও বিধাতা সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের রেশ একজন আপাতদৃষ্টে পরিত্যাগকারীর অন্তরে থেকে যায়। তবে একই সাথে এরা অন্যের ভূল বক্তব্যের কারনে বিচলিত, দিশেহারা। নিজেরা সত্যটি অনুধাবন ও প্রকাশে ব্যার্থ। তাই তারা নিজ পথ পরিত্যাগ করে বলা যায় অনেকটা পলাতকের ন্যায় আচরণ করে। এরা কুসংস্কার ও আরোপিত দর্শনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের বিপক্ষে সত্যটিকে তুলে না ধরে অধৈর্য্যের ন্যায় আচরণ করে। যে আবর্জনা যুগের পর যুগ সময় নিয়ে একটু একটু করে সত্যের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়েছে, তা একদিনে মুছে ফেলার নয়।

উপরোক্ত ধরনের লোকগুলি সাধারনত বাস্তব বিবর্জিত অলীক কথাবার্তার চেয়ে সম্পদের অসম বন্টন বা বৈষম্যের বিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা জ্ঞানত জানে যে এটি জাগতিক সকল কর্মকান্ডের মূল। এরা বাস্তববাদী।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে- কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত ধর্মীয় বোদ্ধারা ধর্মীয় দর্শনের মূল বক্তব্য ও তার বাস্তবসম্মত প্রয়োগের বিষয়গুলিকে পরিহার করে কেবল পবিত্র গ্রন্থের শুদ্ধ উচ্চারন ও নানান আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রতি জোর দিয়ে চলেছে। তারা দর্শনের মর্মার্থ নিয়ে আলোচনায় খুব বেশী আগ্রহী নয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাপড় টেনে দেয়ার প্রতি জোর দিয়ে চলেছে। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মুখস্ত করে রাখতে পারলে পুরস্কার বিতরণ করছে। সমালোচকদের কাছে বিষয়গুলি জ্ঞানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয় না। নয়তো প্রতীয়মান হয় অজ্ঞতা বা অতি ধূর্ততা হিসেবে। এসব কাজ সমাজে ন্যায় বিচ্যুত কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করা থেকে সাধারণ মানুষের একটি বৃহৎ অংশের দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরিয়ে রাখে, যা ধর্ম প্রদর্শিত পথের বিপরীত আচরণ; ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়। সময়, যুগ, অগ্রগতি ও মানুষের বর্তমান সময়ের উন্নততর মানসিক অবস্থা ও অবস্থানকেও যে বিবেচনায় নিতে হবে সে বিষয়ে তারা উদাসীন।

জগতে অনেক মানুষ যখন ভূখা, নিপিড়ীত ও নানাবিধ বৈষম্যের শিকার তখন চোখ বন্ধ রেখে অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগের প্রতি মনযোগী না হয়ে বৈষম্য সৃষ্টির কারন ও প্রতিকারের বিষয়ে কথা বলা ও কাজ করা অধিক জরুরী। যা সত্য ও ন্যায়ের দর্শনের ধারক ও বাহক বলে পরিচিতদেরই মুখ্য করণীয়।

“এবং তুমি দেখবে তাদের (মানুষের/অন্যায়কারীদের) অনেকেই পাপ ও সীমালংঘনে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষনে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করছে। অবশ্যই তারা যা করে তা অত্যান্ত মন্দ। ধর্মযাজক এবং পন্ডিতব্যাক্তিগন কেন তাদেরকে মন্দ কথা বলতে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষন করতে নিষেধ করে না? তারা যা করে সেটিও মন্দ।” (আল কোরআন ৫:৬২-৬৩)

পেটে যার আহার নেই, যে বৈষম্যের স্বীকার কিংবা যে নির্যাতিত তার কষ্টের সঙ্গে কোন কিছুই তুলনীয় নয়। তখন যে কোন প্রকার উন্নয়নও অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। ধর্মের ধারক বাহক বলে পরিচিতদের সামনেই এমনসব ঘটনা ঘটে চলেছে। অথচ তারা মনযোগী অনত্র। তারা এসব নিয়ে কথা বলে না। তারা যেসব আলোচনা

করে বর্তমান সময়ে সেসব আলোচনা খুব বেশী গুরুত্ব বহন করে না। ফলে এগুলি গ্রহনীয় আচরণ হতে পারে না। তাই ধর্মের ধারক বাহক বলে পরিচিতদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখী হতে হবেই।

অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ধরনও সকলের এক রকম নয়। সমালোচকদের কেউ কেউ সীমা লঙ্ঘন করে এটিও সত্য। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক সভ্যতার দাবীদার হয়েও সভ্যতা বিবর্জিত ভাষার প্রয়োগে সভ্যতার ঘাটতির কমতি প্রদর্শন করে না। যদিও এটি জমানো ক্ষোভের মাত্রাকেও নির্দেশ করে। আবার ভূল পথগামীদের শক্ত বন্ধনকে ভাঙ্গার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার মাত্রাকেও নির্দেশ করে এটি।

সমালোচকদের অনেকে আবার বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ কিংবা সঠিকভাবে বিষয়সমুহ অনুধাবন না করেও সমালোচনা করে। কেউ আবার উত্তেজনাও সৃষ্টি করতে চায়। সমালোচকদের মধ্যে আবার দু'রকম আছে। একদল গভীরের রহস্য বুঝে কোন উদ্দ্যেশ্য নিয়ে সমালোচনা করে। আরেকদল না বুঝে কেবল প্রথমোক্তদের অনুসরণ করে।

সমাজ সংস্কার সহজ বিষয় নয়। আজকের বিজ্ঞান মনস্ক উন্নত সমাজেও সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে মানুষকে হয়রান পেরেশান হয়ে যেতে হচ্ছে। যারা হাজার বছর পূর্বে অন্ধকারে আচ্ছন্ন যুগে বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে সমাজে সংস্কার সাধন করার চেষ্টা করে গিয়েছেন, তাদের যারা সন্মান দিতে কাপর্ন্য প্রদর্শন করে তারা নিজেরাইবা কিভাবে সমাজ সংস্কার করবে? এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তিটাওবা কেমন হতে পারে? এমন সমালোচকদের কর্মটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যদিকে আস্তিক নাম ব্যবহার করে যারা অপরের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের কর্মটিও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সেটি সত্যিকারের আস্তিকদের কাজ কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। কেননা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আরোপিত দর্শন এমন কাজকে সমর্থন করে না।

"হে বিশ্বাসীগণ! ... তোমরা ... একে অন্যকে হত্যা কর না। ..." (আল-কোরআন ৪:২৯)

"বল: এসো, আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই যেগুলি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তা এই যে, ... যে জীবনকে আল্লাহ

পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন সে জীবনকে হত্যা কর না কেবলমাত্র বিচারের ক্ষেত্র ব্যাতিত। ...” (আল-কোরআন ৬:১৫১)

“কোন প্রাণকে বধ কর না যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়সম্মত কারন ব্যাতিত। যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা প্রদান করেছি, তবে হত্যার বিষয়ে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই! সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে” (আল-কোরআন ১৭:৩৩)

সত্যকে খুঁজে পেতে হলে আন্তরীক হতে হবে। কেবল নিজের ইচ্ছে বা ভালবাসার অংশটুকু জানলে হবে না, অপরের দর্শনটিও আন্তরীকতার সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। আর এগুলি করতে হবে সত্যকে জানার প্রয়োজনে। নিজেকে বলপূর্বক সত্য প্রমানের জন্য নয়। কিন্তু বাস্তবে বলপূর্বক কাজ করা হয় স্বার্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদাকে সংরক্ষনের জন্য।

বিশ্বাসীর দর্শন, অবিশ্বাসীর দর্শন সকল দর্শন ন্যায়ের কথা বলে। তবে সকল দর্শনকে ব্যবহার করে কিছু মানুষ চিরদিন সূক্ষ জ্ঞানে সুবিধা লুটে নিয়েছে। যারা এমন আচরণ করে তারা বাংলায় প্রতারক, ইংরেজীতে হিপোক্রেট এবং আরবীতে মোনাফেক। এরা যেমন আছে আস্তিকদের দলে। এরা আছে নাস্তিকদের দলেও।

মোনাফেকদের আচরণ প্রত্যক্ষ করে কোন একটি দর্শনকে মন্দভাবে সমালোচনা করা ভূল। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের ব্যার্থতার কারনে কিছু সমালোচক এমন আচরণ করে। ধর্মের মর্মবাণী ধনাত্মকভাবে আন্তরীকতার সঙ্গে নিজ জ্ঞানে অনুধাবন করার চেষ্টা না করে যারা অন্যের কাছ থেকে শ্রবন করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, কিংবা অর্ধেক জেনে সম্পূর্নের ওপর সিদ্ধান্ত নেয় কিংবা সম্পূর্ন জেনেও মর্ম কথা বুঝতে ব্যার্থ হয়- তারা ভূল বোঝে এবং কল্পিত অনুমান দ্বারা ভূল পথে চালিত হয়।

“.. কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা (মিথ্যে আশা নিয়ে) কেবল অনুমান করে।” (আল-কোরআন ২:৭৮)

বিদ্যুৎ অনেক উপকার করে। ভূল প্রয়োগে সর্বনাশ করতেও বিলম্ব করে না। ভাল রিতি-নীতি, বিধি-বিধানসমুহকেও যদি ভূলভাবে ব্যাখ্যা করে শিক্ষা দেয়া হয় কিংবা ভূলভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে সেখানেও বিপদের সম্ভাবনা লুক্কায়িত। এটি

দর্শন বা দিক নির্দেশনার সমস্যা নয়। অনুধাবনের সমস্যা। সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনের সমস্যা বা প্রয়োগের সমস্যা। কিংবা বলা যেতে পারে যারা প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা অধিকতর কৌশলে দর্শনের উদ্দেশ্য অর্জনের আড়ালে নিজেদের কোন সহজাত ধর্মের আকাংখা পুরনে ব্যাস্ত। কিংবা প্রতিপক্ষ পক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে পক্ষকে সর্বনাশে মেতে উঠেছে। এরাই মোনাফেক। এদের কারনে মানব সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট হয়।

বিশ্বাসী নিয়ে ওপরে যত আলোচনা করা হয়েছে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাসী বলতে সত্য ও ন্যায়ের পথে সঠিক বিশ্বাসীকে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যাদের দ্বারা স্পষ্ট অন্যায় সংঘটন সম্ভব নয়। এ লেখায় সত্য, ন্যায় ও সঠিক আচরণ বিচ্যূত কাউকেই বিশ্বাসী বলে ধরে নেয়া হয়নি। বিশ্বাস দিয়ে যারা মানবতার পরিবর্তে ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ হাসিলে নিয়োজিত- এখানে কোন ক্ষেত্রেই তাদেরকে বোঝানো হয়নি। এমন ক্ষেত্রে তেমন বিশ্বাসী সত্যিকারের বিশ্বাসী নয় বলে বিবেচিত হবে। সে হবে শর্ত ভঙ্গকারী। অর্থাৎ যেসব শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্বাসী হতে হয় সে তা ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

সঠিক বক্তব্য তুলে ধরার দায়িত্ব রয়েছে সত্যিকারের বোধসম্পন্ন মানুষদের। ভূল দেখে-শুনে ও বুঝে নিরব থাকা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। ক্ষণিকের এক জীবনে তা প্রয়োজনীয়ও নয়। কেননা সেক্ষেত্রে ভূল বিশ্লেষণকারীদের প্রচারিত বক্তব্যকেই সাধারণ মানুষ সঠিক মনে করতে পারে। যা পৃথিবীতে অজ্ঞতারই প্রসার ঘটাবে। প্রজন্মকে করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থ উপার্জন করে মানুষ কেবল খেতে ও ঘুরে বেড়াতেই পৃথিবীতে আসেনি। যাদের সামর্থ আছে তাদেরকে সংস্কারমূলক কাজে সহায়ক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেটি করতে না চাইলেও অন্তত মানসিক সমর্থন দিতে হবে।

ধর্মীয় দর্শন সমুহের যারা কট্টর সমালোচক তারা নিজেদের মুক্তমনা দাবী করে। অথচ তারা নিজেরাও নিজ গন্ডির বাইরে মুক্তভাবে ভাবতে চেষ্টা করে না। নিজস্ব গন্ডিতে আবদ্ধ থাকে বলে সমালোচক সৃষ্টিকর্তার বিষয়টিতে আগ্রহ পায় না। তাই এ সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দর্শনের মূল বাণীর উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যার্থ হয়। গভীরে সন্ধান ব্যাতিত কিভাবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া

যাবে? সত্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যার্থ হয়ে তারা মন্দ ভাষা প্রয়োগের পথ বেছে নেয়। এটি একটি দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন পলাতক আচরণ।

নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আন্তরীকভাবে যে কোন একটি বিষয়কে সত্য প্রমাণ করতে চায়, সে সেটি করতে পারে। যে চায় বিষয়টিকে মিথ্যে প্রমাণ করতে সেটিও সে করতে পারে। কেননা সত্যের মাঝে কিছু ভূল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ভূলই মিথ্যে হিসেবে পরিচিত। আবার যাকে মিথ্যে বা ভূল মনে করি তার মাঝেও কিছু সত্য জড়িয়ে থাকে। কোনটি কখন বড় আকার ধারণ করবে তা পরিস্থিতি ও সময়ই নির্ধারণ করে দেয়। এভাবে সর্বত্র কিছু সত্য আছে বলে সবাই টিকে আছে। নয়তো কোন একটি পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

“তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, ফলে ভূমিতে স্রোতধারা প্রবাহিত হয় সুনির্দিষ্ট পরিমাপে এবং প্লাবন স্ফীত ফেনারাশি নিয়ে ওপরে আসে। অলঙ্কার ও তৈজসপত্র তৈরীর জন্য সেগুলিকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয়, সেখানেও তেমনই ফেনারাশি উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ফেনা তো শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে অবশিষ্ট থেকে যায়। আল্লাহ এভাবেই দৃষ্টান্তসমুহ উপস্থাপন করেন।” (আল-কোরআন ১৩:১৭)

সত্যের প্রতি সত্য সহানুভূতিশীল। তাই কিছুটা সত্যের উপস্থিতীর কারনে সত্য কথিত মিথ্যেকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করতে পারে না। মিথ্যেকে ধ্বংস করতে গিয়ে সত্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে মিথ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিন্দু পরিমান সত্যকেও রক্ষা করতে। তাই সবাই নিজ অবস্থানে টিকে আছে।

বাদির পক্ষে যেমন কিছু সত্য আছে তেমনি বিবাদীর পক্ষেও কিছু যুক্তি ও সত্য থাকে। বিচারক চাইলে যে কোন পক্ষে রায় প্রদান করতে পারে। তেমনি আস্তিক্যের মধ্যে সত্য আছে, নাস্তিক্যের ধারণা ও বক্তব্যের মধ্যেও কিছু ন্যায় ও সত্য আছে। এটা এ কারনেই যে, সব কিছুর চালক স্বয়ং বিধাতা। কিন্তু তিনি যে প্রক্রিয়ায় জগত ব্যাবস্থাকে পরিচালনা করেন অনেকেই সেটি উপলব্ধি করতে পারে না, কিংবা যারা পারে তাদের অনেকে দলীয় রাজনীতি বা স্বার্থের কারনে বিষয়টি প্রকাশ বা স্বীকার করতে সব সময় পেরে ওঠে না।

মনের জড়তা ও বন্ধন মুক্ত হয়ে মুক্তচিন্তা করতে সক্ষম না হলে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যকে জানতে বা বুঝতে হলে তাই সকল পক্ষের সমালোচকদের দুটো বিষয় নিয়ে আন্তরীক হয়ে ভাবতে হবে। তবে যারা স্বার্থ কিংবা অহম দ্বারা চালিত হবে তাদের কিছুই ভাবতে হবে না। তারা যা করছে তাই করবে এবং পরিণাম ভোগ করবে।

"... তোমরা যা ইচ্ছে কর; নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।" (আল-কোরআন ৪১:৪০)

নাস্তিক অদেখা কিছুতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নয়। তারা জ্ঞানের চর্চায় আগ্রহী। বিজ্ঞানের দেখানো পথে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। বিজ্ঞান কেবল পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান কিংবা জীব বিজ্ঞানই নয়। সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলির মত নমনীয় বিজ্ঞানও বিজ্ঞান। যেগুলি মানুষ, সমাজ, মন, আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। আরোপিত ধর্ম সমুহও এক একটি বিজ্ঞান। এগুলির পেছনে কাজ করেছে পর্যবেক্ষন, ধ্যান, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা। কোন গবেষনাগারে এগুলির উৎপত্তি না হলেও বুঝতে হবে যে, মানুষ নিজেই এক স্বয়ংক্রীয় গবেষনাগার। বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড মেনে তার ভেতরের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সেভাবে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এমনকি কট্টর বিজ্ঞানও কখনও কখনও তার পূর্বের প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে সরে আসে। নতুন ব্যাখ্যা দান করে। চরম সত্যকে খুব সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

জগতের সব মানুষ এক রকম নয়। আবার সব মানুষের অবস্থা এবং সমস্যা এক রকম নয়। এখানে ধনী আছে গরীব আছে, সুখী আছে দুঃখী আছে, শিক্ষিত আছে নিরক্ষর আছে। এখানে নেতা আছে অনুসারী আছে, আস্তিক আছে নাস্তিক আছে, মানবের দেহ আছে আবার মন আছে। একেক ধরনের মানুষ ও বিষয়ের জন্য একেক রকমের প্রয়োজনীয়তা এবং তা পুরনে একেক রকমের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

সব সৃষ্টিই স্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এমনকি একটি ধারণাও। বুদ্ধ ধর্মে কোন ভগবানের স্থান নেই। কিন্তু মানব মন স্বয়ং বুদ্ধকে ভগবান বানিয়ে নিয়েছে। জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে তা তার প্রয়োজনে গড়ে উঠছে। একেক রকম মানবের অন্তরে একেক রকম প্রত্যাশা। সকলকে গ্রহণ করে নিয়েই টিকে থাকতে হবে।

জগতে যা কিছু ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সবকিছুই প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে বলে গড়ে উঠেছে। আবার বলা যায় বিধাতা বা প্রকৃতি বিষয়গুলিকে সেভাবে সম্ভব করে দিয়েছেন, তাই সেভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে। অর্থাৎ বিধাতা নিজেই সে প্রক্রিয়াটিকে সম্ভব বা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং সেটিই সত্যের পথ, যা বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত।

সত্য-অসত্য নাম ধারণ করে মানুষ একপক্ষ অপর পক্ষকে চিরতরে উৎপাটন করতে চায়। প্রকৃতি নিজে যা করেনি তার এক পক্ষকে উৎপাটন করতে চেয়ে মানুষ কি তা করতে পারবে? তার ফল কি ভাল হবে। মানুষ কি ঠেকে শিখতে চায়? কিছু বিষয় ঠেকে শিখতে চাইলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

প্রকৃতিতে রয়েছে মানুষের জন্য নিদর্শন। তিনি এক সমুদ্র বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন। দুটি সমুদ্র পাশাপাশি অবস্থান করে। কিন্তু একে অন্যকে ছাঁপিয়ে যায় না। পানি কোথাও নোনা কোথাও মিষ্টি। অথচ দুটো থেকে একই বস্তু উৎপাদিত হয়। দুটোই উপকারী।

"দু'টি সমুদ্র এক রকম নয়- একটি স্বচ্ছ, মিঠা ও পান করার উপযোগী এবং অপরটি তিক্ত, নোনা। কিন্তু উভয়টি থেকেই তোমরা আহার উপযোগী তাজা মাংশ পেয়ে থাক এবং পরিধানে ব্যবহার্য্য গয়না আহরণ কর। ..." (আল-কোরআন ৩৫:১২)

"তিনি প্রবাহিত করেছেন দু'টি পানির ধারা (যারা) পরস্পর মিলিত হয়, তাদের উভয়ের মাঝে আছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।" (আল-কোরআন ৫৫:১৯-২০)

ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও স্বাদের সকল পক্ষই কিছু সত্য ধারণ করে আছে। আবার কিছুটা বিচ্যুতিতেও আছে। তথাপি মানুষ নিজ নিজ পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দাড়িয়ে আছে স্বার্থ আছে বলে। জাগতিক সংঘাত ও বৈষম্য দুরীকরণে তাই সকলকে অন্তর্ভূক্ত করে 'ভারসাম্যপূর্ণ স্বার্থ ব্যবস্থাপনা' নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

সত্যি বলতে সমগ্র মানব জীবনের জন্য রূঢ় ও কঠিন সত্যটি অনুধাবন ও অনুসরণের সময় হয়তবা আজও আসেনি। তার জন্য জাতি হিসেবে সর্বপ্রথম মানব

মনে লুক্কায়িত বাঁধ ভাঙ্গা খায়েসগুলিকে একটি একটি করে পুরণ করতে হবে। জাতি হিসেবে মানবজাতিকে অর্জিত ফলাফলের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। এক অর্থে পার্থিব জীবনের অর্থহীনতাকেও উপলব্ধি করতে হবে।

যুগে যুগে কিছু মানুষ কঠিন সে সত্যকে যে উপলব্ধি করেনি বা আজও করে না তা নয়। তবে সকলকে তা মেনে চলতে বাধ্য করা সমীচীন নয়। সেটি হবে কেমিকেল দিয়ে ফল পাকাবার মত। যা তার পরিপূর্ণ স্বাদ ও উপকারীতা প্রদান করার ক্ষমতা রাখে না। যেদিন কঠিন সত্য মানুষ আপনা থেকে উপলব্ধি করবে, অনেক কর্মকান্ড সেদিন অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। অবশ্য অনেকে সে সত্য উপলব্ধি নাও করতে পারে। এটিও সত্য।

"... এবং তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম/প্রচেষ্টার মূল/সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

"আমাকেই জীবনের মূল/সর্বশেষ লক্ষ্যরূপে স্থীর কর।" (গীতা ৬:১৩)

"আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র এ জন্য যে, তারা আমার উপাসনা করবে।" (আল-কোরআন ৫১:৫৬)

বর্তমান সময়ে যাদেরকে আরোপিত দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক ধারক-বাহক বলে মনে করা হয়, তাদের কর্মকান্ডে কোথাও ভূল ভ্রান্তি ও অসত্যের প্রবেশ ঘটেছে। যা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারছে না। কিংবা বের হওয়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যা তাদের প্রতিপক্ষকে যে কোন নামেই হোক মুখোমুখী দাড় করিয়ে দিয়েছে। সমালোচকদের কঠিনভাবে সমালোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। বিধাতার হুকুম বিনা গাছের একটি পাতাও ঝড়ে না। অতএব যা হতে চলেছে তা তাঁর ইশারা ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

নিরব প্রতিবাদের ঝড় ধীরে ধীরে সরবে পরিনত হয়ে চলেছে। সমাজকে যা অশান্ত করছে। কিছু লোক আবার তার সুবিধা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। ঠিক যেমন দুই প্রতিবেশী বিবাদে লিপ্ত হলে তৃতীয় পক্ষের লাঠির ব্যবসা জমে ওঠে তেমন। দুই প্রতিপক্ষ প্রকৃতই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে নাকি তৃতীয় পক্ষ ভাড়া করা লোক দিয়ে তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, এর ফলে উৎপত্তি হচ্ছে তেমন সন্দেহের।

অর্থনীতির গোপন কোন সূত্র আবার এমন দ্বন্দ্বকে সমর্থনও করে। কেননা মানুষ মানবিক কাজে অর্থ জড়ো করতে অনীহা প্রদর্শন করে, শেয়ার বাজারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহকরনের ক্ষেত্রে অতি তাত্ত্বিক আলোচনা হরাম-হালালের বুলি উচ্চারন করে, চিনি কিংবা রসুনের অতি মূল্যায়ন করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হলে ক্ষমতায় টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে যায়, কর কিংবা ভ্যাট ফাঁকির প্রবনতার কারনে সংগৃহিত অর্থ হাতে আসে না কিংবা বেহাত হয়ে যায় অথচ জগৎ পরিচালনাকারীদের অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজন পৃথিবীবাসীর সুখ-সাচ্ছন্দ তথা অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু কোন ভাবেই মানুষ অর্থ প্রদানে আগ্রহী নয়। বৃহৎ আকারের অর্থ সংগ্রহের (Fund Rising) সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়গুলির অন্যতম হচ্ছে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, সংঘাত ও যুদ্ধ। নয়তো উন্নয়ন, আবিস্কার, মহাকাশ গবেষনা অনেক কিছুই সম্ভব হতো না। বর্তমান সময়ে অবশ্য রিজার্ভের অর্থ হ্যাকিং এর মাধ্যমেও তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব।

যারা ধর্মীয় দর্শনের ধারক ও বাহকের দাবীদার তারা যেন ধর্মের অলীক কাল্পনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা কথা বার্তার চেয়ে সামাজিক বৈষম্য ও কু-সংস্কার দুরীকরণ, যুব সমাজের মাঝে নীতি-নৈতিকতা গড়ে তোলা, সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা বা জীবন ঘনিষ্ট মূল ও প্রয়োজনীয় বক্তব্যসমুহের প্রতি অধিক মনযোগী হয় সে কারনে নীচে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ- যা ধর্মের মর্মবাণী অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সে দিকগুলিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। কেবল শুদ্ধ উচ্চারন নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাপড় টেনে দেয়ার বিষয় নয়, বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম (জেহাদ) করা যেন শরীরে অতিরিক্ত কাপড় টেনে না দিলেও মানুষ নিরাপদ বোধ করে। অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে সাহসী ভূমিকা পালন করে। যেন অন্যায় আচরণ ও কর্মকান্ড থেকে সৃষ্ট ভূক্তভোগীর ক্রুটি খুঁজে না বেড়ায়।

নিখুঁতভাবে কোন পক্ষের ক্রুটি অন্বেষন করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। ব্যাক্তি মানুষ যেমন ভূলের উর্দ্ধে নয়, সামষ্ঠিক মানুষও তেমনি ভূলের উর্দ্ধে নয়। ভূলক্রুটির কোন তালিকা প্রনয়ন করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। এখানে কিছু বিষয়ের উল্লেখ বা অবতারণা করা হলো যেসব নিয়ে বর্তমান বাস্তবতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

ভাববার প্রয়োজন আছে। যে সকল বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে সে সকল বিষয়ে দর্শন প্রদত্ত নির্দেশনায় কোনরূপ ত্রুটি নেই। তবে উপলব্ধিবোধ, অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে ভাববার অবকাশ রয়েছে। নিচে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। বিষয়গুলি সব বা শেষ নয়। তবে অবশ্যই ইংগিতবহ।

- যারা আরোপিত দর্শনের ধারক, বাহক ও প্রচারক বলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচিত তারা নিজেরা শতধা বিভক্ত। সাধারনের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কে সঠিক পথে পরিচালিত? সকলেই নিজেদের সঠিক দাবী করে। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

বিভক্ত মত ও পথের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যুগে যুগে নতুন ধারণার উৎপত্তি এবং নানাবিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকতা সৃষ্টির কারনে। এটিতে দোষের কিছু নেই। এটিও মুক্ত চিন্তারই ফসল। কিন্তু দোষের কারন তখনই হতে পারে যখন বিদ্যমান বিভক্ত ধারণার ধারক ও বাহকেরা নতুন আর কোন ধারণাকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে গ্রহণ করার মনবৃত্তি পোষন না করে, কিংবা নিজেরা হানাহানি করে।

- অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়সমুহের আলোচনার ধরন জীবন ঘনিষ্টতা বা বাস্তবতার সাথে প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হয় না। যেমন, উপাসনা কালে নিয়তের পর হাত কোথায় বাঁধতে হবে, পায়ের গোড়ালী থেকে পায়জামা কতটুকু ওপরে পরিধান করতে হবে, কোলাকুলি কিভাবে করতে হবে, মিলাদ পড়ানো জায়েজ কি জায়েজ না ইত্যাকার বিষয়। যেগুলি জীবনের জন্য খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয় নয়। কখনও এসব আলোচনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা বিরক্তিকর বোধ হয়।

এত বড় বিশ্ব ব্রম্মান্ড যিনি পরিচালনা করেন তাঁর সঙ্গে পায়জামা পায়ের গোড়ালীর ওপরে কিংবা নিচে পরার সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আবর্জনা যেখানেই ফেলা হবে ধরিত্রী সেখানেই তাকে ধারণ করবে। চিন্তার আবর্জনা মস্তিস্ক ধারণ করবেই। মস্তিস্ককে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

বোধসম্পন্ন অনেক মানুষ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় আলোচনা প্রসূত পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক নয়। ফলে তারা এগুলি এড়িয়ে চলে। কিন্তু তাদেরকে ধর্ম থেকে দুরে প্রতীয়মান হয়। কেননা যারা এগুলির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকেই সমাজে ধার্মিকদের মত মনে হয়। কেবল এগুলিই ধর্ম নয়। ধর্মের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আছে। ধর্মের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক আছে। মানুষকে সে বোধে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বাস্তবে অনেক বেশী অলীক ধারনার দিকে মানুষকে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে। আবার এসব অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বড় করে তুলে ধরে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে এবং নিজেরা গোপনে অনেক অনৈতিক সুবিধা লুটে নেয়। এগুলি অনেকটাই শিরক এর পাপের সমান।

- টেলিভিশনের প্রশ্ন উত্তর পর্বে ধর্মীয় বিষয়সমুহের আলোচনাগুলি হতাশাব্যাঞ্জক! প্রথমত হতাশাব্যাঞ্জক হচ্ছে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের ধরন। কিন্তু প্রশ্নকর্তার কোন ত্রুটি নেই। কেননা প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে তার শিক্ষার আলোকে। অপরদিকে উত্তরদাতারও কোনরূপ ত্রুটি নেই, কেননা কেউ প্রশ্ন করলে তাকে তো প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়। প্রশ্নের কিছু ধরন উদাহরণস্বরূপ নিচে তুলে ধরা হলো।

ঘুমানোর সময় নারীদের মাথায় কি কাপড় দিতে হবে? হলুদ রঙ্গের পোষাক পুরুষের জন্য কি নিষিদ্ধ? টিউব মেহেদী হাতে দিলে কি অজু হবে? আলতা ব্যবহার করা কি জায়েজ? জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি? ভাবীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন কি? নারীর চেহারা ছবি দেখলে কি পুরুষের অজু ভেঙ্গে যাবে? ভাল সিনেমা দেখা যাবে কি? শিয়া-সুন্নী বিয়ে কি ইসলামে জায়েজ? শ্বশুরের অসম্মতিতে দুলাভাই শ্যালিকার বিয়ে দিতে পারবে কি? ৫০ টাকা দামের চাল ধার নিয়ে ২৫ টাকা দামের চাল ফেরত দেয়া যাবে কি?

মাগরিবের নামাজের আগে কি ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে? নাপাকি দুর করতে কাপড় কতবার ধুতে হবে? এফএম রেডিওতে কাজ করে উপার্জিত অর্থ কি হালাল? বদ নজর থেকে বাঁচাতে শিশুদের ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি? ঘরে টেলিভিশন থাকলে কি ফেরেশতা আসে? টয়লেটের সঙ্গে থাকা শয়ন কক্ষে নামাজ হবে কি? জান্নাতে পুরুষরা কি ৭২ টি হুর পাবে? স্ত্রীকে না জানিয়ে মাকে টাকা পাঠালে কি গুনাহ হবে? জন্মদিন বিবাহবার্ষিকীর দাওয়াতে যাওয়া কি ঠিক?

ক্রিকেট খেলা কি ইসলামে জায়েজ? গোঁফ রাখা কি হারাম না হালাল? হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কি জায়েজ? শিশুদের প্যাম্পার্স ময়লার বালতিতে ফেললে কি ফেরেশতা আসে না? গল্প উপন্যাস পড়া কি জায়েজ? বড়দের ছায়ায় পা দেয়া কি আদপের খেলাপ? একই ঘরে কোরআন ও বাইবেল রাখলে কি গুনাহ হয়? সালোয়ার কামিজ কি সুন্নতি পোষাক? স্বামীর অজান্তে স্ত্রী কি পড়ালেখা করতে পারবে? পবিত্র কোরআনের শুধু বাংলা অর্থ পড়লে কি গুনাহ হবে? মিলাদ পড়া কি

বিদআত? এনটিভিতে এমনি অসংখ্য প্রশ্নের মধ্য থেকে সামান্য কতগুলি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রশ্নেসমুহের ধরন থেকে বোঝা যায় যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা কতটা বিস্তৃত হয়েছে। ভূল ও নিম্ন মানের শিক্ষা মানুষের ভাবনার জগতকে কত নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে! কিছু মানুষের ভাবনার জগতকে অলীক ধ্যান-ধারণা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে! স্বাভাবিক চিন্তা করার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

বস্তুত ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সঠিক বার্তা পৌঁছেনি। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যায় করা হচ্ছে। উপরন্তু খুটিনাটি এমনতর আলোচ্য বিষয় অনুসারীদের আরও বিভ্রান্ত করছে। সমাজে জটিলতা প্রবেশ করছে। নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করছে। অপ্রয়োজনীয় অগুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ধর্ম বিষয়টিকে বোধসম্পন্ন মানুষদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

- ধর্মের মর্মবাণী অনুধাবনের চেয়ে শাব্দিক অর্থকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দর্শনের শিক্ষা ভূলভাবে অনুধাবিত ও উপস্থাপিত হচ্ছে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে নয়। যার কারনে ধর্ম সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ন্যায়ের স্বপক্ষে সোচ্চার হতে পারছে না। ক্ষুদ্র দলীয় সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আটকে থাকছে। মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতার সুযোগ নিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোরালো কন্ঠস্বর নেই।

- কোন একক ব্যাক্তি, গোষ্ঠী বা প্রাতিষ্ঠান অবলীলায় জগতের সকল মানুষের জন্য কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও সমাধান দিয়ে দিচ্ছে। হারাম হালাল ঘোষনা করে দিচ্ছে! এমনকি যেসব বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও! স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছে না! সত্য অনুধাবনে জ্ঞানের চর্চ্চার পথকে রুদ্ধ করা হচ্ছে।

- স্বর্গ লাভের জন্য কোন একক ব্যাক্তির পরামর্শ গ্রহনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে আজ। যিনি পরামর্শ দেন তাঁর নিজের বেহেস্তে যাবার নিশ্চয়তা কে দেবে? দর্শন তো এমন শিক্ষা দেয় না! যারা এ প্রকারের বিজ্ঞাপন

প্রচার করতে পারে তাদের প্রদত্ত শিক্ষাটি কেমন হতে পারে সেটিও সহজেই অনুমেয়। আবার জগতের মানুষ তাকিয়ে দেখছে, কিছু বলতে বা করতে পারছে না। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেয়া হচ্ছে। আবার দুর্বলতা সৃষ্টিও করা হচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করছে না।

এসব থেকে অর্থ উপার্জন হচ্ছে। অথচ সে অর্থ ভাল কাজে ব্যায়িত হচ্ছে কিনা তার জবাবদিহিতা নেই। আবার এভাবে অর্থ উপার্জন করে ভাল কাজে ব্যায় করাও নিয়মসিদ্ধ নয়। কিছু মানুষের এমন আচরণ ধর্মের প্রতি আরেকটি সত্যান্বেষী দলকে বিতশ্রদ্ধ কিংবা বিদ্রোহী করে তুলছে; আবার সত্যিকার ধার্মিকদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করছে। ভূল শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি মানুষের অধিকারের আওতার মধ্যে পরে না। সত্য তথা ধর্মের সঠিক অনুসারিদের অনুভূতিতে এগুলি আঘাত করছে।

- আরোপিত দর্শনের ধারক বাহকরূপে সমাজে যারা অধিষ্ঠিত, যারা দর্শনের প্রবক্তাদের সকল কিছু নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে এবং অন্যদেরকেও পূঙ্খানুপুঙ্খ, সূক্ষ থেকে সূক্ষ, খুটিনাটি প্রতিটি বিষয় অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে, তারা নিজেরা প্রবক্তাদের মত আর্থিক জীবন যাপনকে অনুসরণ করে না। যারা পরজীবনে সূখের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তারা ইহজীবনে নিজেদের সূখ থেকে উদ্বৃত্ত অংশ ছেড়ে দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করতে উৎসাহিত করছেন না। সুখ ভোগে পাপ নেই। তবে সেটি সমগ্র মানুষকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যায় সম্মতভাবে হতে হবে। উপার্জনটিও হতে হবে ন্যায় সম্মতভাবে। ন্যায়ের পথে চললে সমাজে এত বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে না।

- দৃঢ় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো জ্ঞান। বিশ্বাস কেন করতে হবে জ্ঞানসম্মত আলোচনা সে আলোকে হতে হবে। কিন্তু আবেগি আলোচনা বেশী হচ্ছে। অন্ধ বিশ্বাসকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা অপ্রয়োজনীয়। একটি প্রজন্মকে যা যুক্তির গুরুত্ব অনুধাবনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে বাধাগ্রস্ত করছে। করছে বিকারগ্রস্ত।

স্রষ্টাকে স্মরণ করার অবশ্যই একটি চূড়ান্ত পরিনতি বা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। মানুষের অন্তর সেটি প্রত্যাশাও করে। নয়তো সে ধারণা মানুষকে সঠিক পথে

চলতে প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু তার জন্য স্বর্গ নরক নিয়ে অতিরঞ্জিত ভাবনা ভেবে মাথা ভার করারও প্রয়োজন নেই।

পরজীবনে সুখ অর্জনে সূক্ষ থেকে সূক্ষ, জটিল থেকে জটিলতর উপায় ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নরকের আজাব সম্পর্কে ধারণা প্রদানে ভয়ংকর ছবি ও ভিডিও বেচাকেনা হচ্ছে। কিছু মানুষের মাথা ভারাক্রান্ত হচ্ছে এবং অন্যদেরকেও সুস্থ্ স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে তা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। করছে বিকারগ্রস্ত। এগুলোর ভেতর যে প্রবেশ করছে সে আর বের হতে পারছে না। যে বের হচ্ছে সে নাস্তিক ধরনের হয়ে যাচ্ছে। এসব থেকে সন্তানদের পরিত্রানের উপায় অন্বেষন প্রয়োজন।

কতটি নেকী হলো, কতটি মন্দ কাজ হলো অতঃপর বিয়োগ করে কোন দিকে পাল্লা ভারি হলো, সরল অংকের মত তেমন হিসেব কষে স্বর্গ কিংবা নরকে যাবার সম্ভাবনা (Probability) গননা করার মত প্রবনতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি আল্লাহর বিচার ব্যবস্থাকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মত।

স্বর্গ প্রাপ্তি কিংবা নরক থেকে রক্ষা পাবার বাসনার মধ্যে কোন ভূল কিংবা অন্যায় নেই। বস্তুত পৃথিবীতেও আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে এই সুখটুকুই প্রত্যাশা করি এবং দুঃখ ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তি চাই। এমনকি যারা এসব বার্তা অপছন্দ করে তারা নিজেরাও কোন না কোন বাসনার পেছনে ছুটে চলেছে। হতে পারে সে বাসনা ইহ জীবনের মর্যাদা ও সুখ প্রাপ্তি।

সকলের বোধ এক রকমভাবে কাজ করে না। অনেকে নিজ জ্ঞানে জানে যে, সত্য পথে চললে কর্মই সুফল বয়ে এনে দেবে এবং কুফল থেকে রক্ষা করবে। ন্যায় পথে চললে কর্মের স্বাভাবিক পরিনতি স্বর্গ বা জগতেই স্বর্গীয় সুখ এনে দিতে পারে, আবার নরক বা নরকের মত দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। বিধাতার সৃষ্টির সব কিছুই নিয়ম মেনে চলে। নেকীর জন্য কাটাকুটি খেলার প্রয়োজন নেই। সত্য পথে চলার কিছু অবধারিত ফল আছে। সত্য বিচ্যুত হয়ে চলারও কিছু অবধারিত ফল আছে। সৃষ্টির কার্যকারনের সূত্রটি এরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সাজানো। বিধাতার নির্দেশ বা প্রদর্শিত পথ সেটিই নির্দেশ করে। তবে বাস্তব জীবনে কিছু ব্যাতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। সে কারনে কিছু মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিধাতার নিয়মকে দোষারোপ করে। এটা করে বিধাতার বৃহত্তর নিয়মকে বুঝতে না পারার কারনে।

ব্যাতিক্রমের পেছনেও কারন থাকে, থাকে সূত্র। মানুষ তা ভেবে দেখে না। বস্তুত সবই মানবের কর্মের ফল; কখনও ব্যাক্তিক কখনও সামষ্ঠিক। মানুষের কাজ সত্য ও ন্যায় পথে চলা এবং অন্যায় থেকে দুরে থাকা। তার পরিণাম শুভ। তেমন স্বাভাবিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারটুকুই যথেষ্ট। অতিরঞ্জিত কিছু নয়।

স্বর্গ নরককের অতিরঞ্জিত সুখ ও ভয়াবহ আজাবের কল্পিত আলোচনায় অধিক গুরুত্ব না দিয়ে যৌক্তিক ও সত্য জ্ঞানের আলোচনা অধিক প্রয়োজন। কোমলমতি শিশুদেরকে যেন ভূল শিক্ষা দেয়া না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

- একটি সময় ছিল যখন বেদ, গীতা, বাইবেল স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রয়োজন ছিল। মানব ইতিহাসের প্রাথমিক সময়ে সেভাবেই পৃথিবীতে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। দিক নির্দেশনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন যেটি হয়েছে যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাল রেখে হয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপই তার সমসাময়িক সময়ে অবদান রেখেছে।

যে সময়ে মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না, রেকর্ডার ছিল না তখন সকল বার্তা মানব মস্তিস্কে স্মরণে রাখা অযৌক্তিক ছিল না। সে প্রয়োজনীয়তা পুরণে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে নানানভাবে। কৌশল হিসেবে সেগুলির মধ্যে নেকী বা পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনাকেও সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। মানব জাতির অগ্রগতিতে এসব কর্মকান্ড যুগোপযোগী ভূমিকা রেখেছে। কর্মের উত্তম ফলাফল প্রাপ্তিই নেকী। মানব জাতি এসব থেকে ভাল ফলাফল লাভ করেছে, ফলে বলা যায় নেকী লাভ করেছে।

বর্তমান সময়ে বেশী প্রয়োজন দর্শন প্রদত্ত বার্তার মর্ম অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন। অতঃপর কর্ম ও আচরণ এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ। যা জীবনের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করবে না, মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্তও করবে না।

একটি সম্পূর্ন পুস্তক ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে মুখস্ত করিয়ে রাখা এখন অতি প্রয়োজনীয় নয়। অবুঝ শিশুদের মাথায় পাহাড় পরিমান বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবুও মেনে নেয়া যেত যদি কোন বিকল্প না থাকতো কিংবা বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় হতো। অসহায় অবুঝ শিশুদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। বড়দের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তারা বাধ্য। বিপক্ষে কথা বলা প্রায় অসম্ভব। যে শিশুটি হাফেজ হচ্ছে নিচের আয়াতগুলি তার মুখস্ত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা কি? বিষয়গুলি তো সে বড় হয়েও জানতে পারবে!

"তারা তোমার কাছে জানতে চায় ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বল: এটি একটি অসুস্থতা। এ সময় নারীদের একা থাকতে দাও। তারা পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। ...।" (আল-কোরআন ২:২২২)

"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মত। অতএব তোমরা শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর। ...।" (আল-কোরআন ২:২২৩)

- বিশ্বে কতজন কোন ধর্মে বিশ্বাসী এবং নিজ ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল কি না তেমনটি গণনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সংখ্যার আধিক্যের হিসেব তো ভোটের জন্য প্রয়োজন! সত্যের জন্য সংখ্যাটি আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্তরে সত্যকে ধারণ করার কারনে স্বল্প সংখ্যক মানুষ বদরের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। আবার তারাই সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্বেও সত্য পথ থেকে বিচ্যূত হওয়ার কারনে ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করছিল। এগুলি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য বিধাতা প্রদত্ত নিদর্শন বা শিক্ষা।

নিজ দর্শনে অত্যাধিক অনুসারি দর্শনের কোন একজন অনুসারিকে কি সুবিধা এনে দেবে? এতে উৎফুল্ল হওয়ার কি আছে? এসব গণনা করার প্রয়োজন কি? পৃথিবীর সব মানুষ যেদিন একই দর্শনের অনুসারি হবে সেদিনও প্রত্যেক মানুষের বিরোধীতাকারী থাকবে, শত্রু থাকবে, অপছন্দের মানুষ থাকবে। ঘরের মানুষও শত্রু হতে পারে! আবার সব মানুষ একই ধর্মের ছাঁয়াতলে আসার পরেও কিছু মানুষ নরকে যাবে। অতএব নিজ ধর্মে সংখ্যার আধিক্যের হিসেবের প্রয়োজন নেই।

"হে বিশ্বাসীগন! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও আছে তোমাদের শত্রু (যারা তোমাদেরকে সত্যের পথ থেকে নিবৃত করতে পারে), অতএব তাদের বিষয়ে সতর্ক থেকো। ...।" (আল-কোরআন ৬৪:১৪)

সংখ্যার আধিক্য নয়, প্রয়োজন সত্যের অনুসারি ন্যায়পরায়ন মানুষ। তেমন মানুষই বিধাতার নির্দেশিত পথে পরিচালিত। তা সে কিছু ভূলভ্রান্তি সত্ত্বেও যে দর্শনেই বিশ্বাস রাখুক না কেন। সকলেই তাঁর বান্দা।

".. যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। ...।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

ব্যাক্তি মানুষ যেমন ধাপে ধাপে নমনীয় থেকে কঠিন বা উচ্চতর শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়, সামষ্ঠিক মানুষও তেমনি বৈশ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগীয় থেকে অধিকতর কঠিন সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। এক সময় মানুষ চাঁদকে নিয়ে কাব্যিক আলোচনা বেশী করতো। এখন চাঁদ, সূর্য্য, মঙ্গল গ্রহের সত্য উদঘাটনের আলোচনা অধিক প্রাধান্য পায়। কথাটি এ জন্যই বলা হলো যে, এক সময় মানবের জন্য আবেগীয় বক্তব্য সঠিক এমনকি প্রয়োজনীয়ও ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রসরমানতার কারনে আজ উচ্চতর ও কঠিন সত্যের ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যারা সময়ের সঙ্গে চলতে পারবে না তাদের সঙ্গে অগ্রসরমানদের দ্বন্দ হবেই। এটি এ জন্য হবে যে বিধাতা নিজেই তা চান। এভাবেই তিনি কোন প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তি হলে নতুনটিকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সত্যকে পুণঃস্থাপন করেন। মিথ্যে বা ভূলের ছোবল থেকে জীবন ও জগতকে রক্ষা করেন।

“আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে, তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম?।” (আল-কোরআন ২:১০৬)

বাস্তব ও সত্যের আলোচনার দিকে না গিয়ে বর্তমানে অতিরঞ্জিত অলৌকিক বার্তা প্রদানের মাধ্যমে আরোপিত দর্শনের শিক্ষা প্রচার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অতিরঞ্জিত কল্পিত ভয় ও কল্পিত প্রাপ্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেগুলি এ প্রজন্মের শিশুদের জন্য অপ্রয়োজনীয়। সময়ের চাহিদার সাথে তাল রেখে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনায় এখন আবেগীয় ও অতিরঞ্জিত অবাস্তব বক্তব্য পরিহার করে, কঠিন হলেও আগামী প্রজন্মের জন্য সত্যকে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

লোভ ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে সমাজকে ভাল রাখার চেষ্টা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তা বলছি না। একেক ধরনের মানুষকে একেকভাবে পরিচালনা করা সুবিধাজনক। এসবই সমাজকে ভাল রাখার স্বার্থে। সে হিসেবে বিষয়টি মন্দ নয়। শিশুকেও জুজু বুড়ির ভয় দেখিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করা হয় যদিও সেটি সত্য নয়।

বিশ্বাস দিয়ে যা করা হয় সত্যও তাই করে। অন্য কথায় সত্য যা করে বিশ্বাসও তাই বলে। এর কারন সত্য যা খুঁজে পায় এক পর্যায়ে গিয়ে তা বিশ্বাসে পরিনত হয়। কিংবা বলা যায়, যা বিশ্বাস করা হয় তাকে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করলে সে একই

সত্য বেড়িয়ে আসবে। সমস্যা হয় তখন, যখন সময়ের প্রেক্ষিতে সেটিকে ঝালিয়ে নেয়া হয় না।

সত্য সন্ধানের কাজগুলি যারা করে গেছেন কিংবা আজও যারা তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন, তাদের অনেকে বিষয়গুলি অনুধাবন করেন/জানেন। কিন্তু যে কেবলমাত্র প্রাপ্ত সূত্র অনুসরণ করে চলে এবং অন্যদের তেমন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে সেসব শিক্ষার্থীদের অন্তর সূত্রের সত্যতা বিষয়ে কোন একদিন সন্দেহ পোষন করবে। প্রশ্ন উত্থাপন করবে। তাই আবেগীয় বক্তব্য নয়, মানব অন্তর নিভৃতে বিদ্রোহী হয়ে উঠবার কিংবা কিছু মানুষের এমন কর্মকান্ডের কারনে কোন দর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই সত্যের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারই সব সময়ের জন্য মঙ্গলজনক। এর জন্য জ্ঞান অর্জন ও তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার কোন বিকল্প নেই।

এক অর্থে সবই যুক্তি ও ধারণার খেলা। যদিও মানব মনের ওপর এ খেলার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অতিরঞ্জিত অলৌকিক বা মিথ্যে দিয়ে নয় বরং সত্যের জ্ঞান দিয়েই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। বিধাতা তেমনটিই এখন অনুমোদন করেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ এখন তেমন ইংগিতই বহন করে। কিন্তু তার জন্য আগে নিজেদেরকে কোন একটি বিষয়ের সত্য ব্যাখ্যাটি খুঁজে পেতে হবে।

স্বয়ং আল্লাহই মানুষের জন্য বর্তমান সময় বা কালটিকে উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে প্রায় সকল মানুষ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনের স্বাদ নিতে পারছে। যেসবগুলি কর্মের প্রতিদানস্বরূপ ভালদের জন্য স্বর্গে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আর এ সবই এসেছে বিজ্ঞানের হাত ধরে, অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান দ্বারা।

বিধাতা সত্য ভিন্ন জগত সৃষ্টি করেননি। বিধাতাকে জানতে, বুঝতে, পেতে বা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে জগত সৃষ্টির সত্য ও সূত্রকে সন্ধান করতে হবে। ধর্মীয় দর্শনে তেমন কাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে বিজ্ঞান সে কাজটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত সকল কাজ এবাদতেরই অংশ, যা প্রকৃতি বা সত্য বা অন্যকথায় বিধাতা বা আল্লাহকে বুঝতে সহায়তা করে।

যারা স্রষ্টার সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবে, যাদের কর্ম বিধাতাকে বুঝতে সহায়তা করে, যারা সত্য উদঘাটনের কাজে রত- তাদের অন্তর স্রষ্টায় নিমগ্ন। বস্তুত সৃষ্টিকে নিয়ে যে ভাবনায় রত সে বিধাতার স্মরণেই রত, সে উপাসনায় রত।

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে (আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবতে) আগ্রহী এবং (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞচিত্ত হতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য রাত্রি ও দিবসকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে/পরস্পরের অনুগামী করে।" (আল-কোরআন ২৫:৬২)

সাধারন চোখে মানুষ কেবল মানুষকে দেখে; যেমন পিপড়াকে দেখে। এক কথায় আমরা বলি পাখি কিংবা গাছ। অথচ সবখানে আছে রকমভেদ। উপর থেকে আমরা দেখি একই সমুদ্র। অথচ কোনটির পানি মিঠা কোনটি নোনা। একই জাতের কিংবা সাধারণ চোখে দেখতে এক হলেও ভেতরে আছে বিশাল ব্যবধান। যেমন দেখতে সবই কম্পিউটার মনে হলেও সক্ষমতা সবগুলির এক নয়।

"... প্রত্যেকের জন্যই আমি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং পথ দিয়েছি। ...।" (আল-কোরআন ৫:৪৮)

প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ রিতি ও কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর উপাসনায় রত। প্রত্যেকেই তার উপাসনার পদ্ধতি জানে। যেমন উপাসনা করে গাছ-লতা-পাতা এমনকি পক্ষীকূল ...।

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে এবং এমন একটি কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে না। কিন্তু তাদের মহিমা প্রকাশকে তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। ...।" (আল-কোরআন ১৭:৪৪)

"তুমি কি দেখনি যে, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে? প্রত্যেকেই তার উপাসনা ও মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।" (আল-কোরআন ২৪:৪১)

সৃষ্টিকে নিয়ে যে ভাবে, যে সত্যের সন্ধানে রত, সৃষ্টির পরিচালনায় সততা ও আন্তরীকতার সাথে অংশ নিয়ে যে প্রতিনিয়ত কর্মে রত- সে উপাসনায়ই রত। তা

সে যে নামেই পরিচিত হোক না কেন। নামের মধ্যে কোন ধর্ম নেই, আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কোন ধর্ম নেই। এসব নাম ও ছকে বাঁধা আনুষ্ঠানিকতাসমুহের আবির্ভাবের পূর্বেও মানুষ সৎ পথে চলেছে। বিধাতার প্রিয়পাত্র হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে সততার সঙ্গে চলার মধ্য দিয়ে অন্তর যার তাঁর প্রতি সমর্পিত, সেই সঠিক পথে চলে। সে বিধাতা আল্লাহর পথেই চলে। জগতে তেমন মানুষ প্রয়োজন। এতদ্বসত্ত্বেও অধিক সংখ্যক মানবের ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ম-রিতি-নীতির পরিপালনও আবশ্যক। কেননা সব মানুষ এমন জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হবে না। আবার সত্যের এ জ্ঞানকে যারা ধারণ করে, কোন গোষ্ঠী কর্তৃক তাদেরকে সমাজে ভূল বা মন্দ নামে অভিহিত করাও সমীচীন নয়।

সমাজ থেকে পূর্বের কিছু ধারণা বা কুসংস্কার বা ভূল দূরীভূত হয়ে গেলে কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দেবে। অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা অনেক ভূল কাজ কর্মের সঙ্গেও জড়িত হয়ে গেছে। যাদের উপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তাদেরও সন্তান-সন্ততির অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার বিষয়গুলি নিয়ে জগৎ পরিচালনাকারীদের ভাববার আছে। তাদের জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করার মধ্য দিয়েই সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় ভূল শিক্ষাকে সমাজ থেকে সহজে দূর করা যাবে না। কেননা এরাও তাদের ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সংগ্রাম করে যাবে। ফলে সমাজকে সঠিক শিক্ষায় পরিচালিত করা কঠিন হয়ে যাবে। তেমন পরিস্থিতিতে আদর্শের চেয়ে সন্মানজনক বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। তাই যে কোন সংস্কারের পূর্বে মানুষের বিকল্প কর্মের বা অর্থ উপার্জনের একটি পরিকল্পনাও থাকতে হবে।

দিক নির্দেশনা ও বর্তমান বাস্তবতা

একটি দর্শন বা দিক নির্দেশনা ছাড়া মানব জীবন চলতে পারে না। যেমন প্রোগাম ছাড়া কম্পিউটার চলে না। তেমন ক্ষেত্রে মানুষ উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে।

বর্তমান বাস্তবতায় মানুষ যেদিকে ছুটে চলেছে সেখানেও একটি দর্শন কাজ করছে। সে দর্শনে বিজ্ঞাপণ, মুনাফা, অতি প্রাপ্তি ও অতি ভোগের প্রাধান্য বেশী। ইহজগতেই আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রাপ্তির প্রত্যাশা অধিক। যা অর্জনে তীব্র

প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানব জীবন। যা ব্যাক্তি মানুষকে তার নিজের মত করে ভাববার সময় কিংবা সুযোগ কোনটিই দিতে চাইছে না।

পেছনে অসহিষ্ণুদের ধাক্কা, সামনে প্রাপ্তির তীব্র আকাংখায় অজানা গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে মানব জীবন। জীবনের পরিপূর্ণ লক্ষ্য জানা নেই। অর্থ দিয়ে যেন স্বর্গীয় সুখ কেনা সম্ভব হয়ে উঠছে। হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে সব অর্থের পেছনে। কতটুকু অর্থ প্রয়োজন তার সুনির্দিষ্টতা জানা নেই। জীবনে জীবন নেই। নেই স্বাভাবিকত্ব। আছে অস্থিরতা। তবে এরও প্রয়োজন আছে। নইলে কর্মঠ মানুষ পাওয়া যাবে না।

মর্যাদার নামে কৃত্রিম ফোঁড়া স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। যার বিষজ্বালা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। প্রভাবকের মূখ্য ভূমিকা পালন করছে এখন লোভ, ভোগ আর অহমবোধ। মলিন হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি। কৃত্রিম কিংবা অফিসিয়াল নিয়মে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে মানুষকে। হাসিতে হাসি নেই। আনন্দে আনন্দ নেই। যাদের আছে বলে নিজেরা ভাবছে, তারা কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবছে। অন্যের জন্য যতটুকু ভাবছে বলে ভাব প্রদর্শন করা হচ্ছে সেখানেও নিজের প্রাপ্তিটাই বেশী।

প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের নামে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। কুসংস্কারকে পূঁজি করেও অর্থ উপার্জন হচ্ছে। কোথাও জবাবদিহিতা নেই। সূক্ষ বুদ্ধির চালে গড়ে উঠছে বিশাল বিত্ত বৈভব। একজনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে অনেকের মাথাপিছু আয়কে স্তুপিকৃত করা। যারা স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী নয়, তারাও ছুটে চলেছে একটুখানি ক্ষণস্থায়ী পার্থীব স্বর্গীয় সুখ ক্রয়ের লোভে।

লোভে পাপ নেই। মানব জীবনের জন্য লোভ একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদান। যা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যাদের লোভ বা বাসনা নেই তারা নিষ্ক্রিয়। যাদের সেটি অত্যাধিক বেশী তারাই জীবনে ঝুঁকি নেয়। নতুন পথ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির প্রয়োজনে এখন আর সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পেছনে প্রাপ্ত সুবিধার লোভ বেশী কাজ করে।

লোভের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, সূক্ষ বুদ্ধির চালে মানুষ তখন বিশাল বিত্ত বৈভব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। শুরু হয় ক্ষমতা ও মর্যাদার খেলা। যা থেকে

পিছু হটবার সুযোগ নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একটির পর একটি প্রয়োজনীয়তা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। চরম ধূর্ততা হয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বাস্তব জীবনে শুরু হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয় দাবা খেলা। সেটিও মেনে নেয়া যায়। কিন্তু-

প্রতিযোগীতামূলক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বি পক্ষসমুহ এক পর্যায়ে হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। এটি মেনে নেয়া যায় না। জগতের সকল অপকর্মের মূল অন্তরের বাঁধ ভাঙ্গা বাসনা, খায়েস বা লোভ। লোভকে পরিত্যাগ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে গীতা, কোরআন সর্বত্র। এ ধরনের মানুষের চরিত্রকে স্বল্প কথায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিচের সংক্ষিপ্ত বর্ননায়।

"তারা বিশ্বাস করে জীবনের শেষ অবধি ইন্দ্রিয়ের তুষ্টি সাধনই মানব সভ্যতার মূল প্রয়োজনীয়তা। ফলে তাদের উদ্বেগের শেষ নেই। লালসা, ক্রোধ ও শত সহস্র বাসনা দ্বারা তারা আবদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অবৈধ উপায়ে অর্থ সুরক্ষিত করে। অসুর ব্যাক্তি মনে করে, আমার আজ এত সম্পদ হয়েছে এবং আমি আমার পরিকল্পনামাফিক আরও অর্জন করবো। আজ আমার এত এত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এটি আরও আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। সে আমার শত্রু এবং আমি তাকে হত্যা করেছি এবং আমার অন্যান্য শত্রুদেরকেও হত্যা করা হবে। আমিই সব কিছুর হর্তাকর্তা। আমি উপভোগকারী। আমিই পরিপূর্ণ, ক্ষমতাশালী এবং সূখী। আমি অভিজাত স্বজন-বেষ্টিত ধনৈশ্যর্যশীল মানুষ। আমার মত এত ক্ষমতাশালী ও সূখী কেউ নেই। আমি বলিদান করব, কিছু দান করব এবং এভাবে আমি আনন্দ করব। এ ধরনের লোকেরা এভাবে অজ্ঞতা বা মূর্খতা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়।" (গীতা ১৬:১১-১৫)

বিধাতা অপ্রয়োজনে কিছুই সৃষ্টি করেন না। লোভেরও উপকারীতা আছে। লোভ প্রাণে উচ্ছাস সৃষ্টি করে। কর্মস্পৃহা সরবরাহ করে। লোভের কারনে ছুটে চলার ফলশ্রুতিতে আমরা এত এত উন্নয়ন ও অগ্রগতি চোখে দেখতে পাই। মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত লোভ বা বাসনা এত এত অগ্রগতির পেছনে অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে কাজ করে। লোভকে পরিপূর্ণভাবে বিতারণ করার ধারণা এক অর্থে সঠিকও নয়। সেক্ষেত্রে কর্ম চঞ্চল মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে।

লোভ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে না পারে, তাকে যেন একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় সেজন্য প্রয়োজন সঠিক 'লোভ ব্যবস্থাপনা'। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দিতেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তারা পৃথিবীতে হিংসা হানাহানি করতো। তাই তিনি যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করে তা প্রেরণ করেন। তিনি বান্দাদের বিষয়ে অবগত এবং তিনি সব দেখেন।" (আল-কোরআন ৪২:২৭)

অন্যকে প্রাপ্য মৌলিক অধিকার থেকে কৌশলে বঞ্চিত করার মত খেলা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? দু'দিন পূর্বেও যখন জীবন ছিল না তখন এ খেলার ভাবনা ছিল না। আবার দু'দিন পরেও থাকবে না নিশ্চিতভাবে জানা আছে। মাঝপথে জীবনের বৃহৎ অংশটুকুও শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন নামে কূটচালবিহীন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আনন্দদায়কভাবে অতিবাহিত হয়েছে। সেই একই মানুষগুলির ভেতর জীবনের শেষ বেলায় এসে মাত্র ক'টা দিনের জন্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অহম। সেখান থেকে মর্যাদা-অমর্যাদা, কে বড় কে ছোট এবং বঞ্চিত-অবঞ্চিতের খেলা? পেছনে কাজ করছে কিছু মানুষের ন্যায় বিচ্যুত ভোগের বাসনা।

ভোগে পাপ নেই। মানুষ তো স্বর্গেও যেতে চায় ভোগ করার আশা নিয়ে। সে আশায় পার্থিব জীবনেও অনেকে লোভহীন-ভোগহীন জীবন যাপন করতে কুণ্ঠিত নয়। অতএব ভোগে অন্যায় বা অপরাধ কি?

অপরাধ মূলত মানুষে মানুষে ভোগের ক্ষেত্রে বিশাল পরিমানের বৈষম্য সৃষ্টিতে। ব্যবধানটি যদি ন্যায় পথে সৃষ্টি হতো তবে হয়তবা মেনে নেয়া যেত। কিন্তু ন্যায় পথে তো এত বড় ব্যাবধান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ নিশ্চিতভাবেই জানে যে এসবের মাঝে ন্যায়ের উপস্থিতি নেই। কোথাও সত্য আচরণের বিচ্যূতি ঘটছে। এটিই ধর্মচ্যূতি। কেবল ধর্মীয় বিধি-বিধানের আনুষ্ঠানিকতা থেকে দুরে সরে যাওয়াই ধর্মচ্যূতি নয়। কিন্তু সেটিকে যারা বড় করে দেখার চেষ্টা করে তারা ধর্মের মূল উদ্দেশ্য অর্জনকে অজ্ঞতা অথবা সূক্ষ জ্ঞানে ব্যাহত করে। তাদেরও স্বার্থে আঘাত লাগে।

সমাজকে শান্ত রাখতে যত প্রকল্পই হাতে নেয়া হোক না কেন- সমাজ শান্ত হবে না। মানুষ যত বুদ্ধিমান প্রাণী হোক না কেন পেছনে বিধাতার হাত আছে। তিনি সূত্র স্থাপন করে রেখেছেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন শান্তি অর্জন কোনদিন সম্ভব নয়। ভারসাম্যহীনতা ঝড় সৃষ্টির জন্য দায়ী। মানুষ যেগুলিকে বিধাতা প্রদত্ত কষ্ট বা

দুর্যোগ বলে প্রচার করতে চায়, বস্তুত মানবের ন্যায়-বিচ্যুত কর্মকান্ড ও তা প্রতিহতকরণে মানবের নিষ্ক্রিয়তাই এর মূল কারন। যারা অন্যায় করে এবং যারা নিশ্চুপে তা সহ্য করে উভয়ই মানুষ। অতএব মানুষই এর জন্য দায়ী।

"আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দু পরিমাণ ভূল করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি ভূল করে।" (আল-কোরআন ১০:৪৪)

বিধাতা মানবকে তার সহজাত ধর্ম উপলব্ধি করার জ্ঞান দান করেছেন। আবার আরোপিত ধর্মে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বার্তাগুলি জানিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টিতে নিদর্শন তুলে ধরেছেন। ইংগিত বুঝে চলার দায়িত্ব মানবের নিজের। এগুলিই দিক নির্দেশনা।

প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসরত কিছু মানুষের জীবন এত কষ্টের যে তার পাশাপাশি কোন মানুষের রাজকীয় জীবন-যাপন ও তার প্রদর্শন বেমানান। এক অর্থে অনৈতিকও বটে। মানুষের কষ্টের শ্বাস অনেকের দেহ ও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। অনেকে বিষয়গুলি জানতেও পারছে না। প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক বা গুলশানে অতি সুখে বসবাস করে তা অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। বহু মানুষের উপার্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে যারা খেলছে, তাদের সন্তানরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ আগামীতে তারাই নেতৃত্ব দেবে!

বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্থায় কোন একক ব্যাক্তির চাল, ডাল, গম কিংবা কম্বল বিতরণের ছবি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। সামগ্রীক প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যেন সকলের দ্বারে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পৌঁছে যায়। ডিজিটাল যুগে তেমনটি প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। কেননা এখন সেটি সম্ভব! বিধাতা সকলের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। পাজল গেইমের মত ওলট-পালট করে দিয়েছেন। বিধাতা যা করেন তা প্রয়োজনে করেন। জানতে আগ্রহীকে সে প্রয়োজনও নিজেকেই খুঁজে বেড় করে নিতে হবে। তবে জাগতিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি কোথাও সরবরাহের চলাচল ব্যাহত করছে।

দু'চার জন ব্যাক্তির পক্ষে শত সহস্র মানবের মাথাপিছু আয়ের প্রবাহ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে পরিচালন পদ্ধতির গলদের কারনে। ঠিক যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট নদীর পানির প্রবাহকে ঘুরিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিচালন পদ্ধতির

গলদ সৃষ্টি হয় সূক্ষ জ্ঞান ও শক্তির দাপটে। কোন ব্যবস্থায় ত্রুটির বিদ্যমানতা কিছু মানুষকে সুবিধা প্রদান করে। তারা সে ত্রুটি লালন করে।

জগতের সকল প্রাপ্তির উৎস এক। একের মাধ্যমে তিনি অন্যতে রসদ প্রেরণ করেন। এটি একটি প্রক্রিয়া। পরীক্ষাও বটে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে বসে অহম প্রদর্শন নয়। সমস্ত অহম সমর্পিত হতে হবে বিধাতার দরবারে। জ্ঞানের এ উপলব্ধিবোধ সমাজে কামার-কুমার, তাতী-জেলে থেকে শুরু করে ভাগ্যবান পর্যন্ত সকল কর্মঠ মানুষের কাজ ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে পারে। পরিশেষে এটিই যৌক্তিক এবং শান্তির পথ।

"পূন্যময় তিনি, যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু, যেন তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।" (আল-কোরআন ৬৭:১-২)

আজকের ভাগ্যবান আজকের বঞ্চিতের জ্বালা বোঝে না। আজকের বঞ্চিত আজকের ভাগ্যবানের যুক্তি বোঝে না। বিধাতায় সমর্পিত হতে হবে সকলকে। সকলের সকল কাজকে। জাগতিক প্রশান্তির জন্য এটি উত্তম ধারণা ও ব্যবস্থা। বস্তুত সব প্রাপ্তি তাঁর কাছ থেকেই! আমরা কিছুই উৎপন্ন বা সৃষ্টি করি না। কেবল ভোগ ও বন্টনের কাজে অংশ গ্রহন করি। সে বন্টনেও গলদ করি!

অনেক পেয়েও যারা না পাওয়ার ব্যাথায় ব্যাথিত, তারা না পাওয়া লোকদের ব্যাথা অনুভব করছে না। এগুলিই বিধাতার পরীক্ষা! অতঃপর একদিন যে যা যে উপায়ে অর্জন করেছে, নিজেদের কর্ম ও আচরণের কারনে সব হারিয়ে ফেলতে হবে। সবটুকু ভোগও করে যেতে পারবে না। স্তুপ করে কেবল ধারণাগত তৃপ্তি নিতে পারবে। মানসিক সংকীর্ণতার ফল এসব!

কথাগুলি কেবলি কথার কথা নয়। কর্মের নিশ্চিত ও অবধারিত পরিণাম। কার্যকারনের সূত্রে গাঁথা। সূত্রই সত্য। যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সময়ে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে। সন্দেহ থাকলে ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

সত্যি বলতে জগতে ন্যায়-বিচ্যুত কর্মকান্ড দুরীকরণে ভাল মানুষদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। অন্যায়কারীদের মূল চিহ্নিত করা সম্ভব হলে অন্যায় দুর করার কাজটিও সহজ হয়ে যেত। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মান্ডে ন্যায়-বিচ্যুতির প্রথম কারনটি কি সেটি

কারও জানা নেই। বিচূতির প্রথম কারন শান্ত ব্রহ্মান্ডকে অশান্ত করেছে। সে উৎসের বর্তমান অবস্থানটি অজানা। কোন একদিন প্রথম কারনের প্রতিক্রিয়া ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পরেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাল পালা ছড়িয়ে মানবীয় হিসেবে কল্পনাতীত বিস্তৃত রূপ ধারণ করেছে। জগত জুড়ে সত্য-বিচ্যুত যত কর্মকান্ড আজ সম্ভব হয়ে উঠছে তার গোড়াপত্তন সেখান থেকে।

নিষ্পাপ শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে কর্মজীবনে এসে যে মানুষটিকে অনিচ্ছা সত্বেও বিচ্যুতির পথে পা বাড়াতে হচ্ছে সে নিজেও এক ভূক্তভোগী। পূর্বের খেলার হাল ধরে দোল খাচ্ছে। বিনি সূতোর গাঁথা মালায় প্রথম কারনের সঙ্গে সে কোনভাবে যুক্ত। প্রজন্মের মুখের দিকে চেয়ে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না। বর্তমান বিচ্যুতিতে নিজের জড়িয়ে পড়ার কারন পূর্বসূরীর জড়িয়ে যাওয়া। জটিল এবং মহাসংকটে মানব জীবন!

“নিশ্চয়ই! আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে, অতঃপর আমি তাকে নিম্নস্তরের সর্বনিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি, তাদের ব্যাতিত যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে। ...।” (আল-কোরআন ৯৫:৪-৬)

নিজেদের পাশে যে অন্যায়কারীকে চোখে দেখতে পাই অন্যায়কারী হয়ে সে জগতে আসেনি। সেও ভূক্তভোগী! নিজ অবস্থানে শত চেষ্টায় কেউ যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তথাপি কোন কারনে ভূক্তভোগীদের দলভূক্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

চোখে দেখা ক্ষত স্থানে মলম দিয়ে অন্যায়কারীদের কোন দিনই নিঃশেষ করা যাবে না। সাময়িক ব্যবস্থারূপে যদিও সেটি থাকতে হবে। নতুনভাবে অগনিত অন্যায়কারী সৃষ্টি হবে অজানা উৎপত্তিস্থল থেকে। ধারাবাহিকভাবে জড়িয়ে যাওয়া প্রত্যেকেই নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় রত।

“(বিচার দিবসে) আল্লাহ বলবেন: তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব (অন্যায়কারী) সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সঙ্গে তোমরাও অগ্নিতে প্রবেশ কর। প্রতিবার যখনই এক সম্প্রদায় ওখানে প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল। অতএব আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন: প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ, তোমরা জান না।” (আল-কোরআন ৭:৩৮)

ক'জনার দ্বান্দ্বিক খেলা কিংবা ক্ষোভের আগুন ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পরেছে। দ্বন্দ্বের প্রথম কারনই সৃষ্টিতে সত্যের সুরক্ষাকে ভঙ্গ করেছে এবং সত্য বিচ্যুত কর্মকান্ডকে সম্ভব করে দিয়েছে। জগতকে করেছে অশান্ত।

উৎসের অবস্থান ধরা ছোঁয়ার বাইরে। হতে পারে অতি উচ্চে এর অবস্থান যা নিচে ছড়িয়ে পরেছে, কিংবা হতে পারে অতি নিচে তার অবস্থান যার সুযোগ উপরও ভোগ করছে। নিজ নিজ অবস্থানে প্রত্যেকের ন্যায়সম্মত আচরণ জাগতিক বিচ্যুতির উৎপত্তিস্থলকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে।

সহজ-সরল পথ যা সকলের জন্য সুন্দর জীবন উপহার দিতে পারে, মানুষ সে পথ ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরিত্যাগ করে চলেছে বা চলতে বাধ্য হচ্ছে। গুটিকয়েক মানুষ পরিকল্পিতভাবে নিয়মের বেড়াজালে ফেলে অপরকে বঞ্চিত রেখে নিজে অধিক ভোগ করার মানসে ন্যায় বা ধর্মের পথ লংঘন করে চলেছে।

আজকের মানুষের এসব কর্মকান্ড ভবিষ্যতের জন্য এক বিশৃংখল ও বিপদজনক জীবন ও জগত রেখে যাচ্ছে। যেখানে অতিভোগকারীদের পরবর্তী প্রজন্মকেও বসবাস করতে হবে। প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল রেখে যেতে পারছে না মানুষ। তাই তারা প্রজন্মকে জন্মস্থান থেকে সরিয়ে নিতে ব্যাস্ত। বস্তুত এরা সৃষ্টিকর্তার সক্ষমতা ও ইচ্ছেতে বিশ্বাসী নয়। তিনি ভিন্ন কোথাও কোন রক্ষাকর্তা নেই। ন্যায় ও ভালবাসার পরশে জীবন ও জগতকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারছে না মানুষ। অহমবোধ আর লোভ বাঁধা হয়ে সামনে এসে দাড়াচ্ছে। নিজেদের প্রজন্মও কোনদিন অপরকে বঞ্চিত করার দায়ে এসব অন্যায় আচরণকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

সৃষ্টি ও জীবনকেই যদি নিরাপদভাবে রক্ষা করা না যায়, তবে এক জীবনে এত অধিক লোভ ও ভোগের জন্য সৃষ্টিরইবা প্রয়োজন কি কিংবা এত শিক্ষারইবা প্রয়োজন কি? সত্যের বা ধর্মের পথ থেকে অতি বিচ্যুতি সৃষ্টি ধ্বংসের কারন হতে পারে।

ন্যায় বিচ্যুত বা ধর্মচ্যুত আচরণই প্রকৃত অর্থে সহজ-সরল পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সূরা ফাতেহা আওড়ালেও সহজ-সরল জীবন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্ম হচ্ছে সেই পথ, মানব মঙ্গলের জন্য যা নিশ্চিতভাবেই সত্য। অর্থাৎ যথার্থ বা যথাযথ বা সঠিক পথ। যেখানে রয়েছে সামাজিক শান্তি

স্থাপনের সঠিক সূত্র। যে সূত্র অনুসরণ করে চললে মানবজীবন অবধারিতভাবে পরিপূর্ণ সফলতা পেতে পারে। জগত হতে পারে শান্তিময়। স্বর্গ এখানেই ধরা দেবে।

ধর্ম শব্দটিকে বর্তমানে সঠিক জ্ঞানে অনুধাবন করা হচ্ছে না। পৃথিবীতে দূর্ভাগ্যবরণকারী একটি শব্দ হচ্ছে ‘ধর্ম’। ধর্ম যা বলতে বা বোঝাতে চায়, যাদের জন্য ধর্ম সে মানুষই ধর্মকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না বা করতে দিতে চায় না। সুবিধাভোগীরা বাঁধা হয়ে দাড়ায়! কুসংস্কার, অপব্যাখ্যা এবং রাজনীতির বিরোধী পক্ষের আচরণকে এখন ধর্ম মনে করা হয়।

ধর্মকে কাজে লাগিয়ে একদল সুবিধা ভোগ করে। আরেক দল সুবিধা বঞ্চিত হয়ে তাকে উদ্ধার করার মাধ্যমে আরেকটি সুবিধা ভোগ করে। মূলত দুটি পক্ষের স্বার্থ ও আক্ষেপের দ্বন্দ্বের ফল ধর্মকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ধর্ম তাই সবার ওপরে।

সত্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েও যারা ধর্ম বিদ্বেষী আচরণ প্রদর্শন করে তারা ভীরু। তারা ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কারের অংশগুলিকে প্রচন্ডভাবে অপছন্দ করে সত্য, তবে একই সঙ্গে তারা পলায়নপর আচরণও প্রদর্শন করে সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জনসম্মুখে তুলে ধরতে ব্যার্থ হয়ে।

বাস্তবে কেউই ধর্মের সত্যিকার মর্ম বাণীর কাছে ভিড়তে চায় না। কেননা তাতে সুবিধাভোগী দল এবং বিরোধীতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সেই একই সুবিধা একইভাবে যে লুটে নেয়ার গোপন বাসনা অন্তরে লালন করে, তাদের সকলকেই বিধাতা প্রদত্ত সকল অনুগ্রহ ন্যায়সম্মতভাবে বন্টন করে দেয়ার ভয় আছে। ধর্মের বিষয়ে ধর্মের মর্মবাণী অনুধাবন ও নানারূপ ব্যাখ্যায় ত্রুটি রাখা আছে। আছে ধূর্ততা। কিছু অজ্ঞতাও আছে।

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও এক অর্থে বোকা। মানুষ যে বোকা সে তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। সে ক্ষনিকের লোভ সংবরণ করতে পারে না। মানুষকে বিশ্বাস করে ক্ষুদ্র একটি কোষে ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেই মানুষ বিশ্বাসভঙ্গকারীরূপে নিজেদের প্রমাণ করেছে। এ এক পরীক্ষা।

“আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বিশ্বাসের বোঝা বহণ করার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহণ করা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলো এবং বিশ্বাসের

ভয়ে ভীত হলো এবং মানুষ তা বহণ করতে পারবে বলে অনুমান করলো এবং সে নিজেকে নির্যাতনকারী ও বোকারূপে প্রমাণ করলো ।" (আল-কোরআন ৩৩:৭২)

জগত পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব অবিবেচক, প্রচন্ড স্বার্থপর, লোভী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী বোকা মানুষের হাত থেকে সহজ-সরল ও শিশুসুলভ কম্পিউটারের হাতে তুলে দেয়ার সময় হয়তবা চলে এসেছে। যেন পৃথিবীর একটি মানুষকেও কোন অজুহাতে বিধাতা প্রদত্ত প্রাপ্য মর্যাদাপূর্ণ মৌলিক চাহিদার অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। পৃথিবীতে এত এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ডাষ্টবিনের ময়লা যেন কারও ভাই, বোন বা সন্তানকে খেতে না হয়।

উল্লেখ্য যে, কম্পিউটারের পেছনেও মানুষের বিদ্যমানতার কারনে সেক্ষেত্রেও একই আশংকা থেকে যাবে। তাই সেখান থেকেও উত্তরণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, "শিঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো, হে দুই (নির্ভরশীল) সম্প্রদায় (জ্বিন ও মানুষ)।" (আল-কোরআন ৫৫:৩১)

"অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে (মানুষকে) জানেন এবং তাদের প্রত্যেককে সঠিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছেন।" (আল-কোরআন ১৯:৯৪)

তাঁর কাছে আছে সকলের বৃত্তান্ত। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। মানুষ পৃথিবীতেই আজ যে স্বর্গীয় সুখের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে তা কোন আন্দোলনের ফসল নয়। এগুলি যথাসময়ে মানুষকে প্রদত্ত বিধাতার অনুগ্রহ ও উপহার। বিধাতার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ লাভের জন্য মানুষকে আচরণে সভ্য হতে হবে। অন্যায়কে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করতে হবে। যথাযথ অন্তরে প্রার্থনা করতে হবে। সর্বপরি প্রয়োজন ধৈর্য্য। ধৈর্য্যের অর্থ যথাযথ সময়ের জন্য অপেক্ষা।

"হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! তিনিই তাঁর বান্দাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন যে বিষয়ে তারা (দ্বন্দ্ব) মতবিরোধ করে।" (আল-কোরআন ৩৯:৪৬)

- আজ এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ -